ভূতেরা সব এইখানে

সম্পাদনা

অজয় দাশগুপ্ত

সুবর্ণা প্রকাশনী
৬ এ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০০৭৩

Bhutera Sab Eikhane
A Collection of Selected Ghost Stories

প্রথম প্রকাশ : জানুয়ারি ১৯৬৫

প্রকাশক : বিমলকান্তি সাহা
সুবর্ণা প্রকাশনী
৬এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট
কলকাতা - ৭০০ ০৭৩

মুদ্রক : দ্য রেনবো
১০বি আশুতোষ শীল লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : বিমলকান্তি সাহা

ছবি : মদন সরকার

লেজারটাইপ সেটিং : তরুণ মজুমদার
ক্রসলাইন
৬৩/২ডি, সূর্য সেন স্ট্রিট
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

উৎসর্গ

দেবাশিস সেনগুপ্ত

শুভাশিস সেনগুপ্ত

পিনাকী রায়

ইন্দ্রনিভ রায়

স্নেহাস্পদেষু

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

ভূত আছে কি নেই এ নিয়ে বহু তর্ক রয়েছে। ভূত বা ভগবান যে যাই বলুক আমাদের হৃদয়ে পাশাপাশি জড়িয়ে আছে। তাই এদের নিয়ে যেসব কাহিনী রচিত তার আকর্ষণ ছোট বড় সকলের কাছে।

এক জায়গায় তাদের জড় করেছি অনেক বেছে। বিভিন্ন রসের, বিভিন্ন ধরনের ভূতেদের কান্ড-কারখানা তুলে ধরা হয়েছে। তারা নিজেরাই বেশ সহজে সহাবস্থানের ব্যাপারটা মেনে নিয়েছে। মোট পঁয়ত্রিশটি গল্প আছে; সব কটির স্বাদই আলাদা। আরো গল্প হয়তো দেওয়া যেত, কিন্তু বইয়ের আকার একটা নির্দিষ্ট আয়তনে রাখার জন্য রাশ টানতে হয়েছে।

'যখন অন্ধকার', 'কে পিছনে', 'কাজের লোক', 'সাতভূতুড়ে', 'উপচার', 'ভূত নেই পেত্নী নেই', 'ঝরাপাতা' গল্প কটির আবেদন একটু অন্য রকমের।

সুপ্রসিদ্ধ মননশীল কবি ভূমেন্দ্র গুহর প্রথম গল্প কুরুশের কাজ। গদ্য লেখার ক্ষেত্রে প্রথম লেখাতেই তিনি যে সুন্দর নিটোল বুনুনির কাজ দেখিয়েছেন তা এক পরমপ্রাপ্তি। অরুণ আইনের কাল মোরগ অতৃপ্ত আত্মার প্রতিশোধ স্পৃহার কাহিনী। যা পড়লে গা ছমছম করে।

ঠিক গা ছমছমে ভূতের গল্প আজকাল আর পাঠকরা চায় না। তারা ধারালো যুক্তিঅলা গল্প খোঁজে। সেই সঙ্গে বুদ্ধিগ্রাহ্য লেখা। কারণ এখনকার সাহিত্যে ভূতের প্রতিযোগী কল্পবিজ্ঞান যা বুদ্ধিকে শাণিত করে।

এই গল্পগুলো পাঠক-পাঠিকাদের ভাল লাগুক এই আশা নিয়ে তাদের ধন্যবাদ আগেই জানিয়ে রাখলাম।

সম্পাদক

অশরীরী/ লীলা মজুমদার



এখন আমি একটা খবরের কাগজের আপিসে কাজ করলেও এক বছর আগেও একটা সাংঘাতিক গোপনীয় কাজ করতাম। সে কাউকে বলা বারণ। বললে আর দেখতে হত না, প্রাণটা বাঁচতই না, তার ওপর সব চাইতে খারাপ কথা হল যে, চাকরিটাও চলে যেত। তবে এটুকু বলতে দোষ নেই যে, কাজটা ছিল খবর সংগ্রহ করা। কোথায়, কেন, কার জন্য সে-সব তোমরাই ভেবে নিও।

আমার বয়স তখন ২২; নামটা আর বললাম না। আমাদের পাড়ার হরিশ খুড়ো চাকরিটা করিয়ে দিয়েছিলেন। প্রথম দিনেই আমার বড়-সায়েব—সায়েব হলেও তিনি কুচকুচে কালো—আমাকে বলেছিলেন, "দেখ, সর্বদা নেই হয়ে থাকবে। তুমি আদৌ আছ সে-কথা টের পাওয়া গেলে চলবে না। তোমার আলাদা একটা চেহারা, কিংবা চলা-ফেরা, কিংবা কথা-বলার ধরন গজালেই চাকরিটা যাবে। পানা-পুকুরে এক ফোঁটা ময়লা জল হয়ে থাকবে; সমুদ্রের ধারে এক কণা বালি হবে; এক কথায় স্রেফ অশরীরী হয়ে যাবে। কথা বললে কী বলছ বোঝা যাবে, কিন্তু আলাদা করে গলার আওয়াজ মালুম দেবে না। আর সব চাইতে বড় কথা হল যে, নিজের চেহারা বলে কিছু রাখতে পাবে না, যাতে তুমি মরে গেলেও তোমাকে শনাক্ত করা না যায়। ও-রকম করে তাকাচ্ছ কেন, এ কিছু শক্ত কাজ নয়, কিচ্ছু করতে হবে

না, স্রেফ নেই হয়ে থাকতে হবে। বেশি লেখা-পড়া জানারও দরকার নেই। বলো, পারবে তো?"

আমি বললাম, "আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যার।"

বড়-সায়েব বেজায় রেগে গেলেন, "ফের কথার ওপর কথা! চুপ করে থাকতেও কি শেখাতে হবে নাকি? কি নাম তোমার?

আমি কোনো উত্তর দিলাম না।

বড়-সাহেব খুব খুশি হয়ে বললেন, "খুব ভাল। মাইনে নেবার সময় নাম লিখবে না, টিপ-সই দেবে না। নাম ভাঁড়ানো যায়, কিন্তু টিপ-সই দিয়ে সবাইকে চেনা যায়। দুনিয়ার কোনো দুজন লোকের এক রকম আঙুলের ছাপ হয় না। ১লা তারিখে আমার কাছ থেকে মাইনে নিয়ে যাবে, খাতায় লেখা হবে 'নষ্টামি বাবদ দুই শো টাকা'। আচ্ছা, যেতে পারো।"

আমি হাতে রুমাল জড়িয়ে তিনটে আঙুল দেখালাম। বড়-সাহেব হেসে বললেন, "আচ্ছা, তিন শো টাকাই। কিন্তু মনে থাকে যেন, বিপদে পড়লে আমরা বলব, তোমাকে চিনি না।"

ঘর থেকে বেরিয়ে এলাম। শুনলাম আমার নতুন নাম ইংরিজি হরপের 'কিউ'। যেখানে যত সন্দেহজনক খবর শোনা যেত, নিজে দেখে এসে আপিসের পাশের গলিতে ভাঙা টাইপ-রাইটার ভাড়া খাটত, তাতে টাইপ করে জমা দিতে হত। তারপরের ছয়মাসে কোথায় যে না গেলাম, কী যে না দেখলাম, তার ঠিক নেই। অথচ আমাকে কেউ দেখতে পেত না। রাস্তার ভিড়ের মধ্যে একেবারে মিলিয়ে যেতাম। যেখানে ভিড় নেই, শুধু ভাঙা দেয়াল, সেই দেয়ালে একটা দাগ হয়ে মিশে থাকতাম। একবার একটা চোরাই গুদামে সারাদিন শ্রমিকদের একজন হয়ে গিয়ে রাশি রাশি গোপন খবর এনে দিয়েছিলাম। বড়-সাহেব খুশি হওয়ায় মাইনে বেড়ে গিয়েছিল। আরেকবার একটা বিদেশী মালজাহাজে সারাদিন একটা পিপে হয়ে লক্ষ লক্ষ টাকার সোনা খুঁজিয়ে পাইয়ে দিলাম। সেইজন্য খবরের কাগজে বড়-সায়েবের সে কি প্রশংসা!

সে যাই হোক, শেষবারের কাজটার কাছে ও-সব কিছু না। নাকি গড়িয়ার দিকে এতকাল কোনো বে-আইনী কাজ হয়নি, তাইতে সকলের সন্দেহ হল, নিশ্চয় কোনো গোপন ষড়যন্ত্র চলছে। তার ওপর সব বাংলা কাগজে যখন ছোট্ট একটা নোটিস বেরুল— টিপ বোতাম পরিষদের প্রথম সভা গ শু-৭, তখন আমার বুঝতে বাকি রইল না যে গড়িয়াতে, শুক্রবার, সাতটায় গোপন সভা বসবে।

বড়-সাহেবের ঘর থেকে প্রায় অদৃশ্যভাবে বেরিয়ে যাচ্ছি, তাঁর পেয়ারের বেয়ারা বলল, "টিকিট ছাড়া ঢুকতে দেবে না।"

রুমাল জড়িয়ে হাত পাতলাম। সে এক কুচি লাল কাগজ বের করে

বলল, "দু টাকা।" একটা আঙুল দেখালাম। তাকে টাকা দিয়ে টিকিট পকেটে ফেলে চলে এলাম।

শুক্রবার পাঁচটায় যখন বাসে সব চাইতে ভিড় হয়, তখন বেছে বেছে সব চাইতে ভিড়ের বাসে উঠলাম। উঠে চারটে লোকের মধ্যিখানে এমন 'নেই' হয়ে রইলাম যে, কন্ডাক্টর টিকিট চাইল না। চাইবে কেন, আমার তো আর শরীর-টরীর নেই যে বাসের জায়গা জুড়ে থাকব।

গড়িয়াতে নেমেই একটা চায়ের দোকানে ভিড় দেখে, সটান সেখানে গেলাম। এক ভাঁড় বেজায় হালকা, বেজায় গুড়ের চা নিয়ে, তক্তার ওপর দশ পয়সা ফেলে দিলাম। শস্তা তো হবেই, শুকনো শালপ্যাতা দিয়ে এ-সব চা বানাতে হয়, চা-পাতা দিলে আর ঐ দামে দিতে হত না।

ভাঁড় নিয়ে একটা বাঁশের খুঁটির পিছনে গুম হয়ে গেলাম। ভিড়ের মধ্যে হাসা-হাসি হচ্ছিল, ঐ শুক্রবার নিয়ে নাকি চারদিন পকেট মার হয়নি। চট্ করে বুঝে নিলাম সভা তাহলে পকেটমারদের। একটা চিমড়ে লোক চায়ের ভাঁড় শেষ করে, সামনের বাঁশ বাগানের দিকে পা বাড়াতেই, বাকি সব হাঁ-হাঁ করে ছুটে এল— "ও মশাই অমন কাজও করবেন না। ঐ বাঁশ বাগানের পথ দিয়ে একটি মাত্র জায়গায় যাওয়া যায়, সেটি হল গোরে-বাড়ির ভাঙা কেল্লা, ভূতদের থান! দিনের বেলাতেও ও-পথে কেউ যায় না। কাগ-চিল, কুকুর-বেড়ালও না।"

লোকটা ভয়ে-ভয়ে ইদিক-উদিক তাকিয়ে উল্টো দিকে মাঠের পথ ধরল। সকলে হাঁফ ছেড়ে যে যার জায়গায় ফিরে গেল। আমিও সেই সুযোগে ঐ লোকটির পিছন-পিছন চললাম। যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই। মাঠ ভেঙে ঘুরে সে আবার বাঁশ বাগানের ওপারে, সেই রাস্তাটাই ধরল। আমি তার পিছনে 'নেই' হয়ে চললাম। শুকনো পাতার ওপর এতটুকু পায়ের শব্দ হল না, নইলে এতদিন কী শিখলাম।

তার পরেই বুকটা ধড়াস্ করে উঠল। সামনেই একটা প্রকান্ড ভাঙা কেল্লা। সেখানে পৌঁছে পথটাও শেষ হয়ে গেছে। কেল্লার চুড়োটা শুধু দেখা যাচ্ছে, চারদিকে এমন ঘন ঘন বন হয়ে গেছে যে তার বেশি কিছু ঠাওর হল না। লোকটা একটুও দাঁড়াল না, সটান্ বনের মধ্যে দিয়ে সেঁধিয়ে গিয়ে, কেল্লার লোহা-বাঁধানো প্রকান্ড সদর-দরজায় দাঁড়িয়ে, পাশে ঝোলানো একটা দড়ি ধরে টানতেই দরজা খুলে গেল। আমিও তার সঙ্গে সঙ্গে ভিতরে সেঁধিয়ে গেলাম, সে কিছু টেরই পেল না।

ঢুকেই একটা প্যাসেজ, তার ও-ধারেই মস্ত ঘরে সভা বসেছে। সে কী ভিড়- আর কী ভয়ঙ্কর তর্কাতর্কি! ঘরে একটা জানলা নেই, উঁচু ছাদে কয়েকটা ঘুলঘুলি দিয়ে বাতাস আসে, তাও এমন আড়াল করা যে, বাইরে

ভূত নামাইবার সহজ পদ্ধতি/ আশাপূর্ণা দেবী



নুটুঠাকুর্দা যে এযাবৎকাল ইহলোকে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন, সে খবরটি জানা গেল, তাঁর পরলোক প্রস্থানের খবরে। খবরটা আনল ঠাকুর্দার গ্রামের একটা কাদাখোঁচা-মার্কা ছেলে, একখানা গঙ্গা-মার্কা চিঠি হাতে নিয়ে এসে।

পুজোসংখ্যার প্রথম লেখাটি সবে ধরেছে বেদব্যাস, হঠাই এই বিঘ্ন। চিঠিটা হাতে নিয়ে বলল, "উনি এখনও ছিলেন নাকি?"

"ছিলেন আবার না? আম্মাদের থেকে টনটনে ছিলেন। আপনারা তো মার দেশে যান-টান না। খবরও রাখেন না।"

বেদব্যাস অবশ্য এতে লজ্জায় মারা গেল না। দেশের বাড়ির গ্রাম সম্পর্কে াকুর্দার বাঁচামরার খবর নিয়ে কে মাথা ঘামাতে যাচ্ছে? কিন্তু এই গঙ্গা-মার্কা ঠির আয়োজন করল কে?

চিঠির খামের মুখ খুলতে-খুলতে ভাবল বেদব্যাস, চির-ব্যাচিলার বুড়োর তা না ছেলেমেয়ে, না নাতিপুতি। পাড়ার লোকেরাই বোধহয়...

ভাবতে-ভাবতেই খাম খুলে ঠিকরে উঠল উঠতি-লেখক বেদব্যাস বটব্যাল, আবার কী চিঠি!

সামাজিক ইতিহাসে এমন একটা চিঠি আর কখনও কেউ দেখেছে? য়ের চিঠির তারিখ কখনও-কখনও কেটে লাইনের মাথার ওপর হাতে লিখে ন্য. তারিখ বসানো দেখেছে লোকে, বেদব্যাসও দেখে থাকবে। কত কারণেই

তো বিয়ের তারিখ বদল হয়। কিন্তু শ্রাদ্ধের ছাপা চিঠিতে হাতে-লেখা তারিখ!

তবে এটিতে তারিখের জায়গাটি ফাঁকাই ছিল। যেমন অনেক সময় দোকানের বিল-বইটই এক দশকের মতো ছাপা থাকে। বছরে বছরে বসিয়ে যাও উনিশশো একাশি, উনিশশো বিরাশি, উনিশশো-ইত্যাদি। কিন্তু এটা কি বিল-বই? তাই ফাঁকা রেখে শূন্য স্থান পূরণ!

আর চিঠির প্রেরক?

দেখে ঠিকরেই উঠতে হল। 'নিবেদক' হচ্ছেন স্বয়ং চন্দ্রবিন্দু হয়ে যাওয়া নুটুবিহারী সরকার।

বেদব্যাস বলে উঠল "কী এ? ঠাট্টা, না তামাশা, নাকি ইয়ার্কি, নাকি স্রেফ মামদোবাজি!"

ছেলেটা দেখতে কাদাখোঁচা, কিন্তু কথাতে বেশ খোঁচাই আছে, 'কাদা'ভাব নেই।

বলল, "সেটা বরং সুবিধে পেলে তাঁকেই জিজ্ঞেসা করবেন। তবে পাছে ওনার শ্রাদ্ধে ঘটা না হয় তাই উনি বহু আগে থেকেই এই সব বিধি-ব্যবস্থা করে রেখে গেছেন। চিঠি ছাপিয়ে নেমন্তন্নিদের লিস্টি করে তাদের নাম ঠিকানা লেখা খামের গোছা, ভোজের দিনের রান্নার মেনু, খরচপত্রের আনুমানিক হিসেব ইত্যাদি সব গুছিয়ে রেখে গেছেন, আমাদের 'মশা গ্রাম যুবক সংঘ ক্লাবের' সেক্রেটারি বটুকদার কাছে। এই যে নেমন্তন্নপত্তরের ও-পিঠে রান্নার মেনু ছাপা। পাছে বটুকদা কিছু ঘাটতি করেন, আপনারা ধরতে পারবেন।"

বেদব্যাস হতাশ হয়ে বলে, "ইদানীং কি উনি পাগল-টাগল হয়ে গিয়েছিলেন নাকি?"

"জানি না স্যার! পাগল না, ভূতাশ্রিত। তবে কিছুকাল থেকে ভূতটুত নিয়ে রিসার্চ করছিলেন।"

"ভূত নিয়ে রিসার্চ! সেটা আবার কি?"

"কী সেটাও জানতে হলে ওঁর কাছেই যেতে হবে।"

বেদব্যাস একটু চড়া গলায় বলে ওঠে, "তা উনি যে ভূত নিয়ে রিসার্চ করছিলেন, সেটাই বা জানলে কি করে?"

"জানলাম কমনসেন্স দিয়ে। যদি কারও ফাঁকা বাড়ি থেকে বিচিত্র সব গলার স্বর শোনা যায়, খোনা গলা, খ্যানখেনে গলা, হেঁড়ে গলা, মিহি গলা, উট্‌কো গলা, ভুট্‌কো গলা, ঢ্যাবঢেবে গলা, টনটনে গলা, আর তার সঙ্গে ঠাকুর্দার মিচকে গলার বুকনি, তো কি বুঝতে হয়? চিরটাকাল তো রিসার্চ করাই বাতিক ছিল। ঘাস নিয়ে ফড়িং নিয়ে কেঁচো নিয়ে কেন্নো নিয়ে উইপোকা নিয়ে। শেষ জীবনে ভূত নিয়ে পড়বেন এ আর আশ্চয্যি কি?"

চিঠিখানা হাতে নিয়ে তাতে চোখ রেখেই বেদব্যাস বলে, "শেষটায় কি হয়েছিল?"

"হবে আবার কী! হয়েছিল বয়েস", ছেলেটার গলার স্বরে তাচ্ছিল্য, "বয়েসের কি গাছপাথর ছিল?"

তা কথাটা অবশ্য মিথ্যে নয়। নুটুঠার্কুদা বেদব্যাসের বড়ঠার্কুদার অর্থাৎ বাবার জ্যাঠামশাইয়ের ক্লাসফ্রেণ্ড। সেই সূত্রেই যোগসূত্র। আগে আগে নুটুঠাকুর্দার এখানে খুব আসা-যাওয়া ছিল। খুদে বেদব্যাসকে বেশ সুচক্ষে দেখতেন তিনি।

কিন্তু কোথায় বা সেই ফ্রেণ্ড-ট্রেণ্ড। কোন কালে তেনারা সব কাটা-ঘুড়ির মতো সুতো কেটে কোথায় গিয়ে লটকে পড়েছেন। নুটু সরকার যদি চিরকাল লাটাইয়ে সেঁটে বসে থাকেন, কে কত পারবে তাঁর সঙ্গে যোগসূত্র বজায় রাখতে?

বেদব্যাস বলল, "শেষ সময় কাছে কে ছিল-টিল?"

"কে আবার থাকবে ওই ভূতেরা ছাড়া! সন্ধের পর আর কেউ ওনার বাড়ির ত্রিসীমানা মাড়াত নাকি?"

"তবে ওই আওয়াজ-টাওয়াজ শোনা যেত কি করে?"

"সে একটা কৌশল। পাড়ার ঘন্টেশ্বর ওঝা ওনার ওই ভূত-ভূতুড়ে রিসার্চের কথা শুনে একটা 'দূরশুনুনি' যন্তর বানিয়ে সেটাই দূর থেকে কানে নিয়ে বসে থাকত মাঝ-রাত্তিরে। কিন্তু লাভ কিছু হত না। কথার শব্দই পাওয়া যেত, ভাষা বোঝা যেত না। ভূতের ভাষা কে বুঝবে? দূরশুনুনি মানে? মানে আবার কি? যেমন 'দূরভাষিণী' তেমনি দূরশুনুনি। ঘন্টেশ্বর অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে বানিয়েছিল।

"কী ভাগ্যিস, রাতে মরেননি। মরেছেন দিনদুপুরে পুকুরে ছিপ ফেলে মাছ ধরতে ধরতে!"

বেদব্যাস মনে মনে একবার তার বড় ঠাকুর্দার বয়েসের হিসেব কষে নিয়ে অবাক হয়ে বলল, "এখনও মাছ ধরতেন?"

"ডেইলি। শুধু ধরতেন? সে মাছ নিজের হাতে কেটেকুটে জম্পেশ করে রেঁধে-বেড়ে তোয়াজ করে খেতেন, পাড়ায় বিলোতেন। কাজকর্ম করে দেবার জন্যেও একখানা তোফা লোক ঠিক করেছিলেন", হেঁ-হেঁ করে হেসে ছেলেটা বলে, "গাঁয়ের ছাপমারা ডাইনি বাতাসিবুড়ি, ছেলেপুলেকে যার ছায়া মাড়াতে দেওয়া হয় না, বাঁশবনের ধারে একখানা কুঁড়ে বেঁধে থাকে, সেই বাতাসিবুড়িই ছিল ওঁর 'কাজকরুনি'। বলতেন আমার তো আর 'নজর' লাগবে না রে বাবা! আর তো কেউ ওকে চাকরি দেবে না। মানুষটা অনাহারে মরবে। 'ডাইনি' যেন মানুষ। আসলে ভূত-প্রেত-ডাইনি নিয়েই ছিল কারবার। তবে হ্যাঁ, মিথ্যে বলব না, আমাদের ক্লাবে মোটা টাকা চাঁদাটাদা দিতেন। তা দেবেন নাই বা কেন? পয়সাকড়ি তো ছিল বিস্তর। ওয়ারিশান বলতে কেউ নেই!"

যেন, পয়সাকড়ি থাকলেই এবং ওয়ারিশান না থাকলেই লোকে যুবক সঙ্ঘে মোটা টাকা চাঁদা দেয়।

বেদব্যাস এখন চিঠিটা খুলে আবার নিরীক্ষণ করে পড়ে। চিঠির বয়ান এই:

সবিনয় নিবেদন

মহাশয়!

বিগত ২৩শে বৈশাখ ১৩৩১, ইং ৬ই মে উনিশশো পঁচাশি, আমি মশাগ্রাম নিবাসী শ্রীনুটুবিহারী সরকার সজ্ঞানে পরলোক গমন করিয়া চন্দ্রবিন্দু নুটুবিহারী হইয়াছি। আগামী ৩১শে বৈশাখ ১৩৩১ আমার আদ্য মধ্য বরাদ্দ, ইত্যাদি যাবতীয় শ্রাদ্ধাদি কার্য সম্পন্ন হইবে। অতএব মহাশয়, আপনি উক্ত দিবসে মদীয় মশাগ্রাম সরকারপাড়াস্থিত প্রাক্তন গৃহে শুভাগমন করিয়া আহারাদি করিয়া আমাকে কৃতকৃতার্থ করিবেন।

পত্রদ্বারা নিমন্ত্রণের ত্রুটি 'অমার্জনীয়' হইলেও অত্র ক্ষেত্রে অবশ্যই মার্জনীয়। ইতি—

সৌভাগ্যবান
নুটুবিহারী সরকার
গ্রাম — মশা, জেলা — বর্ধমান
তাং

অপর পৃষ্ঠায় ছাপানো মেনু:

১। শাকভাজা
২। ছ্যাঁচড়া
৩। মুড়ো সহযোগে ছোলার ডাল
৪। আলুপটলের দম
৫। রুইমাছের কালিয়া
৬। চিংড়ির মালাইকারি
৭। ইলিশের সর্ষে-ঝাল
৮। ভেটকির ফ্রাই
৯। কাঁচা আমের চাটনি
১০। পাঁপরভাজা
১১। দই, দরবেশ, সন্দেশ, রসগোল্লা, বোঁদে, অমৃতি, মিঠে পান

মেনুর তলায় লেখা:

অনুগ্রহ করিয়া নির্লজ্জভাবে চাহিয়া চিন্তিয়া খাইয়া, পরলোক আগত আমার আত্মার শান্তি বিধান করিবেন।

বেদব্যাস চিঠিটা মুড়ে মুঠোয় রেখে বলে, "এই ঢালাও কারবারের খরচটি কে দেবে? ওঁর তো আর..."

"দাদা, বললাম তো সব ব্যবস্থা নিজেই করে গেছেন। টাকা ধরে দিয়েছেন বিস্তর, আমাদের ওই সেক্রটারির হাতে।"

"অদ্ভুত! মাথাটাথা ঠিক ছিল বলে মনে হয় না।"

"বলেন কী দাদা! বেঠিক মাথায় এত নির্ভুল কাজ হয়? হালুইকর ঠাকুরদের পর্যন্ত আগাম কিছু দিয়ে বায়না করে রেখে গেছেন, পানের দোকানে অর্ডার বুক করে রেখে গেছেন। আগে থেকে সব কাজ করে রাখাই ছিল বুড়োর 'হবি'। রাত নটার ট্রেন ধরতে সকাল নটায় স্টেশনে গিয়ে বসে থাকতেন। আচ্ছা আমি উঠি, অনেক জায়গায় যেতে হবে। লম্বা লিস্ট। বাদটাদ পড়ে গেলে শেষে ভূতে ঘাড় মটকাবে বাবা! ও হ্যাঁ, ভাল কথা। ইশ, আসল কথাটাই ভুলে যাচ্ছি। আপনার নামে একটা প্যাকেট দিয়ে গেছেন।"

"আমার নামে!"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, তাই তো দেখছি। আপনিই তো সাহিত্যিক বেদব্যাস বটব্যাল? পদবিটা ভারী মজার, না? শুনলেই কেমন 'ব্যাটবল-ব্যাটবল' মনে হয়।"

হাতের ব্যাগের মুখ খুলে ছেলেটা আষ্টে-পৃষ্ঠে গালা-মোহর করা একটি প্যাকেট বার করে বেদব্যাসের দিকে এগিয়ে দেয়। মনে হচ্ছে, একটা চটি-বই।

"আচ্ছা, নমস্কার। আসবেন তা হলে ওইদিনে আমাদের গ্রামে। শুধু আমাদের কেন, আপনারও গ্রাম।"

ছেলেটা চলে যাবার পর বেদব্যাস একটু লজ্জিতভাবে ভাবতে থাকে, উনি মনে করে আমার জন্যে কিছু রেখে গেছেন। অথচ আমি তো ওঁকে...।

খুলে ফেলে প্যাকেটটা।

বই নয়, একখানি বাঁধানো খাতা। তার সঙ্গে একটা চিঠি। বেদব্যাসের নামে।

লম্বা চিঠি।

চিঠিটাই আগে খুলে পড়তে থাকে বেদব্যাস।

পরম কল্যাণবরেষু,

শ্রীমান বেদব্যাস, আশা করি তোমার সর্ববিধ কুশল। পরে লিখি যে, তুমি আমার পরমবন্ধু 'ফুলু'র নাতি। সেই হিসাবে আমারও নাতি। সেই দাবিতেই এই পত্র।

শুনিয়াছি, তুমি লেখক হইয়াছ, ম্যাগাজিনে-ম্যাগাজিনে তোমার রচনা প্রকাশিত হয়। গ্রন্থাদিও ছাপা হইয়াছে, তাই তোমার উপরই ভার দিতেছি।

দীর্ঘজীবনের ফলে একে একে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়জন সকলেই বিদায় লইতেছে। আমার কালের কেউই আর বাঁচিয়া নাই। অথচ এ-কালের যাহারা, তাহারা আমাকে মানুষ বলিয়া গণ্যই করে না। হাসে, ব্যঙ্গ করে। সে যাক, এই নিঃসঙ্গতার ফলে আমি মরিয়া হইয়া প্ল্যানচেটে আমার পরলোকগত বন্ধুদের

নামাইয়া আনিতে থাকি, এবং ক্রমশ তাহাদিগের সঙ্গে পূর্বকালের মতোই মজলিশ করি, আড্ডা জমাই, দাবা খেলি।

আমার প্রথম চেষ্টা সফল হয় ফুলুকে ডাকিয়া। ক্রমশ ফুলুই আমার পরলোক ও নরলোকের মধ্যে 'ডাকবিভাগ' খুলিয়া দিয়া সর্বদা আদান-প্রদানের পথ প্রশস্ত করিয়া দেয়। ক্রমেই আমি আমার গৃহে আমার সমস্ত মৃত পরিচিতজনকে নামাইয়া আনিয়া সমীক্ষা চালাইতেছিলাম। পরলোক জায়গাটা কী রূপ, সেখানে বসবাসের অবস্থা কেমন, সেখানে গিয়া ইহলোকের জন্য মন কেমন করে কি না ইত্যাদি। এই সমীক্ষার ফলে পবলোক সম্পর্কে মোটামুটি একটি ধারণা গড়িয়া তুলিতে পারিয়াছিলাম। জানিলাম, সেখানেও জমির ভীষণ ডিমাণ্ড, একটি 'আত্মাপ্রমাণ' জমিও প্রায় দুর্লভ। জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে আত্মারা ঠাসাঠাসি গাদাগাদি করিয়া জীবন কাটাইতেছে। এই খবরে উদ্বিগ্ন হইয়া আমি ফুলুকে দিয়া আমার জন্য একটু জমি অগ্রিম বুক করিয়া রাখিয়াছি। সেই জমিতে যে বাড়ি করিয়া লইব তাহার প্ল্যানও প্রস্তুত। তবে মুশকিল এই, এখান হইতে বাড়ি বানাইবার মালমশলা বা টাকাকড়ি কিছুই লইয়া যাইবার উপায় নাই। যাহা হউক, সবই শোনা কথা। নিজে গিয়া না দেখিলে কিছুই বোঝা সম্ভব নয়।

আমার একান্ত ইচ্ছা, আমি সেখানে গিয়া ইহলোকের কোনও সংবাদপত্রের বিশেষ সংবাদদাতা হইব, যেরূপ এখন এখানে 'রাজধানীর চিঠি' বা 'লন্ডনের চিঠি' ইত্যাদি দেখিতে পাই সেইরূপ সপ্তাহে সপ্তাহে পরলোকের চিঠি নামক একটি ফিচারের ব্যবস্থা করিতে ইচ্ছা করিতেছি। তোমাকেই তাহার সহায়ক হইতে হইবে।

বিজ্ঞানের এত উন্নতি হইতেছে, বিজ্ঞানীরা মহাকাশযান পাঠাইয়া মহাকাশের তথ্য জানিয়া ফেলিয়াছে, অথচ কেহই আজ পর্যন্ত তুচ্ছ একটি 'পরলোক সার্ভিস' খুলিতে পারিল না। তো, এই অভাব নিরসনের জন্য সম্প্রতি আমি 'ভূত নামাইবার সহজ পদ্ধতি' আবিষ্কার করিয়া একটি পুস্তক রচনা করিয়াছি। সেই পুস্তক দেখিয়া, যে কেহ অতি সহজে ভূত নামাইতে পারিবে ও সরাসরি সেখানের খবর সংগ্রহ করিতে পারিবে। অপরকে সে খবর সাপ্লাই করিতেও পারিবে মনে হইয়াছে, এই কাজের যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি তুমিই। তুমি আমায় নামাইয়া ফেলিয়া তথ্য সংগ্রহ করিবে এবং চটপট সেগুলি গুছাইয়া লিখিয়া পত্রপত্রিকায় পাঠাইবে। আমি তোমাকে গ্যারান্টি দিতেছি যে-পত্রিকায় ইহা ছাপা হইবে তাহা হটকেকের মতো বিক্রয় হইবে। কারণ ইতিপূর্বে কেহ পরলোক হইতে প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ পড়ে নাই। যে যা লেখে অনুমানে ও কল্পনায়। আর এ একেবারে তাজা সত্য।

অবিলম্বে কোনও পত্রিকার সহিত যুক্তি করিয়া লও। চিঠির সঙ্গে তোমার কাগজ, কলম, আলপিন, পেপারক্লিপ ইত্যাদির জন্য কিছু টাকা রাখিতেছি, গ্রহণ করিও। কিছু মনে করিও না।

আর বলি অতি অবশ্য করিয়া তোমার নুটুঠাকুর্দার শ্রাদ্ধের ভোজে যোগ দিবে। সারাজীবন কেবল অপরের বাড়ির নানা ঘটাপটায় মোচ্ছবের খাওয়া খাইয়া আসিয়াছি, নিজের জীবনে কখনও তেমন মোচ্ছব বসাইবার কোনও অপারচুনিটি পাই নাই। এখন মরণে একবারের জন্য সে অপারচুনিটি জুটিল। সেই ভাবিয়া নিশ্চয় আসিবে। স্নেহ-ভালবাসা জানিবে। ইতি—

তোমার পরলোকগত

নুটুঠাকুর্দা

চিঠির খামের মধ্যে মোটা একগোছা একশো টাকার নোট। অন্তত খানপঞ্চাশেক তো বটেই।

বেদব্যাস কিছুক্ষণ ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে বসে থাকে। তারপর সেই খাতাখানি খোলে। দ্যাখে, খাতার হেডিংই হচ্ছে 'আত্মা নামাইবার সহজ পদ্ধতি'। যথা:

যাকে নামাবার ইচ্ছা আগে তাকে বেশ ভালভাবে চিন্তা করে নিয়ে ঘর অন্ধকার করে, সাদা কাগজে একটি বড় বৃত্ত আঁকবে। তারপর তার মধ্যে আর একটি বৃত্ত আঁকবে, তারপর তার ভিতরে আর একটি বৃত্ত আঁকবে... তারপর আর একটি, তার আর একটি, তারপর, তারপর, তারপর,... পাতার পর পাতা 'তারপর'...

বেদব্যাসের মাথা ঘুরতে থাকে। তারপর-এর পাতাগুলি উলটে দ্যাখে, অতঃপর একমুঠো সাদা সর্ষে প্রতিটি বৃত্তের মধ্যে দশটি করে স্থাপন করবে। অতঃপর— কালো তিল দিয়ে প্রতিটি বৃত্তের মধ্যে...

বেদব্যাস দ্যাখে পাতার পর পাতা 'অতঃপর'।

বেদব্যাসের চোখ জ্বালা করতে থাকে। অতঃপরের পৃষ্ঠাগুলো উলটে ফেলে। দেখতে পায়, 'তৎপরে'।

চলতে থাকে এই তৎপরে!

তৎপরের অধ্যায় শেষ হলে 'এইবার'...

পাতার পর পাতা চলতে থাকে 'এইবার'। ভূত বা আত্মা নামাবার এই সহজ পদ্ধতিটি দেখতে দেখতে বেদব্যাসের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে, চোখে ধোঁয়া দেখতে থাকে, বুক-ধড়ফড় করতে থাকে, কান-কটকট আর পেট ব্যথা করতে থাকে।

বেদব্যাস শুয়ে পড়ে ভাবতে থাকে, টাকাটা কোন সহজ পদ্ধতিতে নুটুঠাকুর্দাকে ফেরত দেওয়া যায়। না দিতে পারলেই তো বিবেকের অথবা ভূতের কামড়। ❑

এক ভৌতিক মালগাড়ি আর গার্ড সাহেব/ বিমল কর



সেকি আজকের কথা! চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছর আগের ঘটনা। আমার তখন কী বা বয়েস; বছর বাইশ। অনেক কষ্টে একটা চাকরি পেয়েছিলাম রেলের। তাও চাকরিটা জুটেছিল যুদ্ধের কল্যাণে। তখন জোর যুদ্ধ চলছে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। আমাদের এখানে যুদ্ধ না হোক, তোড়জোড়ের অন্ত ছিল না। হাজারে হাজারে মিলিটারি, শয়ে শয়ে ক্যাম্প, যত্রতত্র প্লেনের চোরা ঘাঁটি, রাস্তাঘাটে হামেশাই মিলিটারি ট্রাক আর জিপ চোখে পড়ত।

ওই সময়ে সব জায়গাতেই লোকের চাহিদা হয়েছিল, কল-কারখানায়, অফিসে, রেলে। মিলিটারিতে তো বটেই।

চাকরিটা পাবার পর আমাদের মাস তিনেকের এক ট্রেনিং হল, তারপর আমায় পাঠিয়ে দিল মাকোড়া সাইডিং বলে একটা জায়গায়। সে যে কী ভীষণ জায়গা আজ আর বোঝাতে পারব না। বিহারেরই একটা জায়গা অবশ্য, মধ্যপ্রদেশের গা ঘেঁষে। কিন্তু জঙ্গলে আর ছোট ছোট পাহাড়ে ভর্তি। ওদিকে মিলিটারিদের এক ছাউনি পড়েছিল। শুনেছি গোলা-বারুদও মজুত থাকত। ছোট একটা লাইন পেতে মাকোড়া থেকে মাইল দেড় দুই তফাতে ছাউনি গাড়া হয়েছিল।

স্টেশন বলতে দেড় কামরার এক ঘর। মাথার ওপর টিন। ইলেকট্রিক ছিল না। প্লাটফর্ম আর মাটি প্রায় একই সঙ্গে। অবশ্য প্লাটফর্মে মোরন ছড়ানো ছিল।

স্টেশনের পাশেই ছিল আমার কোয়ার্টার। মানে মাথা গোঁজার জায়গা। সঙ্গী বলতে এক পোর্টার। তার নাম ছিল হরিয়া। সে ছিল জোয়ান, তাগড়া, টাঙ্গি চালাতে পারত নির্বিবাদে। হরিয়া মানুষ বড় ভাল ছিল। রামভক্ত মানুষ। অবসরে সে আমায় রামজী হনুমানজীর গল্প শোনাত। যেন আমি কিছুই জানি না রাম-সীতার।

হরিয়াকে আমি খুব খাতির করতাম। কেননা সেই আমার ভরসা। হরিয়া না থাকলে খাওয়া বন্ধ। ভাত রুটি, কচুর তরকারি, ভিন্ডির ঘেঁট, অড়হর ডাল, আমড়ার টক— সবই করত হরিয়া। আহা, তার কী স্বাদ! মাছ মাংস ডিম হরিয়া ছুঁত না। আমারও খাওয়া হত না। তা ছাড়া পাবই বা কোথায়! হপ্তায় একদিন করে আমাদের রেশন আসত রেল থেকে। চাল আটা নুন তেল ঘি আলু পিঁয়াজ আর লঙ্কা। ব্যস্।

জায়গাটা যেমনই হোক আমাদের কাজকর্ম প্রায় ছিল না। সারাদিনে একটা কি দুটো মালগাড়ি আসত। এসে স্টেশনে থামত। তারপর তিন চারটে করে ওয়াগন টেনে নিয়ে ছাউনির দিকে চলে যেত। একসঙ্গে পুরো মালগাড়ি টেনে নিয়ে যেত না কখনো। আর প্রত্যেকটা মালগাড়ির দরজা থাকত সিল্ করা। ওর মধ্যে কী থাকত জানার উপায় আমাদের ছিল না। বুঝতে পারতাম, গোলাগুলি ধরনের কিছু আছে। হরিয়া তাই বলত।

আমি অবশ্য অতটা ভাবতাম না। মালগাড়ির দরজা 'সিল্' করা থাকবে-এ আর নতুন কথা কী! তার ওপর মিলিটারির বরাদ্দ মালগাড়ি। খোলা মালগাড়িতে আমরা যে তারকাঁটা, লোহা-লক্কড় দেখেছি।

মালগাড়ি ছাড়া আসত অদ্ভুত এক প্যাসেঞ্জার ট্রেন। জানলাগুলো জাল দিয়ে ঘেরা। ভেতরের শার্সি ধোঁয়াটে রঙের। কিছু দেখা যেত না। দরজায় থাকত রাইফেলধারী মিলিটারি। হপ্তা দু হপ্তা বাদে এই রকম গাড়ি আসত। দু এক মিনিটের জন্যে দাঁড়াত। আমাকে দিয়ে কাগজ সই করাত। তারপর চলে যেত ছাউনির দিকে। গাড়িটা যতক্ষণ স্টেশনে দাঁড়িয়ে থাকত— ততক্ষণ কেমন এক গন্ধ বেরুতো। ওষুধ-ওষুধ গন্ধ।

সঙ্গী নেই, সাথী নেই, লোক নেই কথা বলার, একমাত্র হরিয়াই আমার সাথী। দিন আমার বনবাসে কাটতে লাগল। এসেছিলাম গরমকালে, দেখতে দেখতে বর্ষা পেরিয়ে গেল, অতিষ্ঠ হয়ে উঠলাম। মনে হত পালিয়ে যাই। কিন্তু যাব কেমন করে। চাকরি পাবার লোভে বন্ড সই করে ফেলেছি। না করলে হয়ত চলত। কিন্তু সাহস হয়নি।

আমার সবচেয়ে খারাপ লাগত মালগাড়ির গার্ড-সাহেবগুলোকে। ওরা কেউ মিলিটারি নয়, কিন্তু স্টেশনে গাড়ি দাঁড় করিয়ে রেখে দু চার ঘন্টা সময় যা কাটাত, কেউ এসে গল্পগুজব পর্যন্ত করত না। ওরা কোন লাট-বেলাট বুঝতাম

না। কাজের কথা ছাড়া কোনো কথাই বলত না। আর এটাও বড় আশ্চর্যের কথা, গার্ডগুলো যারা আসত— সবই হয় মাদ্রাজী, অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, না-হয় গোয়ানিজ ধরনের।

একজন গার্ড শুধু আমায় বলেছিল, চুপি চুপি, "কখনো কোনো কথা জানতে চেয়ো না। আমরা মিলিটারি রেল সার্ভিসের লোক। তোমাদের রেলের নয়। আমরা আমাদের ওপরঅলার হুকুমে কাজ করি। আর কোনো কথা জিজ্ঞেস করবে না। কাউকে কিছু বলবে না।"

সেদিন থেকে আমি খুব সাবধান হয়ে গিয়েছিলাম।

সব জিনিসেরই একটা মাত্রা আছে। ওই জঙ্গলে, ওইভাবে একা পড়ে থাকতে থাকতে ছ'মাসের মধ্যেই আমি যেন কেমন হয়ে গেলাম। পাগল পাগল লাগত নিজেকে। হরিয়াকে বলতাম, "চল্ পালিয়ে যাই।"

হরিয়া বলত, "আরে বাপ রে বাপ।" বলত, "অমনি কাজ করলে হয় ফাটকে ভরে দেবে, না হয় ফাঁসিতে লটকে দেবে। অমন কাজ করবে না বাবু!"

ভয় আমার প্রাণেও ছিল। পালাব বললেই তো পালানো যায় না।

সময় কাটাবার জন্যে আমি প্রথমে অনেক বলে-কয়ে দু প্যাকেট তাস আনাই। রেশনের চাল-ডালের সঙ্গে তাস পাঠিয়ে দেয় এক বন্ধু। পেশেন্স খেলা শুরু করি। তবে কত আর পেশেন্স খেলা যায়! তাসগুলোয় ময়লা ধরে গেল।

তারপর শুরু করলাম রেলের কাগজে পদ্য লেখা। এগুতে পারলাম না। পদ্য লেখা বড় মেহনতের ব্যাপার।

শেষে পেনসিল আর কাগজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসলাম। স্কুলে আমি ছেবেবেলায় ড্রয়িং ক্লাসে 'কেটলি' এঁকেছিলাম, ড্রয়িং স্যার আমার আঁকা দেখে বেজায় খুশি হয়ে বলেছিলেন, 'বাঃ! বেশ লাউ এঁকেছিস তো! এক কাজ কর— এবার লাউ আঁকতে চেষ্টা কর 'কেটলি' হয়ে যাবে।... তুই সব সময় উলটে নিবি। তোকে বলল, বেড়াল আঁকতে, তুই বাঘ আঁকা শুরু করবি, দেখবি বেড়াল হয়ে গেছে।'

লজ্জায় আমি মরে গিয়েছিলুম সেদিন। তারপর আর ড্রয়িং করতে হাত উঠত না। বন্ধুদের দিয়ে আঁকিয়ে নিতুম।

এতকাল পরে আবার ছবি আঁকতে বসে দেখলুম, ভূত-প্রেত দানব-দত্যিটা হাতে এসে যায়। গাছপালা মানুষ আর আসে না।

ছবি আঁকার চেষ্টাও ছেড়ে দিলাম। তবে হিজিবিজি ছাড়তে পারলাম না। কাগজ পেনসিল হাতে থাকলেই কিম্ভূতকিমাকার আঁকা বেরিয়ে আসত।

এইভাবে শরৎকাল চলে এল। চলে এল না বলে বলা উচিত শরৎকালের

মাখামাখি হয়ে গেল। ওখানে অবশ্য ধানের ক্ষেত, পুকুর, শিউলি গাছ নেই যে চট্ করে শরৎকালটা চোখে পড়বে। ধানের ক্ষেতে মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে কেউ ডাকার নেই, পুকুর নেই যে শালুকে শাপলায় পুকুর ভরে উঠবে, আর একটাও শিউলি গাছ নেই যে সন্ধে থেকে ফুলের গন্ধে মন আনচান করবে।

ও-সব না থাকলেও, আকাশ আর মেঘ, আর রোদ বলে দিত শরৎ এসেছে। একটা জায়গায় কিছু কাশফুলও ফুটেছিল।

এই সময় একদিন এক ঘটনা ঘটল।

তখন সন্ধে রাত কী সবেই রাত শুরু হয়েছে, এঞ্জিনের হুইসল শুনতে পেলাম। রাতের দিকে আমাদের ফ্ল্যাগ স্টেশনে ট্রেন আসত না। বারণ ছিল। একদিন শুধু এসেছিল।

কোয়ার্টারে বসে এঞ্জিনের হুইসল শুনে আমি হরিয়াকে বললাম, "তুই কচুর দম বানা; আমি দেখে আসছি।" বলে একটা জামা গায়ে চাপিয়ে বেড়িয়ে পড়লাম। কোয়ার্টার থেকে স্টেশন পঁচিশ ত্রিশ পা।

বাইরে বেরিয়ে যেন চমক খেলাম। মনে হল, যেন সকাল হয়ে এসেছে। এমন ফরসা! আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি টলটল করছে চাঁদ। এমন মনোহর চাঁদ জীবনে দেখিনি। কী যে সুন্দর কেমন করে বোঝাই। মনে হচ্ছে, রুপোর মস্ত এক ঘড়ার মুখ থেকে কলকল করে চাঁদের আলো গড়িয়ে পড়ছে নিচে। জ্যোৎস্নায় আকাশ বাতাস মাটি— সবই যেন মাখামাখি হয়ে রয়েছে। এ-আলোর শেষ নেই, অন্ত নেই রূপের। আকাশের দু এক টুকরো মেঘও সরে গেছে একপাশে, চাঁদের কাছাকাছি কিছু নেই, শুধু জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছে।

স্টেশনে এসে দরজা খুললাম। তার আগেই চোখে পড়েছে, অনেকটা দূরে এক মালগাড়ি দাঁড়িয়ে। এঞ্জিনের মাথার আলো জ্বলছে না। ড্রাইভারের পাশের আলোও নয়।

দরজা খুলে আমাদের লণ্ঠন বার করলাম। লাল সবুজ লণ্ঠন। লণ্ঠনের মধ্যে ডিবি ভরে দিলাম জ্বালিয়ে।

বাইরে এসে হাত নেড়ে নেড়ে লণ্ঠনের সবুজ আলো দেখাতে লাগলাম। মানে, চলে এস, স্টেশন ফাঁকা, লাইন ফাঁকা।

ট্রেনটা এগিয়ে এল না।

কিছুক্ষণ পরে দেখি মালগাড়ির দিক থেকে কে আসছে। হাতে আমার মতনই লাল-সবুজ লণ্ঠন। তার হাঁটার সঙ্গে লণ্ঠন দুলছিল।

আমি দাঁড়িয়ে থাকলাম। ব্যাপারটা বুঝতে পারছিলাম না। এ-রকম ঘটনা আগে ঘটেনি।

লোকটা কাছাকাছি আসতে চাঁদের আলোয় আমি তার পোশাকটা দেখতে পেলাম। সাদা পোশাক। গার্ড সাহেবের পোশাক।

দেখতে দেখতে গার্ডসাহেব একেবারে কাছে চলে এল। সামনে।

আমি অবাক হয়ে লোকটাকে দেখতে লাগলাম। লম্বা. চেহারা, ফরসা, মাথায় কোঁকড়ানো চুল। বাঁ হাতে এক টিফিন কেরিয়ার।

গার্ডসাহেব কাছে এসে দাঁড়াল। দেখল আমাকে। "তুমি এই ফ্ল্যাগ স্টেশনে আছ?"

"হ্যাঁ, স্যার।"

"আমাদের এঞ্জিন বিগড়ে গেছে। মাইল চারেক আগে এঞ্জিনের কী হল কে জানে। থেমে গেল। ড্রাইভাররা চেষ্টা করেও চালাতে পারল না।"

"আচ্ছা!"

"বিকেল থেকে জঙ্গলের মধ্যে পড়ে আছি। কোনো সাহায্য নেই। পাবার আশাও নেই। সন্ধের আগে এঞ্জিন আবার চলতে শুরু করল। ধীরে ধীরে, চাকা ঘষটে। কোনো রকমে এই পর্যন্ত এসেছি। আর এগুনো গেল না।"

আমি বললাম, "তা হলে খবর দিতে হয়, স্যার!"

"হ্যাঁ, মেসেজ দিতে হয়। চল মেসেজ দাও।"

স্টেশনের ঘরে এসে টরে টক্কা যন্ত্র নিয়ে বসলাম। খবর দিতে লাগলাম। ভাগ্যিস টরে টক্কা যন্ত্রটা ছিল। তিন জায়গায় খবর দিয়ে যখন মাথা তুলেছি, দেখি গার্ড সাহেব চেয়ারে বসে বসে ঝিমোচ্ছে।

"দিয়েছ খবর?"

"হ্যাঁ স্যার।"

"এবার তা হলে খাওয়া-দাওয়া যাক। তোমার এখানে নিশ্চয় জল আছে?"

"ওই কলসিতে আছে।"

"ধন্যবাদ।"

গার্ডসাহেব উঠে গিয়ে রেল কোম্পানির মগ আর অ্যালুমিনিয়ামের গ্লাসে করে জল নিয়ে বাইরে গেল।

লোকটা বাঙালি নয়। অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানও নয়। ভাঙা ভাঙা ইংরিজিতে কথা বলছিল। কোথাকার লোক আমি বুঝতে পারছিলাম না। তার হিন্দি বুলিও স্পষ্ট নয়।

হাত-মুখ ধুয়ে এসে লোকটা বলল, "আমি বড় হাংগরি। আমি খাচ্ছি। তুমি কিছু খাবে?"

"না স্যার। আপনি খান।"

"তুমি একটু খেতে পার। আমার যথেষ্ট খাবার আছে।"

"থ্যাংক ইউ স্যার। আমার কোয়ার্টার কাছে। আমাদের রান্না হয়ে গেছে। আপনি খান, আপনার খিদে পেয়েছে। আগে যদি বলতেন আপনাকে আমার কোয়ার্টারে নিয়ে যেতাম। খাবারগুলো গরম করে নিতে পারতেন।"

গার্ড সাহেব আমার দিকে চোখ তুলে কেমন করে যেন হাসল। বলল, "তোমার হাতটা বাড়াবে? বাড়াও না?"

আমি কিছু বুঝতে না পেরে হাত বাড়ালাম।

গার্ডসাহেব টিফিন কেরিয়ার থেকে এক টুকরো মাংস তুলে আমার হাতে ফেলে দিল। হাত আমার পুড়ে গেল যেন। মাটিতে ফেলে দিলাম।

হাসতে লাগল গার্ড সাহেব। হাসতে হাসতে খাওয়াও শুরু করল। আমি কাগজে হাত মুছতে লাগলাম। হাতে না ফোস্কা পড়ে যায় আমার।

খেতে খেতে গার্ড সাহেব বলল, "তোমার নাম কি ছোকরা?"

নাম বললাম।

"এখানে কত দিন আছ?"

"ছ মাসের কাছাকাছি।"

"ভাল লাগে জায়গাটা?"

"না।"

"তা হলে আছ কেন?"

"কী করব! চাকরি স্যার!"

"চাকরি।" গার্ড সাহেব খেতে লাগল। দেখলাম সাহেব খুবই ক্ষুধার্ত। খেতে খেতে সাহেব বলল, "তোমাদের এখানে আজ কোনো ট্রেন এসেছে?"

"না স্যার। আজ কোনো গাড়ি আসেনি।"

"আমি বুঝতে পারছি না— আমার গাড়িটার কেন এ-রকম হল? ভাল গাড়ি, ঠিকই রান্ করছিল। হঠাৎ থেমে গেল কেন?"

"এঞ্জিন ব্রেকডাউন?"

"কিন্তু কেন?... আমরা যখন ওই ছোট নদীটা পেরোচ্ছি, জাস্ট একটা কালভার্টের মতন ব্রিজ, তখন একটা শব্দ শুনলাম। এরোপ্লেন যাবার মতন শব্দ। কিন্তু শব্দটা জোর নয়, ভোমরা উড়ে বেড়ালে যেমন শব্দ হয় সেই রকম। ব্রেকভ্যান থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলাম। আকাশে কিছু দেখতে পেলাম না।"

"নদীর শব্দ?"

"না না; জলের শব্দ নয়।... আশ্চর্যের ব্যাপার কি জানো, দু এক ফার্লং আসার পর এঞ্জিন বিগড়ে গেল।"

"হঠাৎ?"

"একেবারে হঠাৎ। আর একটা ব্যাপার দেখলাম। খুব গরম লাগতে লাগল। এই সময়টা গরমের নয়, জায়গাটাও পাহাড়ী। বিকেলও ফুরিয়ে আসছে। হঠাৎ অমন গরম লাগবে কেন? সেই গরম এত বাড়তে লাগল মনে হল গা হাত-পা পুড়ে যাবে। ড্রাইভাররা পাগলের মতন করতে লাগল। পুরো গাড়িটাও যেন আগুন হয়ে উঠল।"

অবাক হয়ে বললাম, "বলেন কি স্যার?"

"ঘন্টাখানেক এই অবস্থায় কাটল। আমরা সবাই নিচে নেমে দাঁড়িয়ে থাকলাম।"

"তারপর?"

"তারপর গরম কমতে লাগল। কমতে কমতে প্রায় যখন স্বাভাবিক তখন দেখি এঞ্জিনটাও কোনো রকমে চলতে শুরু করেছে।"

"এ তো বড় অদ্ভুত ঘটনা।"

"খুবই অদ্ভুত।... আরও অদ্ভুত কী জানো! আমরা গাড়ি নিয়ে খানিকটা এগুবার পর কোথা থেকে মাছির ঝাঁক নামতে লাগল।"

"মাছির ঝাঁক?" আমার গলা দিয়ে অদ্ভুত শব্দ বেরুল।

"ও! সেই ঝাঁকের কথা বলো না। পঙ্গপাল নামা দেখেছ? তার চেয়েও বেশি। চারদিকে শুধু মাছি আর মাছি। আমাদের গাড়িও ছুটতে পারছিল না যে মাছির ঝাঁক পেছনে ফেলে পালিয়ে আসব। অনেক কষ্টে তাদের হাত থেকে রেহাই পেয়েছি। আমি তো ব্রেক-ভ্যানের জানলা-টানলা বন্ধ করে বসেছিলাম। ড্রাইভাররা মরেছে। জানি না, মাছিগুলো এঞ্জিনের কিছু গোলমাল করে দিয়ে গেল কিনা! তবে, আগেও তো এঞ্জিন খারাপ হয়েছিলো।"

আমি চুপ। অনেকক্ষণ পরে বললাম, "এ-রকম কথা আমি আগে শুনিনি, স্যার।"

"আমারও ধারণা ছিল না।"

গার্ড সাহেবের খাওয়া শেষ। জল খেল। হাত ধুয়ে এল বাইরে থেকে।

"তুমি জানো, এখানের ক্যাম্পে কি হয়?" গার্ড সাহেব জিজ্ঞেস করল।

"না, স্যার। শুনি মালগাড়ি ভরতি করে গুলিগোলা আসে।"

"ননসেন্স।... এখানে প্রিজনারস অব্ ওয়ার রাখা হয়। যুদ্ধবন্দী। ক্যাম্প আছে। বিশাল ক্যাম্প।"

আমার মনে পড়ল প্যাসেঞ্জার ট্রেনের কথা। জানালায় জাল, ধোঁয়াটে কাচ। বললাম, "এখন বুঝতে পারছি, স্যার।"

"তা ছাড়া, হাত-পা কাটা, উন্ডেড্ সোলজারদের চিকিৎসাও করা হয়। মরে গেলে গোর দেওয়া হয়। জান তুমি?"

চমকে উঠে বললাম, "আমি কিছুই জানি না। মালগাড়ি দেখে ভাবতাম..."

"মালগাড়িতে হাজার রকম জিনিস আসে। খাবার-দাবার, বিছানা, ওষুধপত্র, ক্যাম্পের নানান জিনিস।" টিফিন কেরিয়ার গোছানো হয়ে গিয়েছিল গার্ড সাহেবের। একটা সিগারেট ধরাল। আমাকেও দিল একটা। বলল, "থ্যাংক ইউ বাবু।... আমি আমার গাড়িতে ফিরে চললাম। ড্রাইভাররা কী অবস্থায় আছে দেখি গে।... কিন্তু তোমায় সাবধান করে দিয়ে যাচ্ছি, বাবু। বি কেয়ারফুল।... আমার মনে

হচ্ছে, এদিকে কিছু একটা হয়েছে। কী হয়েছে আমি বলতে পারব না। সামথিং পিকিউলিয়ার। ম্যাগ্‌নেটিক্ ডিস্টারবেন্স, না, কেউ এসে নতুন ধরনের বোমা ফেলে গেল কে জানে! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অত মাছি... হাজার হাজার... লাখ লাখ...।”

গার্ড সাহেব চলে গেল।

স্টেশন ঘরের দরজা বন্ধ করে আমি কোয়ার্টারের দিকে আসছিলাম। দূরে গাড়িটা দাঁড়িয়ে আছে। জ্যোৎস্নার আলোয় ধবধব করছে সব। হঠাৎ চোখে পড়ল, মালগাড়িটা কিসে যেন ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। তারপর দেখি মাছি। মাছির বন্যা আসছে যেন। দেখতে দেখতে আমার কাছে এসে পড়ল। বৃষ্টি পড়ার মতন মাছি পড়ছিল। ভয়ে ঘেন্নায় আমি ছুটতে শুরু করলাম।

ছুটতে ছুটতে এসে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। মরে যাবার অবস্থা।

ঘুম ভাঙল পরের দিন। হরিয়া ডাকছিল।

দরজা খুলে বাইরে আসতেই হরিয়া বলল, “বাবু, জলদি..., গাড়ি আয়া।”

স্টেশনে গিয়ে দেখি একটা প্যাসেঞ্জার ট্রেন। সেই জানালায় জাল লাগানো, ধূসর কাচের আড়াল দেওয়া। ওষুধের গন্ধ ছড়াচ্ছে প্লাটফর্মে।

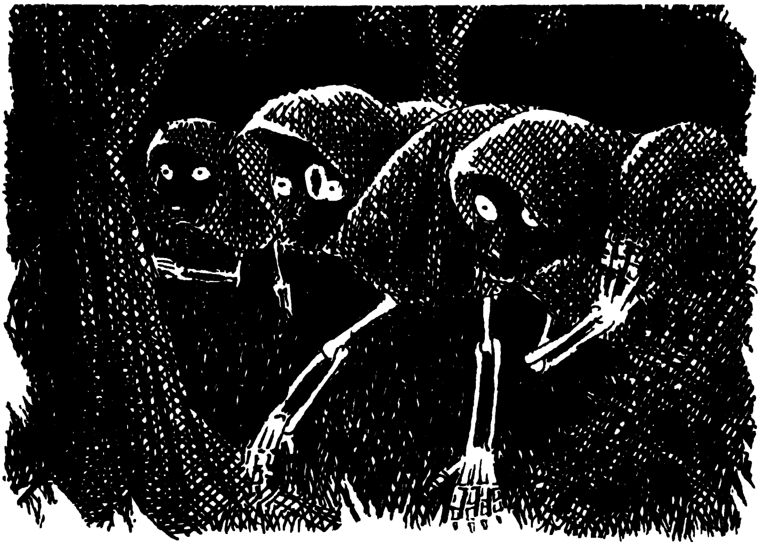
গার্ড সাহেব কাগজ সই করাতে এগিয়ে এল।

তাকিয়ে দেখি, গতকালের সেই গার্ড সাহেব নয়, নতুন মানুষ। কিছু বলতে যাচ্ছিলাম আমি; গার্ড সাহেব এমন চোখ করে তাকাল যেন আমাকে ধমক দিল। কথা বলতে বারণ করল। আমি চুপ করে গেলাম।

কাগজ সই করে ফেরত দিলাম গার্ডকে। কিন্তু বুঝতে পারলাম না, গতকালের মালগাড়ি, গার্ড সাহেব আর অত মাছি কোথায় গেল! ❑



সাতভূতুড়ে/ মহাশ্বেতা দেবী



ফল্গু যে বড় হতে না হতে অমন গল্পবাজ হবে, তা আগে কেন বুঝি্নি এখন তাই ভাবি। সব সময়ে ওর জীবনে তাজ্জব সব ঘটনা ঘটত আর আমাদের গল্প বলত। সে সব কি সত্যি, তাও আর জানা যাবে না। ওর ঠিকানাট তো দিয়ে যায়নি, যে গিয়ে জিগ্যেস করব।

ওষুধ কোম্পানির কাজ নিয়ে যখন পাটনা গেল, তখন তো ওকে সমানে ঘুরতে হত। তখন নাকি অবধলাল বলে একটা লোককে নিয়ে সে ঘুরত অবধলাল সঙ্গে থাকলে গাঁজা খাবে, পূর্ণিয়া বললে মতিহারির টিকিট করবে. নোট হাতে পেলে খুচরো ফেরত দেবে না, তবু ওকে সঙ্গে রাখা চাই।

কেন রাখা চাই?

আহা! বুঝলে না! কোন বাড়িটায় বিদেহীদের বাস, কোন রাস্তায় সন্ধের পর ডাইনি ঘোরে, এ সব বিষয়ে ওর একটা ব্যাপার আছে।

তাতে তোর কি?

তুমি কি বুঝবে? কত জায়গা ঘুরতে হয়। কখন কোথায় গিয়ে ফেঁসে যাব, এই তো সেবার...

কি হয়েছিল?

কাজে নয়। কাজ সেরে বেড়াতেই গিয়েছিল ফল্গু। ডালটনগঞ্জের কাছাকাছি কোন্ এক জায়গায় পেয়ে গেল জঙ্গল বাংলা। চৌকিদার নাকি বলে দিল

জল-টল তুলে দিয়ে, খানা বানিয়ে দিয়ে ও চলে যাবে। রাতে ও থাকবেই না।

ঘর দুটো। দুটো ঘরই ফাঁকা। লোক নেই। দু কামরাতেই নেয়ারের খাট। চেয়ার-টেবিল আছে। অবধলাল ফল্গুকে কিছুতে ভাল ঘরটায় থাকতে দিল না ছোট ঘরটায় দুজনে থাকব।

কেন রে?

অবধলাল শুধু বলে, ও ঘরে থাকবেন কি দাদা, পরিষ্কার দেখলাম ঘরে স্বামী-স্ত্রী বসে আছে।

ফল্গু তো কিছুই দেখেনি। কিন্তু বাইরে তখন বিকেল শেষ হচ্ছে। হেমন্তের বিকেল! বাতাসটা ঠাণ্ডা হচ্ছে। চারদিকে জনমানব নেই। এ সময়ে অবধলালের কথা অমান্য করতে গেলে অবধলাল তুলকালাম কাণ্ড বাধাবে।

অবধলাল চোখ মটকে বলল, ব্যাপারটা বুঝলেন না? ওই যে চৌকিদার, ও কেন রাতে থাকে না? ও ঘরে কারা বসে আছে, তা তো ও জানে। কেন বসে আছে, সেটাই দেখতে হবে।

ফল্গু তো দেখেছে কামরা জনশূন্য, জানলা বন্ধ, অবধলাল কি তা মানে? ও চোখ মটকে বলল, রাতে খেয়ে দেয়ে আপনি ঘুমোন, আমি দেখি ওরা কি করে। ওঃ মেয়েটা ছেলেমানুষ। ভয়ও পেয়েছে খুব, লোকটা ওর দিকে তাকিয়ে বসে আছে।

ফল্গু ধমকে বলল, আমি ভিতু মানুষ। আমি ওর মধ্যে নেই। তুমি দরজা বন্ধ করে দাও মাঝখানের।

দাদা! অবধলাল থাকতে আপনার কাছেও কেউ আসবে না, কোনো অনিষ্টও করবে না। আমিও ওদের চিনতে পারি, ওরাও আমাকে চিনতে পারে।

এ সব চেনাচিনির কথা সন্ধের মুখে কি ভাল লাগে? চৌকিদারটা এ সময়ে তেল ভরা দুটো লণ্ঠন জ্বেলে রেখে গেল। তারপর ঢেঁড়স দিয়ে ডিমের ডালনা, রুটি আর জলের কলসি রেখে গেল ঘরে। বলে গেল, সাবধানে থাকবেন বাবু, রাতে বাইরে বেরোবেন না।

ফল্গুকে আর দুবার বলতে হল না। ঢেঁড়স দিয়ে ডিমের ডালনা কে কবে খেয়েছে বলো? তা ফল্গু বাবুর কথা যদি সত্যি হয়, তাহলে ও ছাপরায় অড়র ডাল আর পিঁপড়ের ডিমের মোগলাই কারি (অবধলালের রান্না), গৈবীপুরে আলু আর আটার গোলা সেদ্ধ (ওর রান্না), মজঃফরপুরে কামরাঙা দিয়ে পাবদা মাছের ঝোল (অবধলালের রান্না) খেয়েছে। এ সব কথার সত্যি আর মিথ্যেও জানা যাবে না। কেননা অবধলালও ফল্গুর উধাও হবার সময় থেকেই উধাও।

সত্যি বলতে কি, অবধলালকে আমরা চর্মচক্ষে আজও দেখিনি। ও আরেকটা ফল্গুবাবুকে খুঁজছে। যাকে পেলে তার সঙ্গে জুটে যাবে।

রাতে তো ফল্গু খুব ঘুমোল। সকালে উঠে দেখে অবধলাল চৌকিদারকে খুব চোটপাট করছে।

ব্যাপার তো কিছুই নয়। লোকটা ওই আওরতকে খুন করেছিল। নিজেও খুদকুশি (আত্মহত্যা) করে। তা তুমি এ কামরায় কোনো বন্দোবস্ত করোনি কেন?

কি করব বাবু!

অবধলাল থাকতে ভাবনা?

অবধলাল তার ঝোলা থেকে কি একটা জড়িবুটি বের করল। ঘরের দেয়াল ফুটো করে পুঁতে দিল। ওগুলো নাকি ভূত তাড়াবার মোক্ষম ওষুধ।

ফল্গুরা যখন ট্যুর সেরে ফিরেছে, সেই চৌকিদার তো অবধলালকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম। না না সে দুটো ভূত আর আসছে না। তবুও ভূতুড়ে ঘর শব্দটা চৌকিদার চালু রেখেছে।

কেন?

চৌকিদার খৈনি মুখে দিয়ে বলল, চৌকিদারিতে আর কি মিলে বাবু! এখন আমরা মাঝে মাঝে ও ঘরে একটু জুয়া সাট্টা খেলি। ধরম পথে পয়সাও কামাই হয় দুটো।

পুলিস জানে?

পুলিসের সঙ্গেই তো খেলি বাবু। এ আপনারা খুব বড় কাজ করলেন। পাবলিকের ডাক বাংলো। এখন পাবলিকের কাজে লাগছে। সবাই অবধলালজীকে খুব আশীর্বাদ করছে। তবে কি বাবু! কামরায় তো ঢুকতে পারে না। রোজ ওই তেঁতুল গাছে বসে দুজনে খুব ঝগড়া করে।

.তা করুক না। ও বেচারীরা যায় কোথায়। ভূত বলুন, পিশাচ বলুন, ওদের তো থাকার জায়গা চাই। আমার গ্রামেই তো ডাক্তার বাবুর বউ যখন ভূত হয়ে গেল, কেবল সাবান চুরাত, কুয়াতলায় চান করত, আমিই তো তার ব্যবস্থা করে দিলাম। এখন সে পুকুরপাড়ে বেল গাছে থাকে; রোজ একটা সাবান মেখে স্নান করে।

ফল্গু বলল তবে যে শুনি গয়াতে গেলে...

অবধলাল ফচফচ করে হাসল। বলল, গয়াজীতে গেলেও বাবু! ভূতের মধ্যে যারা গিটগিটা আর পিচপিচা, তাদের মুক্তি হয় না।

সে আবার কি?

সে আপনি বুঝবেন না। সবচেয়ে পাজি হল কিরকিচা ভূত। গ্রামের ঝগড়াটি মেয়েছেলেরা কিরকিচা ভূত হয়। তবে হ্যাঁ, বহুত কাজও করে।

কি রকম?

এই আমার মা আর পিসিকে দেখুন না। গ্রামে ঝগড়া লাগলে সবাই

ওদের নিয়ে যেত। ওদের মতো গাল দিতে আর ঝগড়া করতে কেউ পারত না। এই যে দুজনে মরে গেল মেলায় গিয়ে কলেরা হয়ে, এখনো কত কাজ করে। বাপ রে বাপ!

কি করে!

সন্ধে হলেই আসবে, ঘরের চালে বসবে, আর বাবাকে, আমার সৎমাকে বাড়ির সকলকে গাল দেবে। কে ঠিক মত কাজ করেনি। বাবা মাঠে গিয়ে কাজ না করে ঘুমোচ্ছিল কেন, বউরা কেন ঝগড়া করেছে, বাসনে কেন এঁটো থাকবে, কাপড়ালত্তা কেন সাফ হয় না— এই নিয়ে এক ঘন্টা গাল দেবে, তারপর চলে যাবে।

এ তো সর্বনেশে কথা!

অবধলাল ক্ষমার হাসি হাসল। বলল বাবুজী! কিরকিচা ভূত না থাকলে কোনো গ্রামে শান্তি থাকে না। মেয়েছেলেরা সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে। কিরকিচারা গিয়ে ডবল তিন ডবল গালি দিয়ে সবাইকে ঠাণ্ডা রাখে। বাপ রে! আমার বাবা বলছিল গয়াজীতে যাব। তাতে মা আর পিসিমা গয়াজী গিয়ে এমন গাল দিতে থাকল যে পাণ্ডাজী বাবাকে লাঠি দিয়ে পিটাল। তুমি কিরকিচার পিণ্ড দিতে এসেছ?

চৌকিদারও বলল, হাঁ হাঁ, কিরকিচা প্রতি গ্রামে থাকা খুব দরকার।

ফল্গুর মুখে গল্প শুনে আমাদের খুব ইচ্ছে হয়েছিল একটা কিরকিচা ধরে আনি। মায়ের পুষ্যি যত পাড়ার বাজখেঁয়ে মেয়েছেলে, তারা কি কম ঝগড়া করত?

সাতভূতুড়ে বাড়িতে অবশ্য ও ভূতের বাড়ি জেনে যায়নি। দুমকা ছাড়িয়ে অনেক দূরে কোথায় রাজবাড়ি পোড়ো হয়ে আছে, তাই দেখতে গিয়েছিল।

বাড়িটা দেখিয়ে দিয়েই দুমকার বন্ধু কমলবাবু বলল আজ চোখে দেখুন, তারপরে সকালে এসে ভাল করে দেখবেন ঘুরে ঘুরে।

সাপের ভয়?

শীতকালে সাপের ভয়?

বদলোকের আড্ডা আছে?

না মশাই। আসলে...

অবধলাল তো মহা খুশি। কি ব্যাপার বাবু? ভূত আছে নাকি? গিটগিটা না পিচপিচা?

সে আবার কি?

বাবুজী জ্যান্ত মানুষের জাত আছে, ভূতের জাত নেই? গিটগিটা, পিচপিচা, কিরকিচা, কত জাতের ভূত আছে তা জানেন?

না বাপু, আমি জানতেও চাই না।

কি আছে ওখানে?

সবাই বলে সাতটা ডাকাত এ তল্লাটে খুব তরাস তুলেছিল। তা রাজবাড়ির একটা কামরায় ডাকাতির মাল ভাগ করতে গিয়ে মারামারি করে সাতটাই মরে। তারাই ও ঘরে দাপাদাপি করে।

মনে হচ্ছে গিটগিটা।

ডাকাতির মালের লোভে যেই গেছে সেই মারা পড়েছে। কেউ যায় না।

অবধলাল বলল, তাহলে তো থেকে যেতে হয়। আমার নাম অবধলাল। আমি সাতটাকেই তাড়াব।

কমলবাবু বললেন, আমি ওর মধ্যে নেই।

গ্রামের লোকেরা খুশি। বাপরে, রাজবাড়ির বাগান তো এখন জঙ্গল। ভয়ের চোটে কেউ কুলটা আমটা আনতে যাই না। ভূতগুলো তাড়াও বাবু। আমাদের ঘরে আজ থাকো। খাও দাও আরাম করো।

কমলবাবুও থেকে গেলেন। ও বাড়িতে উনি ঢুকবেন না। কিন্তু তামাশা তো দূর থেকেও দেখা যায়।

মাহাতোদের গ্রাম। ফলে মুরগি, ভাত, জবর খাওয়া হল।

পরদিন অবধলাল আর ফল্গু বাড়িতে ঢুকল। একেবারে পোড়ো বাড়ি। দোতলা দিয়ে বটগাছ উঠেছে বড় বড়।

একতলায় দুটো ঘর তবু থাকার মতো। অবধলাল বড় ঘরটা দেখিয়ে বলল, ওখানেই বেটাদের আড্ডা।

সে ঘর যেমন ধুলোপড়া, তেমনি বড়। কোণের দিকে একটা কাঠের সিন্দুক।

আরে আরে দেখুন!

কি দেখব?

জানালা দিয়ে দেখুন।

জানালার নিচে বেশ বড় একটা খাত। পাশে একটা গাছ।

ওর মধ্যে কিছু আছে বোধ হয়।

পাশের ঘরটা সাফসুতরো করল অবধলাল। গ্রাম থেকে চাটাই আনল, বালিশ তেলভরা লণ্ঠন, কুঁজো বোঝাই জল। সন্ধের মুখে বলল আমি তো চললাম। আপনার ডর লাগে তো আপনি থেকে যান গ্রামে।

ফল্গু বলল, মোটেই না, আমিও যাব।

লোকগুলোর লাশ কোথায় গেল?

মাহাতোরা বলল, সে তো সে সময়েই পুলিশ নিয়ে যায়। পুলিশ ডাকাতির মালও খোঁজে, পায়নি।

অবধলাল আর ফল্গু তো চলে এল। ফল্গু বলল, অবধলাল, আমি শুয়ে পড়েছি। তুমি ভূত তাড়িয়ে তবে আমাকে ডাকবে।

আগে দেখি বেটারা কেমন জাতের। আর একটু কাজ সেরে আসি।

কি কাজ ?

খাতের পাশে গাছটা দেখলেন না ?

দেখলাম তো!

বেচারি! ওখানে একটা কিরকিচা আছে। বেচারি আছে বলেই কেউ জানে না। একটু খইনি একটু বিড়ির জন্যে বড় কষ্ট পাচ্ছে।

এখানেও কিরকিচা ?

বাবুজী, কিরকিচা কোথায় নেই ?

ও কেন ভূতগুলোকে তাড়াচ্ছে না ?

কিরকিচা বলে ওর আত্মসম্মান নেই ? ওকে কেউ বলেছে ?

তুমি কি ওকেই ডাকবে ?

না না, সে দেখা যাবে। একটু খইনি, দুটো বিড়ি, একটা দেশলাই তো রেখে আসি। বাবুজী, ভূত তাড়াবার জড়িবুটিও তো আমাকে একটা কিরকিচাই দিয়েছিল।

এমনি সময়েই প্যাঁচা ডাকল, আর ফল্গু একটা ঘুমের বাড়ি খেয়ে ঘুমিয়েও পড়ল।

মাঝরাতে সে কি গণ্ডগোল। অন্য কারো গলা শোনা যাচ্ছে না অবধলাল চেঁচাচ্ছে।

তাই বলো! কিরকিচার ভয়ে এখানে ঢুকে বসে আছ ? কেন, পুলিশ যখন লাশ নিয়ে গেল, তখন সঙ্গে গেলে না কেন ?

একটা গলা মিউমিউ করে বলল, গিটগিটা কোথাও যেতে পারে ?

সর্দার কে ?

আমিই তো ছিলাম।

ঘরে কেন, বাইরে জঙ্গল আছে না ?

অহি কিরকিচা!

ওর ভয়ে মরে গেলে ?

হাঁ বাবু। আগে তো মারামারি করে মরলাম। তারপর পালাতে যাব, কিরকিচা যা গাল দিল আবার মরে গেলাম। এখন তো পালাতে পারলে বাঁচি। কিন্তু দু'বার মরলে কেমন করে পালাব ?

হায় হায়, এ তো বহোত আফশোস। ডবল ডেথ হয়ে গেল। তোমরা তো গিটগিটাও নেই, পিচপিচাও নেই। বিলবিলা হয়ে গেছ, হায় হায়!

আমাদের ছেড়ে দাও ভৈয়া।

ছাড়ব তো, যাবে কোথায়?

তা ফল্গু বলল, অবধলাল বলেছে যে কখনো কোনো কিরকিচা নিজের গ্রাম থেকে নড়ে না।

যদি বেড়াতেও আসে!

না না সে অসম্ভব।

ফল্গুকে বলতাম, অবধলালের কথা বিশ্বাস করিস?

ও বলত, বিশ্বাস করব না? জঙ্গলে যারা কাজ করে তারা বাঘের চেয়ে ভালুককে ডরায়। বাঘ মানুষ দেখলে সবে যায়। ভালুক তেড়ে এসে আক্রমণ করে। সেবার হাজারিবাগে...

একটা গল্পের সুতো ধরিয়ে দিয়েই, এমন হতভাগা বলত, সকাল আটটা বসে গল্প করার সময় নয়। থলিটা কোথায়, বাজারে চল।

আমাকে বাজারে টেনে নিয়ে যাবে, যা দেখবে সব কিনবে আর বাড়ি ঢুকে বলবে, ছ্যা ছ্যা, বুড়ো হয়েছে তো! যা দেখে সব কেনা চাই।

গল্প বলার সময় সন্ধেবেলা। বাগানের চাতালে বসে। লোডশেডিং হলে আরো জমত।

হাজারিবাগের জঙ্গলে ঘোরার আসল মজা বিট অফিসারের সঙ্গে পায়ে হাঁটো, তাঁবুতে থাকো, মাঝে মাঝেই দেখব গ্রামের মেয়ে-পুরুষ কাজ করছে।

তেমনি ঘুরতে ঘুরতে ওরা নাকি ভালুকের সামনে পড়ে। ভালুক দেখে ওরা তো দৌড় লাগিয়েছে। ভালুকও তেড়ে আসছে। তখন অবধলাল চেঁচিয়ে বলছে, আরে জঙ্গলে তো কত আওরতও মারা পড়েছে। একটাও কিরকিচা নেই? আরে কিরকিচা, কোথায় আছ?

সঙ্গে সঙ্গে গাছপালায় ঝড়তুফান তুলে ভালুকের দুপাশে দুই কিরকিচা এমন চেঁচাতে শুরু করল যে ভালুক ঘাবড়ে গিয়ে পালাল।

এটা সত্যি?

ইচ্ছে হলেই বিট অফিসারকে জিজ্ঞেস করে জেনে আসতে পারো।

তা, অবধলাল সঙ্গে থাকত বলে ফল্গুরও ঝোঁক চেপেছিল ভূতের বাড়ি হলেই ওকে নিয়ে সেখানে থাকবে।

বাইরে থেকে কে খনখন করে হাসল। ঠিক যেন হায়েনা হাসল।

যৈসে ভি হো, ভাগ যায়েগা।

কে যেন খনখনে গলায় বলল, সত্যি কথাটা বল্‌না বাপু। আমি তোদের কেন পুরে রেখেছি?

ফিঁচফিঁচ করে কেঁদে একজন বলল, আরে লখিয়াকে মা! তোর তামাকুর ডিব্বা আমরা নিইনি।

গিটগিটার দোহাই?

গিটগিটার দোহাই।

বিলবিলার দোহাই?

বিলবিলার দোহাই।

আমার কাছে মাপ চাইনি?

চাইলাম, চাইলাম।

যা তবে, ছেড়ে দিলাম।

অবধলাল এ সময়ে কি যে করল কে জানে। ঘরে ভীষণ একটা ঝুটোপাটি পড়ে গেল।

সকালে ফল্গুকে তো অবধলাল ডেকে তুলল। ফল্গু বলল, কাল অত চেঁচামেচি সব শুনেছি।

ছাই শুনেছেন! সিদ্ধির সরবত খেয়ে ঘুম মারলেন। কি শুনবেন?

চেঁচামেচি হয়নি?

সব মনে মনে।

ওরা চলে গেছে?

দেখুন না।

ধুলোর ওপর সার জোড়া ছোট ছোট পায়ের ছাপ। সব বাইরের দিকে বেরিয়ে গেছে।

ছোট ছোট ভূত?

না বাবু। বেচারাদের মতো অভাগা হয় না। মরল তো গিটগিটা হয়েছিল। গিটগিটারা বড় বড় ভূত। কিরকিচার ভয়ে আবার মরে গেল। এখন তো ওরা বিলবিলা। বেঁটে বেঁটে ভূত। কি দুঃখ!

দুঃখ কেন?

আরে বিলবিলা দেখলে গিটগিটা, পিচপিচা, কিরকিচা, সবাই পিটাবে। বিলবিলা হওয়া তো ভর-পোকের লক্ষণ। এক দফে মরলে, ঠিক আছে। আবার কেন দফে মরবে? ওরা সমাজের কলঙ্ক।

এখন ওরা কি করবে?

পালাবে আর কি করবে।

আসার আগে অবধলাল খাতে নেমে অনেক খুঁজেও কিছু পেল না। মাহাতোদের বলে, এই গাছের নিচে পিতলের ডিব্বায় তামাক পাতা, চুন রেখে দেবে। ভূত তো তাড়িয়ে দিয়েছি। গাছে যে কিরকিচা আছে, তাকে চটাবে না।

ডাকাতির মাল?

নির্ভয়ে খোঁজ গে।

গ্রামের লোক তা পায়ের ছাপ দেখতে গেল। গিটগিটাদের বিলবিলা হবার

কথাও সব শুনল। ওদের কি আনন্দ! মাহাতোরা, সাঁওতালরা, তেলিরা, সবাই যাবে! দরজা, জানালার কপাট নেবে, ইট নেবে। বাগান থেকে যথেষ্ট কুল, আমলকি, আম নেবে। গাছ কেটে জ্বালানি করবে। ওই মস্ত পুকুরে স্নান করবে। ঘাসবনে গরু চরাবে।

প্রচুর মুরগি কাটা হল, খুব খাওয়া-দাওয়া।

কমলবাবু সবই খেলেন, কিন্তু বললেন, ভূতের ডবল ডেথ, ধুলোতে পায়ের ছাপ, দূর মশাই, সব ধাপ্পা।

অবধলাল বলল, ও সব বলবেন না বাবুজী, তাহলে কিরকিচাটা আপনার পেছনে লেগে যাবে। আপনাকে গিরগিটা বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আপনি যা ভিতু হয়তো আবারও মরে যাবেন। তখন বিলবিলা হয়ে থাকতে হবে। ❑



যখন অন্ধকার/ জ্যোতির্ময় গঙ্গোপাধ্যায়



সার্কুলার রোডের সেমিট্রিয়াল গ্রাউন্ডের গেটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছি, আর মুহূর্তেই লোডশেডিং। বেশ আসছিলাম পার্ক স্ট্রিট মল্লিকবাজার পার হয়ে মৌলালির দিকে মুখ করে। যাব অবিশ্যি মৌলালি ছাড়িয়ে রাজাবাজার ছাড়িয়ে। শীতের সন্ধে, অলস ধীর গতিতে রাস্তাচলা উপভোগ্য। দু পাশের রাস্তায় আলো। আর কোনো কোনো জায়গায় দোকানপাটের হই-হল্লায় রাস্তাঘাট বেশ সরব। আলোর কলকাতার চেহারাটাই অন্যরকম। আর আলো নিবলে সেই জমজমাট কলকাতাই যেন জেলের কয়েদি।

কটা বাজে এখন? জানতে ইচ্ছে হল। ঘড়িশুদ্ধ কবজি চোখের কাছে আনলে কি হবে। কিছু বোঝার সাধ্য নেই। হঠাৎ পাশে কেউ জোরে সিগারেটে ফুঁ দিলে সিগারেটের মুখের আগুন জোরাল হল। আর তখনই ঘড়িতে সময় দেখলাম সবে ছ'টা পেরিয়েছে। পাশ ফিরতে দেখলাম সিগারেটের ধোঁয়া শব্দ করে কেউ ওপর দিকে ছেড়ে দিচ্ছে।

মাত্র ছ'টা। সিগারেট উঁচু থেকে অনেক নিচে নেমে এল। বুঝতে পারি মুখের সিগারেট এখন হাতে।

ধন্যবাদ। তবু আপনার সিগারেটের আগুনে সময় জানা গেল।

ধন্যবাদ কাকে কে দেবেন? কতই বা দেবেন? দিতে গেলে এই লোডশেডিংকেই দিতে হয়। চারিদিকের অন্ধকারে আমরা ভাসছি। সময় কাল

সব ডুবে গেছে। আর সময় মানে কি এই ছটা? সময় কি এক কথায় বোঝাবার মতো কিছু?

গলার স্বর কানে আসে। বেশ জোরাল আর ভারি। আর চোখে পড়ে সিগারেটের আগুন। এ ছাড়া আর কিছু দেখি না।

ঠাট্টা করে বললাম, বেশ কবিতার মতো লাগছে। এমন কথা তো রাস্তা ঘাটে চট করে শোনা যায় না। যাবেন কোন দিকে? মৌলালি?

চলুন। গেলেই হয়। অন্ধকারে সব দিকই সমান।

বেশ লাগছে আপনার কথা কিন্তু। মনে হয় এ অন্ধকারেও হাঁটতে অস্বস্তি লাগবে না।

হঠাৎই মনে হল বেশ তফাতে দু জনে চলেছি। কেউ কাউকে স্পর্শ করতে চাই না। যাই বলুন সব সহ্য হয়। কিন্তু এই দমবন্ধ করা অন্ধকার?

কেন সময় জানতে চাইছিলেন, এই অন্ধকারই তো সময়। আর সময় মানেই অন্ধকার।

বুঝি আর না-ই বুঝি বেশ লাগছে কিন্তু আপনার কথা।

না বোঝার কি আছে? একটু ভেবে দেখলেই বুঝতে পারবেন। কোথায় লোডশেডিং হল বলুন তো?

লোয়ার সার্কুলার রোডের ওই সিমেট্রির কাছে।

তবে? এর চেয়ে ভাল জায়গা আছে অন্ধকার গাঢ় হওয়ার। কত সময়ের অন্ধকার জমতে জমতে এখানে এমন গাঢ় হয়েছে বলুন তো?

ঠিক বুঝতে পারছি না।

না বোঝার কি আছে? কত সময় ধরে কত মানুষ ঘুমিয়ে আছে বলুন তো এ জায়গাটায়? সবাই তো গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে চলে গেছে।

এ জায়গাটা বলছেন? আমরা তো পার হয়ে এসেছি ওটা কিছুক্ষণ হল। কতক্ষণ হাঁটলাম?

কোথায়? এই তো দাঁড়িয়ে আছি। হাঁটছি কোথায়?

আপনি কি ম্যাজিসিয়ান নাকি? কথা তো যা বলছিলেন মজাই লাগছিল। এবার দেখছি বোকা বানিয়ে ছাড়ছেন।

গাঢ় অন্ধকারে কিছু ঠাওর হচ্ছে না আপনার। একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছেন। আপনি কে একটু খুলে বলুন তো?

বলব। তাড়া কিসের? এখুনি বললে আপনি আর হাঁটতে চাইবেন না। যে-ই হই বিখ্যাত কেউ নই। তবে বিখ্যাত এক বাঙালি শুয়ে আছেন এখানে অনেক অনেক সময় হল। ১৮৭৩ সাল থেকে।

কে তিনি?

মাইকেল মধুসূদন দত্ত। যাক তাঁর কথায় আসছি। আপনি হাঁটবেন বলছিলেন তা হাঁটুন। সময়ের সঙ্গে হাঁটতে হবে। পা চালিয়ে হাঁটুন।

সত্যি পা চালান। আমি ভাবছি শেয়ালদার কাছাকাছি এসে গেছি।

বেশ জোর পা চালাই। ভাবি কার পাল্লায় পড়েছি কে জানে। আগাগোড়া অদ্ভুত লাগছে। প্রথমে লাগছিল মজার। এখন দেখছি বেজায় ঘোরাল। বেশ বড় বড় পা ফেলতে শুরু করেছি। কে জানে কোন যাদুকরের যাদুবিদ্যের মোহে আচ্ছন্ন হতে চলেছি কিনা। শুধু লক্ষ্য করছি মিনিটে মিনিটে সিগারেট শেষ হচ্ছে, আবার নতুন সিগারেট ধরানো হচ্ছে। একটা মানুষ যে পাশে হাঁটছে তেমন কিছুই বোঝার উপায় নেই। শ্বাস-প্রশ্বাস বা পা ফেলার শব্দ, কোন রকমের কোন শব্দ।

কতক্ষণ হেঁটেছি তার হিসেব না থাকলেও, অনুমান করি বেশ হেঁটেছি। পা দুটোই তার প্রমাণ দিচ্ছে। জিজ্ঞাসা করি, কোথায় এসেছি বলুন তো? মানিকতলা পার হয়েছি! কি ভয়ঙ্কর অন্ধকার! সারা শহর জুড়ে লোডশেডিং নাকি!

মানিকতলা? কোথায় হেঁটেছেন আপনি? কিছুই হাঁটেননি। সময়ের সঙ্গে হেঁটে কতদূর যাবেন? কতদূর যেতে পারেন?

কথার মোহে এমন আচ্ছন্ন হয়ে পড়ছি, বলতে বাধা নেই, চ্যালেঞ্জ করার শক্তি পাচ্ছি না। মেস্‌মেরাইজ্‌ করার কথা শুনেছি। এই সারা শহরজোড়া লোডশেডিং-এর নিরেট অন্ধকারে কেউ তারই চেষ্টা করছে নাকি। আজকের সন্ধের লোডশেডিং আমার কাছে নতুন অভিজ্ঞতা। এমন ভীষণ অন্ধকারে শহরকে নাস্তানাবুদ হতে কখনও দেখিনি। বেশ আসছিলাম। রাস্তায় যানবাহন চলাচলের কোলাহলের উজ্জ্বল আলোর শহরের অভ্যস্ত জীবনে কোথায় ছেদ পড়েছে হঠাৎই। আর ঠিক এই সিমেট্রির সামনে এসেই শহরের সব আলো গেল একসঙ্গে নিশ্চুপ হয়ে।

কতকালের অন্ধকার এই বেরিয়াল গ্রাউন্ডে বাসা বেঁধেছে বলুন তো। মাইকেলই তো শুয়ে আছেন একশো বিশ বছর হল। তা হলে নিমেষে তো সবই অতীত। ভবিষ্যৎ বর্তমান এসব তো অতীতের কাছে ছেলেমানুষ। অতীতের বয়সই সব চেয়ে বেশি। আজকের সন্ধে তো দেখতে দেখতে কালকের সকাল। আর কালকের সকাল সন্ধে হতে কতক্ষণ? তারপর সবই তো সেই অতীত। সময় মানেই অতীত। দেখেননি ইতিহাস লিখতে গিয়ে পণ্ডিতেরা দুঃখ করে বলেছেন কত বড় বড় সভ্যতা আর বিশাল বিশাল নগর এই অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে। কত কবির কত দুঃখ।

শুনছি আর মনে মনে ভাবছি, মহা হাঙ্গামা তো। যতক্ষণ এই লোডশেডিং ততক্ষণ চলবে এই সব কথা। ছেলেবেলায় মাস্টার মশায়দের মুখে ভালই লাগত। তা বলে এই একটানা অবাধ অন্ধকারে গলা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে থেকে ভাল লাগার কথা তো নয়। অথচ প্রত্যেকটা কথা আমায় শুনতে হচ্ছে। না-শুনে আমার উপায় নেই। আমাকে শুনতে হবে বলেই এই চিরস্থায়ী লোডশেডিং-এর বন্দোবস্ত।

এরপর আর হাঁটা নয়। যা কে বলে আধা-দৌড়। বার দুই তিন হোঁচট খেয়ে পড়ে যাই আর কি। কিন্তু পড়লাম না। কে বুঝি জামার পিছন ধরে তুলে ধরল। জোরে হাঁটার চেষ্টা করছেন, ভাল। দেখুন চেষ্টা করে। তবে সময়ের সঙ্গে হাঁটা তো——

পাশাপাশি হাঁটছি। অথচ গায়ে একেবারেই গা লাগছে না। পাশে কারও অস্তিত্বই অনুভব করছি না। আর মাঝে মাঝে মনে হচ্ছে কণ্ঠস্বর অনেক দূর থেকে আসছে। এ যেন অতীতেরই কণ্ঠস্বর।

মাইকেলের কথায় আসি। মধুসূদনের তো কোন ভয় নেই। নিশ্চিন্তে নিজের জায়গাটিতে শুয়ে আছেন। শতাব্দী পার করে। উঠে এসে চারিপাশের পরিবর্তন দেখার কিছু নেই। সবই তো শেষ পর্যন্ত জমা হবে এই সময়ের অন্ধকারে। মধুসূদনের কি ভয়। সবাই মালা রেখে যাবে। স্তবক রেখে যাবে। একটা শতাব্দী পেরিয়েছে। আরেকটাও পেরবে।

আমি বুঝতে পারছি বেশ জোরে হাঁটছি। আধা-দৌড় তো বটেই। অল্প ঘামছিও বটে।

কিন্তু ধরুন মাইকেল যেদিন সমাধিস্থ হল সেদিন যদি এক বাঙালি খৃশ্চানকে তাঁরই সঙ্গে এখানে করব দেওয়া হয়, আর সে যদি তার নিজের জায়গা ছেড়ে ওই সিমেট্রি থেকে বেরিয়ে লোডশেডিং-এর অন্ধকারে কলকাতার এই চেহারা দেখে অবাক বনে যায়? গ্যাসের আলোর কলকাতা নিয়ন আলোয় ভেসে গেল। আবার লোডশেডিং-এর অন্ধকারে সেই গ্যাসের আলোর কলকাতা। অতীত বোধহয় এ ভাবেই মাঝে মাঝে ফিরে আসতে চায়। কি বলেন?

কিছু বলি না। শুধু অনুভব করি পা দুটো বেশ ধরে গেছে। টনটন করছে। ঘাড়ে হাত রেখে দেখি ঘামে রীতিমতো ভেজা। কোন সংশয় নেই আমি যথাসম্ভব পা-চালিয়ে হেঁটেছি। মানিকতলা অনেকক্ষণ পেছনে ফেলে এসেছি।

জিজ্ঞাসা করি, এতক্ষণে নিশ্চয় মানিকতলা পার হয়ে এসেছি। কি বলেন? পা দুটো খসে যাচ্ছে। গায়ের জামা ভিজে সপসপে।

সেই এক কথা, না না হাঁটলেন কোথায়? সময়ের সঙ্গে হাঁটবেন কোথায়? কোথায় সেই স্পিড্?

কেমন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ি। নাজেহাল হয়ে বেকুব বনে যাই।

হঠাৎ লক্ষ্য করলাম সিগারেটের আলো অনেক দূরে সরে গেছে। আমার নিজেরও ভয়-ভীতি বলে কিছু নেই। ভীষণ ডাকাবুকো বনে গেছি। একটু গলা ছেড়েই বললাম, যার কথা বললেন আপনিই কি সেই লোক?

এবার উত্তর এল বুঝি শতাব্দীর ওপার থেকেই। ফোনে অস্পষ্ট কণ্ঠে কেউ বলছে, ঠিকই ধরেছেন। নিজের জায়গায় ফিরে আসছি।

তারপরই, সরে যান, সিগারেটের টুকরোটা ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছি। অনেক দূর থেকে ছুঁড়ছি, তবু লেগে যেতে পারে।

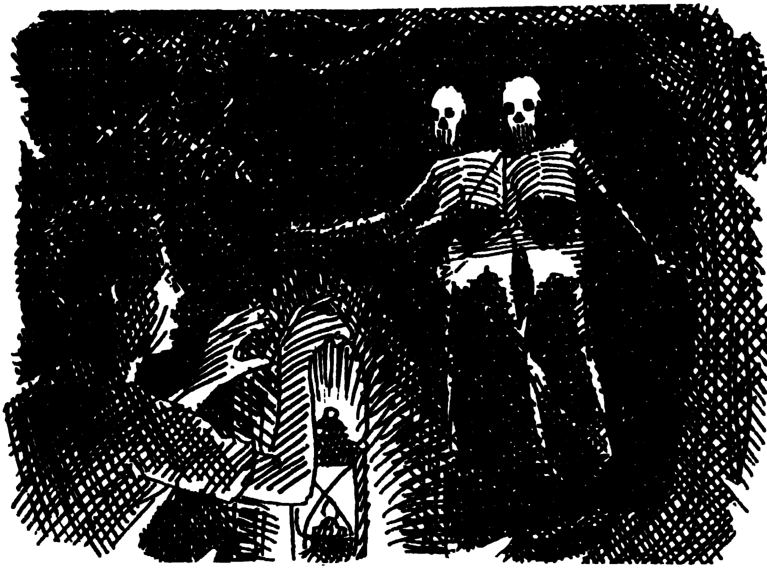
যে-ভাবে জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা উড়ে আসছে সরে যাবার সময় পাব কি?

জ্বলন্ত সিগারেটের টুকরোটা আমার কপালে এসেই লেগেছে। ভাবছি এখুনি ফোস্কা পড়ল। কিন্তু না। মনে হল বরফকুচি কেউ ছুঁড়ে দিয়েছে। কী নিদারুণ ঠান্ডা!

চতুর্দিকের আলো জ্বলে উঠেছে। কোথায় এতক্ষণের লোডশেডিং! সামনেই সিমেট্রির গেট। বরফকুচির তরল জল কিনা জানি না। কপাল দিয়ে বেশ বড় ফোঁটায় ঘাম ঝরছে। পায়ের ওপর শরীরের ভার রাখতে পারছি না। ❑



ভূত নেই পেত্নী নেই/ অরবিন্দ গুহ



ভূতের নামে কিছু লেখা দরকার। ভূতের ভয়ে ছেলেমেয়েরা একেবারে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। ভূতের নামে কত আজেবাজে গল্প যে আছে! কারও-কারও কাছে ছাপার অক্ষর বেদবাক্য। ছাপার অক্ষরে ভূতের কথা দেখেছে, ব্যস, আর কথা কি, অমনি বিশ্বাস হয়ে গেল, নিশ্চয়ই ভূত আছে।

আচ্ছা, ভূত কি কেউ স্বচক্ষে দেখেছে? কোথায় দেখবি রে বাপু! যা নেই তা কেউ কখনও দেখতে পারে? তুমি নিজে দেখেছ? দ্যাখোনি? ও, তোমার পিসেমশাই দেখেছেন? আরও একটু খোঁজখবর নিয়ে দেখো, পিসেমশাইও স্বয়ং দেখেননি, ফলহারিণী অমাবস্যায় ভূত দেখেছিলেন তোমার পিসেমশায়ের আপন ভায়রাভাই। সত্যি-সত্যি দেখেছিলেন। কেননা, বাজি রেখে বলতে পারি, তোমার পিসেমশায়ের ভায়রাভাইয়ের চোখ খারাপ, হজমের দোষ আছে, হার্ট সুস্থ নেই। উনি ভূত দেখবেন না তো ভূত দেখবেন কে?

আমার কথা শোনো, দুনিয়ার কোথাও ভূত নেই। ভগবান হয়তো থাকলেও থাকতে পারেন, কিন্তু ভূত নেই, নেই, নেই।

কিন্তু আমার কথা কি কেউ শুনবে? কিংবা, শুনলে কেউ বিশ্বাস করবে?

নাঃ, মুখের কথায় কিছু হবে না।

ভেবেচিন্তে দেখলাম, এ বিষয়ে অনেক কোটেশন-টোটেশন দিয়ে একখানা মোটাসোটা বই লিখলে মন্দ হয় না। ভূত যে নেই, এই বিষয়ে একখানা

বই। এমন সব প্রমাণ দাখিল করব, কেউ আর আমাকে একবিন্দু অবিশ্বাস করতে পারবে না। আমার সেই বইখানা পড়লে কারও আর ভূতের ভয় থাকবে না।

তা, দ্যাখো, কলকাতায় বসে অমন বই লেখা যায় না। এত হইহল্লা' মধ্যে অমন এলাহি কাণ্ড করা যায় না। একটু নির্জন-নিরিবিলি দরকার। কোথ' আছে তেমন জায়গা?

বংশীবদন রাহা আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু. বিস্তর দেশবিদেশ ঘুরেছে। বংশীবদন নিশ্চয়ই একটা ভাল জায়গার খোঁজখবর দিতে পারবে।

গেলাম বংশীবদনের কাছে।

কিন্তু ভূত নেই শুনেই বংশীবদন ক্ষেপে গেল। বলল তুই ঠিক জানিস ভূত নেই? এত লোক যে ভূতের কথা বলে, বানিয়ে বানিয়ে বলে?

—হ্যাঁ, বানিয়ে বানিয়ে বলে। না জেনে বলে। অন্যের মুখে ঝাল খেয়ে বলে। শুনে বলে।

—তুই বলছিস, সত্যি-সত্যি কেউ কখনও ভূত দেখেনি?

আমি জোর গলায় বললাম— না, কেউ সত্যি-সত্যি দেখেনি। যা দেখেছে ভুল দেখেছে। দড়ি দেখে সাপ বলে ভুল করেছে। ভূতের গল্প হচ্ছে গাঁজাখুরি গল্প।

খানিকক্ষণ গুম হয়ে রইল বংশীবদন। তারপর ঘাড়ে একটা মস্ত ঝাঁকুনি দিয়ে বলল— থাক বাপু, না থাকলেই ভাল। কিন্তু, বাপু, যদি ধরো থেকেই থাকে, যা রটে তার কিছু তো বটে, তাহলে? ভূত নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করতে যাচ্ছ, শেষকালে তোমার ঘাড়টি না মটকে দেয়। আর যাই করো, বেঘোরে প্রাণটি দিও না বাপু!

আমি রাগ করে বললাম— ভুল বলেছি বংশীবদন। এক-আধটা ভূত আছে। তুই নিজেই একটা ভূত।

বংশীবদন ফ্যা-ফ্যা করে হাসতে-হাসতে বলল— এ তুই রাগের কথা বলছিস দাদা। ভূত হলে তো বেঁচে যেতাম। বাড়িভাড়া দিতে হত না, ট্রেনভাড়া দিতে লাগত না, বিনি পয়সায় বাজার হালে খাওয়া-দাওয়া করতাম। ভূত হয়ে বেঁচেবর্তে থাকব আমি কি আর তেমন ভাগ্য করে এসেছি?

যাই বলুক, বংশীবদন শেষ পর্যন্ত আমাকে একটা পছন্দসই ঠিকানা দিল। নির্জন নিরিবিলি জায়গা। ঠিক যেমনটি আমি চাই।

সে-ঠিকানা কলকাতায় নয়। কলকাতা ছাড়িয়ে বহুদূরে, পশ্চিমবঙ্গের বাইরে। গয়ায়।

বংশীবদন বলল— হ্যাঁ রে দাদা, গয়ায়। তোর খুব সুবিধে হবে ওখানে। গয়ায় যত আছে তত জ্যান্ত ভূত দুনিয়ায় আর কোথাও নেই। যদি তোর

ভাগ্যের তেমন জোর থাকে, ভূতের সঙ্গে তোর মুখোমুখি দেখাও হয়ে যেতে পারে। স্বয়ং ভূতের মুখে শুনেও হয়তো অনেক ভাল-ভাল কথা তুই তোর বইয়ের মধ্যে ঢুকিয়ে দিতে পারবি।

গাধা কোথাকার! বলে কিনা, ভূতের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হবে! বংশীবদন একটা ছাগল। যা নেই তার সঙ্গে আবার দেখা হবে কি রে?

যাক, যা খুশি বলুক। ওকে চটানো এখন ঠিক হবে না। ওকে তুষ্ট রেখে আগে একটা নির্জন নিরিবিলি আস্তানার বন্দোবস্ত করি।

আমি বললাম— ভূতের কথা তুই ছেড়ে দে বংশীবদন। আমার বইখানা আগে লেখা হোক, ছাপা হোক, তোকে একখানা দেব, বিনে পয়সাতেই দেব। তুই পড়ে দেখবি, ভূত বলে কোথাও কিছু নেই। যাক, গয়ার কথা কি বলছিলি, তুই বিশদ করে বল।

—সত্যি বলছিস? বিনে পয়সায় আমাকে একখানা বই দিবি? দেদার খুশি হয়ে বংশীবদন বলল— খালি আমাকে দিলেই হবে না কিন্তু। শিবশঙ্কর হালদারকেও একখানা দিতে হবে, বিনে পয়সাতেই দিতে হবে।

—কে শিবশঙ্কর হালদার?

—আহা, সেই কথাই তো বলছি। শিবশঙ্কর হালদার আমার মেসোমশায়ের বন্ধু। তার বাড়িতেই তো তোর থাকার ব্যবস্থা করে দেব। গয়ায় একখানা মস্ত বাড়ি আছে হালদার মশায়ের, সব সময় খালি পড়ে থাকে। ওই বাড়ি কেউ কিনতে চায় না, কেউ ভাড়া নিতে চায় না।

—কেন?

—সকলে বলে, ভূতের বাড়ি। ওই বাড়িতে নাকি ভূতের আড্ডা, ভূতের উৎপাত।

আনন্দে আমার চোখে জল এসে গেল। ওইরকম একটা আস্তানাই তো আমি চাই। ওখানে বসে বেশ জুত করে বইখানা লেখা যাবে। কিন্তু বংশীবদনের মেসোমশায়ের বন্ধু হালদারমশাই আমাকে থাকতে দিতে রাজি হবেন তো? দরকার হলে আমি কিছু ভাড়া দিতে রাজি আছি। এমন কি, কিছু আগাম দিতেও আমার আপত্তি নেই। হালদারমশাই রাজি হবেন তো?

বংশীবদন খানিকক্ষণ আমার মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল— জীবনে আমি এন্তার গাধা দেখেছি দাদা, কিন্তু তোর জুড়ি আর দেখিনি। রাজি হবেন কি রে, গয়াধামের সেই ভূতের বাড়িতে তুই থাকবি শুনে যে হালদারমশাই তোকে মাথায় তুলে নাচবেন। ভাড়া দিতে চাইছিস? ওরে, ভাড়া দিবি কি রে, ওখানে থাকবি শুনলে হালদারমশাই বরং উল্টে তোকে মণ্ডামেঠাই খেতে টাকা দেবেন। চল, চল, হালদারমশায়ের কাছে চল।

হালদারমশায় থাকেন হাতিবাগানে। বংশীবদনের সঙ্গে তো তাঁর কাছে

গেলাম। ভূত নিয়ে কেতাব লিখব শুনে তো তিনি আহ্লাদে আটখানা। জিজ্ঞেস করলেন— কিন্তু বাবাজী, ভূতের কি কোনও কাণ্ডজ্ঞান আছে? কোনও ভূত কি তোমার কেতাব পড়বে?

একবিন্দু রাগ না করে আমি বললাম— ভূত কোথায়? কোথাও ভূত নেই। আমার কেতাবে সেই কথাই প্রমাণ হয়ে যাবে। লেখা হোক, ছাপা হোক, আপনাকে দেব একখানা, পড়ে দেখবেন।

হালদারমশাই খুব খুশি হলেন। ভূত নেই। বাঃ খুব সুখের কথা, যদি হাতে-নাতে প্রমাণ হয়ে যায় ভূত কোথাও নেই, আরও সুখের কথা।

হালদারমশায় জিজ্ঞেস করলেন— কত দাম হবে বইখানার আন্দাজ করো?

—মস্ত বই হবে। অন্তত কুড়ি পঁচিশ টাকা তো বটেই। এমন কি, তিরিশটাকাও হতে পারে।

সেই মুহূর্তে আমার হাতে দশটাকার তিনখানা নোট গুঁজে দিলেন হালদারমশাই। বললেন— না, না, আমাকে তোমার ও-বই বিনি পয়সায় দিতে হবে না। আগাম দাম দিয়ে রাখলাম। মোটকথা, সমস্ত ভূতের গুষ্টিবর্গ তুমি নিপাত করে দাও।

হালদারমশায়ের আর কোনও সাড়াশব্দ নেই। চোখ বুজে ধ্যানস্থ হয়ে রইলেন খানিকক্ষণ। তারপর চোখ খুলে গম্ভীর গলায় বললেন— বাবাজী, ভূতের হাতে আমি যেমন নাস্তানাবুদ হয়েছি তেমনি বোধ করি আর কেউ হয়নি। আমার ঠাকুরদার বাবার তৈরি একখানা বাড়ি, লোকে বলে, ভূতের আস্তানা হয়ে আছে। বাড়িটার দারুণ দুর্নাম। বিক্রি হয় না, কেউ ভাড়া নেয় না পর্যন্ত। বাবাজী যদি তোমার দয়ায়...

তিনি আমার দু-হাত জড়িয়ে ধরলেন। তাঁর দু-চোখ থেকে ধারায় জল পড়তে লাগল।

শুভদিনে শুভক্ষণে হাওড়া স্টেশনে গিয়ে রেলগাড়িতে উঠে পড়লাম। সঙ্গে তিনটি মস্ত-মস্ত বাক্সভর্তি বই নিয়েছি— ভূত সম্পর্কে বই আমার কাজে লাগবে। দাঁড়াও, এমন একখানা বই লিখব কারও আর ভূতের ভয় থাকবে না, ভূতের কথা শুনলে সকলে হাসবে।

ভোরবেলা গয়া স্টেশনে পৌঁছলাম। হালদারমশায়ের বাড়ি গয়া শহরে নয়, শহর ছাড়িয়ে হাওয়াই আড্ডা মানে এরোড্রাম পেরিয়ে কয়েক মাইল যেতে হয়। সেসব হালদারমশাই আমাকে নিখুঁতভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন।

মালপত্র নিয়ে টাঙ্গায় উঠলাম। সূর্য উঠেছে কেবলমাত্র, চতুর্দিকে ছোটখাটো পাহাড় আর পাহাড়, হুটর হুটর করে টাঙ্গা ছুটল।

ঘন্টা দেড়েক লাগল। হালদারমশাই— দোতলা ফাঁকা বাড়ি, কোথাও লোকজন

নেই। কোনও দরজায় তালাচাবি পর্যন্ত নেই। ভূতের বাড়ি যখন, কে অযথা তালাচাবি লাগিয়ে পয়সা নষ্ট করে?

দোতালার একটা কোনার ঘর বেছে নিলাম। ময়লা হয়ে আছে। একা-একা যতদূর পারি, একটু ঝেড়েমুছে নিলাম। জলকলের সুন্দর ব্যবস্থা আছে। স্নান করে নিলাম। আজ আর খাওয়াদাওয়ার হাঙ্গামা করতে হবে না, সঙ্গেই কালকের লুচি-তরকারি আছে। ওই সেঁটে নিলাম। তারপর সতরঞ্জি বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। ট্রেনের ধকল গেছে সারারাত, শুতে-না-শুতেই দিব্যি ঘুম এসে গেল।

ঘুম যখন ভাঙল, ও মা, সন্ধ্যা হব-হব। তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বাললাম। যাক, এবার বইপুঁথি খুলে বসি। কাল থেকেই লিখতে আরম্ভ করব।

হঠাৎ মনে হল যেন কাদের গলার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছি। মনের ভুল নিশ্চয়ই। এমন নির্জন নিরিবিলি ভূতের বাড়িতে কে আসবে? নাকি আমাকেও শেষকালে ভূতে পেল? আমিও শেষ পর্যন্ত ভূতে বিশ্বাস করব নাকি? আরে দূর-দূর!

নাঃ, নিচের থেকে স্পষ্ট আওয়াজ আসছে। স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে— গোলাম-গোলাম। কার গোলাম রে বাবা! আবার শুনি— সাহেব-সাহেব। কোথায় সাহেব রে বাপু! ইংরেজ রাজত্ব তো কবে ঘুচে গেছে।

নাঃ, উঠতে হল। স্বচক্ষে দেখে আসতে হয় একবার।

নিচে নেমে দেখি আশ্চর্য কাণ্ড। চারজন ভদ্রলোক দিব্যি জমিয়ে নিয়েছেন। ধ্যানস্থ হয়ে তাস খেলছেন চারজনে। ওঃ, এতক্ষণে গোলাম-সাহেবের সারমর্ম বোঝা গেল।

কী দারুণ মনোযোগ। কেউ একবার চোখ তুলে এদিক-ওদিক তাকাচ্ছেন না পর্যন্ত। অগত্যা আমিই এগিয়ে গেলাম। আমাকে দেখেই চারজন একসঙ্গে চমকে উঠলেন। যেন ভূত দেখেছেন— এমনিভাবে চমকে উঠলেন।

আমি হাসতে-হাসতে বললাম— ভয় পাবেন না দাদারা, আমি ভূতটুত নই। জলজ্যান্ত মানুষ। বিশ্বাস না হয়, আমার গায়ে চিমটি কেটে দেখুন।

আমার কথা শুনে চারজন একসঙ্গে হেসে উঠলেন। ওঁদের মধ্যে সবচেয়ে যিনি মোটা তিনি বললেন— কী যে বলেন দাদা, আপনার গায়ে আবার চিমটি কেটে দেখব! চিমটি কাটতে হবে কেন, কোনটা মানুষ আর কোনটা ভূত এক নজরেই টের পাওয়া যায়। বড়দা, আপনি শুধু মানুষ নন, আপনি একজন মাইডিয়ার মানুষ। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে কী যে খুশি হলাম, কী আর বলব!

বলা বাহুল্য, আমিও খুব খুশি। বললাম— তা যেন হল ভাই, এত রাজ্য থাকতে আপনারা এখানে বসে তাস খেলছেন কেন?

একজন গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক বললেন— দুঃখের কথা বলবেন না মশাই,

কোথাও একফোঁটা নিরিবিলি নির্জন জায়গা নেই। আপনিই বলুন, হট্টগোলের মধ্যে কি তাস জমে? বাজি রেখে বলতে পারি, এমন ফাঁকা বাড়ি ভূ-ভারতে কোথাও পাবেন না।

দুনিয়ার কত রকম পাগল যে থাকে! সেই তো একবার শুনেছি কারা যেন তাস খেলবার জন্যে হাওড়া ব্রিজের চুড়োয় গিয়ে উঠেছিল। ওরে বাপু, এই মনোযোগ লেখাপড়ায় দিলে তোরা যে একেকটা আশু মুখুয্যে হয়ে যেতিস! যাকগে, আমার কি?

তারপর দলের আরেকজন ভদ্রলোক মুখ খুললেন — কিন্তু দাদা, আপনি এখানে কেন এসেছেন সে-বিষয়ে তো কিছু বললেন না? বলুন না একটু, শুনি।

আমি তখন আমার কেতাবের কথা সবিস্তারে বললাম। ভূতের বিরুদ্ধে কেতাব লিখব।

গম্ভীর হয়ে আমার কথা শুনলেন ওঁরা। গোঁফওয়ালা ভদ্রলোক বললেন — ভূতের বিরুদ্ধেই শুধু লিখবেন, পেত্নীর বিরুদ্ধে কি কিছু লিখবেন না?

— নিশ্চয়ই লিখব, নিশ্চয়ই লিখব। আর ভূত আর পেত্নী কি আর আলাদা?

যেন একটু দমে গেলেন গুঁফো ভদ্রলোক। আমতা-আমতা করে বললেন — সে কি কথা! ভূত আর পেত্নী আলাদা নয়? কি বলছেন মশাই, পাঁঠা আর ছাগল কি একই বস্তু? ষাঁড়ে আর গোরুতে কি কোনও তফাত নেই? গোরুর গোবর আর ষাঁড়ের গোবর কি একই? দিগ্‌বিজয়ী পণ্ডিত হয়ে শেষকালে আপনি, দাদা, এমনি একটা অসার কথা বললেন?

চোখ বুজে কয়েকবার গোঁফ নাচালেন ভদ্রলোক। গোঁফের নাচ দেখতে-দেখতে আমার মনে হল, না, ভদ্রলোকের কথা নিতান্ত উড়িয়ে দেবার মতো নয়। ভদ্রলোকের কথায় সারবস্তু আছে বটে!

ভেবেচিন্তে বললাম — ভাববার মতো কথা বলেছেন। ভাবছি, পেত্নীর নামেও আলাদা একটা চ্যাপ্টার লিখব। নির্ঘাৎ লিখব।

ভদ্রলোকের গোঁফজোড়া হাসতে লাগল।

— আরও একটা কথা বলে দিচ্ছি আপনাকে। গলা নিচু করে উনি বললেন — পেত্নীর হাতে কারও নিস্তার নেই। এমন কি ভূতেরও না।

দারুণ ঘুম পাচ্ছে। আজ আর লেখাপড়া থাক। কাল সারারাত দুচোখের পাতা এক করতে পারিনি, আজ রাতটা না হয় ঘুমিয়ে কাটাই।

শুতে-না-শুতেই ঘুম।

মাঝরাত্তিরে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল। দেখি কি, আমার ঘরের মধ্যে একটি মেয়ে জানালার কাছে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াচ্ছে। স্বপ্নটপ্ন দেখছি নাকি।

গলা খাঁকারি দিলাম দু-একবার। কিন্তু মেয়েটি একবার ঘাড় পর্যন্ত নড়াল না। যেন ঘরের মধ্যে কোথাও কেউ নেই, এমনিভাবে সমানে চুল আঁচড়ে যেতে লাগল আর দু-এক কলি রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে লাগল— চাঁদের হাসির বাঁধ ভেঙেছে...

ধুত্তোর, তোর চাঁদের নিকুচি করেছে। খুব গম্ভীর গলায় আমি বললাম— খুকি, এত রাত্তিরে বাড়ি থেকে একলা-একলা বেরিয়ে এখানে এসেছ কেন? ভাল করোনি, ভাল করোনি। দিনকাল খুব খারাপ। চারদিকে চোর-ডাকাত আজকাল। কেন, বাড়িতে কি তুমি গান গাইতে পারো না, চুল আঁচড়াতে পারো না?

এক ঝটকায় আমার মুখোমুখি দাঁড়াল খুকি। রেগেমেগে বলল— আপনি, মশাই, দারুণ ছোটলোক তো। অচেনা-অজানা লেডিকে খুকি-খুকি বলছেন! জানেন আমি কে? ইচ্ছে হলে এক্ষুনি আপনার ঘাড় মটকে দিতে পারি।

মেয়েটির তেজ দেখে না হেসে পারলাম না। বললাম— খুকি, তুমি পেত্নী সেজে আমাকে ভয় দেখাতে চাও? কিন্তু, তুমি কি জানো ভূতপেত্নীতে আমি একদম বিশ্বাস করি না।

—ওঃ, বিশ্বাস করেন না? খুকি জানলা গলিয়ে চিরুনিটা বাইরের ঘুরঘুটি অন্ধকারে ছুঁড়ে ফেলল— তা আপনার মতো গাধা আমি অনেক দেখেছি। আগে খুব বড় বড় কথা বলে, তারপর যখন...

বলতে-বলতে খুকি একটা অভাবনীয় কাণ্ড করে বসল। বললে কেউ বিশ্বাস করবে না জানি, তবু বলে যাই। খুকি করল কী, নিজের মুণ্ডুটি খুলে ডান হাতে নিল। আমার সতরঞ্চির উপর রাখল নিজের মুণ্ডুটি। চোখের পলকে খুকির ধড় পুরোপুরি উধাও হয়ে গেল, হাওয়ায় মিশে গেল।

আমার মুখের দিকে তাকিয়ে মিটমিট করে হাসতে লাগল খুকির মুণ্ডুর চোখ দুটি। মুণ্ডু স্পষ্ট গলায় বলল— কিরে গাধা, এখনও তোর পেত্নীতে বিশ্বাস হয় না?

হার্টে কোনও দোষ নেই বলেই বুঝি আমি তখনও অজ্ঞান হয়ে যাইনি। হাঁপাতে হাঁপাতে চলে এলাম নিচের ঘরে। হ্যাঁ, চারজন ভদ্রলোক একমনে তাস খেলে যাচ্ছেন।

সমস্ত ঘটনা হাঁপাতে হাঁপাতে বললাম।

মোটাসোটা ভদ্রলোক বললেন— খুকি কে জানেন? ওর আসল নাম গিয়ে ইন্দুনিভাননী চক্রবর্তী। খুব খিটখিটে স্বভাব। ভাল মানুষ পেলেই ভয় দেখায়।

আমি বললাম— না ভাই, আর কিছু নয়; ওই যে মুণ্ডু খুলে রেখে নিজে উধাও হয়ে যাওয়া, এই ব্যাপারটা—

—এই ব্যাপারটা নিয়ে অত আশ্চর্য হচ্ছেন কেন? সেই গুঁফো ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

—আশ্চর্য হব না? একটা আস্ত সুস্থ মুণ্ড—

—আরে দূর-দূর, আপনি মশাই সেই তখন থেকে খালি মুণ্ডু-মুণ্ডু করে পাগল হচ্ছেন! ওটা কি একটা বলবার মতো জিনিস? সেই গুঁফো ভদ্রলোকই বলে চললেন— ও কে না পারে? ও তো আমরা সকলেই পারি।

বাকি তিনজনকে উনি বললেন— ওরে, দেখিয়ে দে তো! না, আজ তাসের আসরটি মাটি হয়ে গেল। নে, চল, চট করে মুণ্ডু খুলে রেখে আমরা ধড় নিয়ে উধাও হয়ে যাই। মুণ্ডু-মুণ্ডু করে পাগল হচ্ছেন, উনি বসে-বসে প্রাণ ভরে আমাদের মুণ্ডু দেখুন। সারারাত দেখুন।

বলতে-বলতে, দেখি, ঘরের মধ্যে চারটি মুণ্ডু। ধরফড় কিছু নেই। চারটি মুণ্ডু ছাড়া আর কিছু নেই। না, ভুল বলা হল। আরেকটা মুণ্ডু আছে। আমার নিজের মুণ্ডু। বলা বাহুল্য, সেটি আমার নিজস্ব ধড়ের উপরেই আছে। ❑



উপচার / আলোক সরকার



মানুষটা কখন সামনে এসে বসেছে খেয়াল করিনি। খেয়াল করতে হল।

“খুব ক্লান্ত মনে হচ্ছে।”

মুখ তুলে তাকিয়ে দেখলুম হাসিখুশি চেহারার এক ভদ্রলোক। চুল একটু উশকো-খুশকো হলেও ভদ্রলোক যে তাঁর সাজপোশাক বিষয়ে উদাসীন নন, তা বোঝা যায়। সাদা ধুতি, সাদা পাঞ্জাবি, সব পরিষ্কার ধবধবে, এত সাদা যে, প্রথমটা চোখ একটু ঝলসে যায় বইকি।

ক্লান্ত যে ছিলুম, তাতে আর সন্দেহ কী। এই নিয়ে তিনবার ভাত খেলুম, তবু খিদে আর মিটছেই না। ভদ্রলোকের সামনে দেখলুম কেবল এক কাপ চা। স্থানীয় লোক হবেন; সন্ধেবেলা সেজেগুজে বেড়াতে বেড়াতে চা খেতে এসেছেন।

আর আমার সারাদিন কী দুর্ভোগই গেল।

দুর্ভোগের কথাটা ভদ্রলোককে জানাতে আমার তেমন উৎসাহ ছিল না। আমি কেবল তাঁর কথায় সায় দেবার মতো একটু হাসলুম। কথা বলতে আমার একেবারে ভাল লাগছিল না, এমনিতেই অপরিচিত লোকজনের সঙ্গে দেখামাত্র আলাপ জমাতে আমি তেমন ওস্তাদ নই, তার উপর ক্লান্তি, আর তারও বেশি, আমর মনে হল, ভদ্রলোকের উপর কোথায় যেন একটা ঈর্ষা, রাগও বলা যেতে পারে... নিজে দিব্যি সেজেগুজে সন্ধেবেলায় হাওয়া খেতে বেরিয়েছেন,

আর আমার বিধ্বস্ত মুখের দিকে তাকিয়ে সহানুভূতি দেখানোর ভান করে মজা করা।

ভদ্রলোক বললেন, "এই হোটেলেই উঠেছেন?"

জবাবে আবার হাসলুম।

"কোন তলায়?"

এবার আর কেবল হাসি দিয়ে কাজ চালানো যাবে না। বলতেই হল, "তিনতলায়।"

"চব্বিশ নম্বর ঘর।"

ভদ্রলোক জানলেন কি করে? কিন্তু ও নিয়ে মাথা ঘামালুম না। এবার একটু হাসিতেই কাজ সারা গেল।

সত্যি খুব ক্লান্ত ছিলুম। না হলে ভদ্রলোকের সঙ্গে কিছু গল্পসল্প করাই যেত। সকাল আটটায় কলকাতা থেকে বেরিয়েছি, বারোটা নাগাদ বর্ধমানের সদরঘাটে এসে দেখলুম খেয়া বন্ধ। দামোদর একূল-ওকূল জলে ভরে গেছে। আর কী উদ্দাম স্রোত। ক'দিন ধরেই বৃষ্টি হচ্ছিল, কিন্তু কলকাতায় বসে বর্ধমানে যে এতটা বৃষ্টি হয়েছে বুঝতে পারিনি। বড় বড় খেয়া-নৌকোগুলো সব ঘাটে দাঁড়িয়ে, আর অসংখ্য লোক নৌকোর উপর ভিড় করে বসে-দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মাঝিকে জিজ্ঞেস করলুম, "নৌকো ওপারে যাবে না?"

মাঝি বলল, "এত লোক নিয়ে নদী পার হতে গেলে বিপদ ঘটবেই। ভিড় একটু কম হলেও কথা ছিল।"

কিছু যাত্রীকে সুতরাং নৌকো ছেড়ে নেমে যেতেই হবে। কিন্তু কে নামবে? সকলেরই কাজের তাড়া, সকলেরই বিশেষ প্রয়োজন। নদী পার হয়ে ওপারে আমার কলেজ, আজ জরুরি একটা পরীক্ষা নেওয়ার কথা। কী করে যাই!

সকলের সঙ্গে আমিও অপেক্ষা করতে থাকলুম। প্রায় দুটো বাজে, পরীক্ষা নেওয়ার সময় পার হয়ে গেছে, একজন মাঝি এসে চুপিচুপি আমাকে জানাল, অন্য ঘাট থেকে একটা নৌকো ছাড়ছে, তেমন ভিড় নেই, আমি গেলে ও আমার একটা ব্যবস্থা করে দিতে পারবে।

মাস্টারমশাই বলে এ-অঞ্চলে একটু-আধটু অতিরিক্ত খাতির আমি পেয়েই থাকি।

মাঝির পিছন-পিছন এসে নৌকোয় উঠলুম। নৌকো ছাড়ল। সে একটা অভিজ্ঞতা বটে। বর্ষার উদ্দাম দামোদরের উপর দিয়ে স্রোতের প্রতিকূলে নৌকো নিয়ে যাওয়া। মাঝে মাঝেই ডুবো চর— একবার ধাক্কা লাগলে ভাগ্যবশত নৌকো ভেঙেচুরে উল্টে না গেলেও চরের বন্ধন থেকে মুক্তি পেতেও গভীর রাত। সাত-আটজন মাঝি তাদের সব শক্তিটুকু ঢেলে দিয়েছে নৌকো সামলাতে,

নৌকোটাকে ওপারে নিয়ে যেতে। এ যেন একটা জেদ, একটা প্রতিজ্ঞা, প্রতিযোগিতা।

নদীর ঠিক যখন মাঝখানে, তখন মাঝিদের মুখের দিকে চেয়ে ভয়ে বুক দুরদুর করতে লাগল, স্পষ্ট বুঝতে পারলুম ওরা আর পারছে না। আর তার একটু পরেই নৌকোর হাল ভেঙে গেল।

এক মুহূর্ত! জলের মধ্যে বিদ্যুতের চেয়ে দ্রুতগতিতে নৌকো চক্রাকারে ঘুরছে। অর্থাৎ নিশ্চিত জলমগ্ন হওয়া, নিশ্চিত মৃত্যু। ভয়ে নৌকোরই একটা দিক জোরে আঁকড়ে ধরলুম। নদীর মাঝখানে নৌকো ঘুরপাক খাচ্ছে, মাঝিদের চিৎকার, সব ঠিক কানেও আসছে না। এক মুহূর্ত, দেখলুম পারে পৌঁছে গেছি, দুটো প্রবীণ গাছের মাঝখানে আমাদের নৌকো আটকে পড়েছে।

মাঝিদের কৃতিত্ব না দৈব বা ঈশ্বরের আশীর্বাদ, যে যাই বলুক, এ-যাত্রা বেঁচে গেছি। কিন্তু পারে এসে পৌঁছেছি বটে, তবে ওপারে নয়, যে পার থেকে যাত্রা শুরু করেছিলুম সেই পারেই; যেখান থেকে নৌকো ছেড়েছিল তার অন্তত দু' মাইল দূরে।

ঘড়িতে দেখলুম তখন তিনটে বাজে। ঠিক করলুম কলেজ যাবার কথা আজ আর ভাবব না, কলকাতাতেই ফিরে যাব। হাঁটতে শুরু করেছি, মুখ-চেনা স্থানীয় একজন লোক বলল, "আর একটু দেখে যান, এক্ষুনি আর-একটা নৌকো ছাড়বে।"

আমি কী করব, ঠিক ভেবে পেলুম না। কোথায় যেন একটা জেদও চেপে গেল। ওপারে যেতেই হবে। তা ছাড়া আজ যদি কলকাতায় ফিরে যাই, কাল তো আবার আসতেই হবে। কলকাতায় ফিরে যাওয়া, আবার আসা, কম পরিশ্রমের নয়।

আমি অপেক্ষা করাই স্থির করলুম। এদিকে ঝিরঝির বৃষ্টি, তা আর থামছেই না, কাপড়-জামা ভিজে জবজবে। একটা কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে দাঁড়ালুম। রুমাল দিয়ে মাথা মুছলুম। ও-পারে আমাকে যেতেই হবে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত যাওয়া হল না। কোনও নৌকোই সাহস করল না বর্ষায় উন্মত্ত দামোদর পার হতে। তখন প্রায় ছ'টা। আলো অনেক কমে এসেছে। আমি সদরঘাট থেকে বর্ধমান শহরের দিকে চললুম, ঠিক করলুম এখন আর কলকাতায় ফেরার চেষ্টা করব না, বর্ধমানেরই কোনও হোটেলে থাকব। বর্ধমান শহরে আমার অনেক সহকর্মী থাকেন, কিন্তু তাঁদের আর বিরক্ত করতে ইচ্ছে করল না।

রিকশাওয়ালাকে বললুম কোনও একটা হোটেলে নিয়ে যেতে, যে-কোনও হোটেল, একটা রাত কাটানো নিয়ে কথা।

রিকশাওলা কী একটা কারণ দেখিয়ে বলল, আজ হোটেল পাওয়া খুব শক্ত, শহরে ভীষণ ভিড়। তবু সে চেষ্টা করবে।

তিন-চারটে হোটেলে ব্যর্থ হবার পর এই হোটেল, তিনতলার চব্বিশ নম্বর ঘর। ঘরটা কিন্তু মোটেই খারাপ নয়, দু'দিক খোলা, ঘরের সঙ্গেই বাথরুম। ঘরে ঢুকে প্রথমেই ভাল করে স্নান করলুম। তারপর ব্যাগ থেকে শুকনো কাপড়-জামা বার করে পরার সঙ্গে-সঙ্গে মনে পড়ল কিছু খাওয়ার কথা, তাড়াতাড়ি ম্যানেজারের কাছ থেকে পাওয়া তালা দরজায় লাগিয়ে ছুটলুম একতলায় খাওয়ার জন্য। সত্যি, কী ভীষণ খিদে পেয়েছিল!

ভদ্রলোক আবার বললেন, "তিনতলার একা একটা ঘরে থাকতে আপনার ভয় করবে না?"

ভয়ের কথা আমার মনেই আসেনি, কিন্তু এখন আমার মনে হল অপরিচিত জায়গায় একা একটা ঘরে থাকাটা বেশ ভয়ের ব্যাপার বইকি! এইসব হোটেলে কত ঘরে কত কী ঘটেছে, কেউ হয়তো আত্মহত্যা করেছে, খুন হয়েছে, কেউ হয়তো বা... কিন্তু সে-সব কিছু না বলে মুখে সাহসের ভাব দেখিয়ে বললুম, "ভয় করবে কেন?"

"মানে এইসব হোটেলের ঘরে অনেক কিছু কাণ্ড-টাণ্ড ঘটে তো। আর সব আত্মা যে মুক্তি পাবেই, এমন কোনও কথা নেই।"

"ওসব আত্মা-টাত্মায় আমি বিশ্বাস করি না।"

"কী বললেন, আত্মায় বিশ্বাস করেন না, ভূতে বিশ্বাস করেন না আপনি?"

আমার কথা শুনে ভদ্রলোক এমন অবাক হয়ে গেলেন যে, নিজেরই কেমন অস্বস্তি বোধ হল। বললুম, "ভূতে কেন বিশ্বাস করব? এতখানি বয়স হল, কেবল ভূতের গল্পই শুনেছি, ভূত তো আর চোখে দেখিনি কখনও।"

"ভগবানকে চোখে দেখেছেন?"

"না।"

"কত সাধনা করেও মানুষ ভগবানকে দেখতে পায় না, আর কোনও সাধনা না করেই, কোনও জপতপ যাগযজ্ঞ না করেই আপনি ভূতকে দেখতে পাবেন! ভূত কি এতই ফেলনা! ভূতের জন্যে নৈবেদ্য সাজিয়ে পুজো করেছেন কোনও দিন? ভগবানের নামে কত ভাল ভাল উপচার উৎসর্গ করেন, ভূতের জন্যে কোনও দিন সামান্য কিছুও নিবেদন করেছেন কখনও?"

খাওয়া-দাওয়া করে তখন শরীরটা কিছুটা ভাল লাগছে। হেসে বললুম, "না, করিনি। ভগবানের জন্যও করিনি, ভূতেদের জন্যও করিনি। নিন, একটা সিগারেট খান।"

সিগারেট আমি খাই না। কিন্তু বিদেশ থেকে আনা খুব নামী-দামি এক কোম্পানির এক প্যাকেট সিগারেট আমার এক বন্ধু আমায় উপহার দিয়েছিল। তার দু'তিনটে খেয়েছিলুম। সেই প্যাকেটটা পকেট থেকে বার করতেই ভদ্রলোক কী খুশি।

একটা সিগারেট নিয়ে বললেন, "এই সিগারেটের কেবল নামই শুনেছি, খাইনি কখনও।"

আমি বললুম, "আপনি পুরো প্যাকেটটা রেখে দিন। আমি তো আর সিগারেট খাই না, আপনার মতো রসিক লোকের কাছে এর যথার্থ ব্যবহার হবে।"

কী যে খুশি হলেন ভদ্রলোক। এককথায় সিগারেটের প্যাকেটটা আমার হাত থেকে নিয়ে পাঞ্জাবির পকেটে পুরলেন।

পুরো-পেট ভাত খাওয়ার পর ভীষণ ঘুম আসছিল। সারাদিন কম তো পরিশ্রম হয়নি। ভদ্রলোককে বললুম, "যাই, দামটা দিয়ে আসি।"

কাউন্টারে পয়সা-টয়সা মিটিয়ে দিয়ে খাওয়ার টেবিলে রেখে-আসা ব্যাগটা নিতে এসে দেখি, ভদ্রলোক নেই। কখন উঠে চলে গেছেন।

ব্যাগ হাতে নিয়ে আমি তিনতলায় উঠতে শুরু করলুম। আসার সময় দরজায় চাবি দিয়ে এসেছি, পকেটে হাত দিয়ে দেখলুম, চাবিটা ঠিক আছে।

সত্যি, ভদ্রলোক মনের মধ্যে একটা জট পাকিয়ে দিয়ে গেছেন। ভূতটুত সত্যি আছে কি? এই ধরনের হোটেলের ঘরে কত কী ঘটে, কত কী শোনা যায়! গা'টা কেমন ছমছম করছে।

তিনতলার ম্লান আলোর দালান পার হয়ে চব্বিশ নম্বর ঘরের সামনে এলুম। আজ সারারাত এই ঘরে আমায় একা থাকতে হবে। কেউ একজন সঙ্গী থাকলেও অন্য কথা ছিল।

চাবি বার করে দরজা খুললুম। একটি ঠেলা দিতেই দরজা খুলে গেল, দেখলুম, আলো-জ্বলা ঘরে আমার দেওয়া সিগারেটের প্যাকেট কোলে নিয়ে খাটের উপর বাবু হয়ে বসে আছেন ভদ্রলোক। আমাকে দেখে বললেন, "আসুন আসুন, আপনার জন্যই বসে আছি।"

একটু থেমে বললেন, "সিগারেটটা ভারী ভাল — দেখা পেলেন তো!"

অত দ্রুত সিঁড়ি দিয়ে আমি আর কখনও নামিনি। ❑



বাইসনের শিং/ মানবেন্দ্র পাল



কলকাতার রাস্তায় শীতের মরশুমে প্রতি বছর ভুটানিরা দল বেঁধে সোয়েটার, টুপি, মাফলার বিক্রি করতে আসে।

ওয়েলিংটন স্কোয়ারের ধারে যারা বসে তাদেরই একজনের কাছ থেকে প্রতিবার কিছু না কিছু কিনি। লোকটি বৃদ্ধ। চোখে-মুখে সরলতার ছাপ আছে। ওর কাছে দাম সস্তা বলেই মনে হয়। জিনিসও খারাপ দেয় না।

এবারও একটা মাফলার কিনেছিলাম। সঙ্গে খুচরো টাকা ছিল না। ও আমার বউবাজারের বাসা চিনত। বলেছিল, এক সময়ে বাসায় এসে টাকা নিয়ে যাবে।

শীত শেষ হতে চলল, ভুটানিরা ফিরে যাবার জন্যে তৈরি হচ্ছে। এখনও লোকটি দাম নিতে এল না কেন ভাবতে ভাবতে তালা খুলে ঘরে ঢুকতেই আমি রীতিমতো ঘাবড়ে গেলাম। দেখলাম ঘরের একটা জানলা একদম খোলা। আর দুপুরের দমকা হাওয়ার সঙ্গে যে এক পশলা শেষ মাঘের বৃষ্টি হয়েছিল তাতে আমার টেবিলের কাগজপত্র চারিদিকে ছড়িয়ে ভিজে একসা হয়ে গেছে।

আমি কয়েক মিনিট দরজার কাছে বিভ্রান্তের মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। জানলা খোলা থাকলে বাতাসে কাজগপত্র উড়ে যাবেই বৃষ্টির ছাটে ভিজেও যাবে। এ তো জানা কথা। কিন্তু জানলা তো খোলা ছিল না। এই ঘরটাতে আমি একাই থাকি। এবং যখনই বেরোই তখনই সব জানলা ভাল করে বন্ধ করে যাই। এটা আমার অভ্যাস হয়ে গেছে।

জুতোটা দোরগোড়ায় খুলে আমি জানলাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালাম। দেখলাম জানলার একটা পাল্লা তখনও বন্ধ রয়েছে। অন্য পাল্লার লোহার ছিটকিনিটা তোলা। ভেতর থেকে কেউ যেন একটা পাল্লা খুলে ফেলেছে। এরকম অসম্ভব ঘটনা কি করে ঘটল তা ভেবে পেলাম না।

জামাকাপড় না ছেড়েই অবসন্ন দেহে বিছানায় শুয়ে পড়লাম। একবার ঘরের চারিদিকে তাকিয়ে দেখলাম। না, বৃষ্টি বা ঝোড়ো বাতাসে আর কিছু এলোমেলো হয়ে যায়নি। হ্যাঙ্গারে শার্ট দুটো ঝুলছে, খবরের কাগজটা দেরাজের উপরে যেমন ভাঁজ করা ছিল তেমনিই আছে। দেওয়ালে অনেকগুলি দেব-দেবীর ছবি। সেগুলো সব যেমন ছিল তেমনটিই আছে। ওপাশে দামী কাঠের ওপর মাউন্ট করা বাইসনের শিং-জোড়াটাও এতটুকু নড়েনি।

দেব-দেবীর ছবিগুলো আমার নয়। ওগুলো বাড়িওয়ালার। আমি সরিয়ে নিতে বলেছিলাম বাড়িওয়ালা বাজি হননি। অগত্যা থেকেই গেছে। বাইসনের শিং জোড়াটাই আমার।

কিছুদিনের জন্যে নেপালে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফিরেছি গত সপ্তাহে। এখানে ফিরে পর্যন্ত লক্ষ্য করছি প্রায় প্রতিদিনই কিছু অস্বস্তিকর ঘটনা ঘটছে। এতই সামান্য ঘটনা যে লোককে ডেকে বলার বা দেখাবার কিছু নেই। যেমন প্রথম দিন অফিস থেকে ফিরে তালা খুলতে গিয়ে দেখি তালা কিছুতেই খুলছে না। এমন কোনোদিন হয় না। শেষে রাস্তা থেকে কোনোরকমে একজন চাবিওয়ালাকে নিয়ে এলাম। সে আমারই চাবি নিয়ে তালায় ঢোকানো মাত্র তালা খুলে গেল। আশ্চর্য!

চাবিওয়ালা একটু হেসে চলে গেল।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠে টাইমপিসটাব দিকে তাকতে দেখি ঘড়িটা বন্ধ হয়ে গেছে। অবাক হলাম। কেননা প্রতিদিন সকালে উঠেই আমি সব আগে ঘড়িতে দম দিই। একবার পুরো দম দিলে তা অন্তত দুপুর পর্যন্ত চলে। কিন্তু সেদিনই দেখলাম ব্যতিক্রম। ভাবলাম, নিশ্চয় পুরো দম দেওয়া হয়নি। যাই হোক, নতুন করে দম দিতে লাগলাম। আর সঙ্গে সঙ্গেই স্প্রিংটা কট্ করে কেটে গেল।

কী ঝঞ্ঝাট! এখন ছোটো ঘড়ির দোকান। উট্‌কো খরচা তো আছেই, তার চেয়ে ঢের অসুবিধে, এখন বেশ কিছুদিন ঘড়িটা পাব না। রিস্টওয়াচ একটা আছে ঠিকই কিন্তু চোখের সামনে ঘড়ি না থাকলে আমার চলে না। আসলে আমি একা থাকি। ঘড়িটাই যেন আমার সঙ্গী। রাতদুপুরে হয়তো ঘুম ভেঙে গেল। এই কলকাতা শহরেও নিঝুম রাতে সরু গলির মধ্যে চুন-বালি-খসা পুরনো ঘরটার মধ্যে কেমন গা ছম্‌ছম্ করে। তখন টাইমপিসটার টিক্‌টিক্ শব্দ শুনলে যেন মনে হয় যাক, সচল কিছু একটা আমার ঘরে আছে।

আমি রোজ স্নানে যাবার আগে দাড়ি কামাই। রোজ দাড়ি না কাটলে চলে না। সেদিন খবরের কাগজ পড়তে পড়তে দেরি হয়ে গিয়েছিল। তাড়াতাড়ি সেফ্‌টিরেজার নিয়ে শেভ করতে গিয়ে দেখি ব্লেড নেই। এমন কখনও হয় না। ব্লেড ফুরোবার আগেই নতুন এক প্যাকেট ব্লেড কিনে রাখি। যাক গে, হয়তো ভুলেই গেছি। তাড়াতাড়ি লুঙ্গির ওপর শার্ট চড়িয়ে ব্লেড কিনতে বেরোলাম। ব্লেড কিনে ফিরে এসে দেখি ব্লেডের একটা গোটা প্যাকেট আয়নার সামনেই রয়েছে।

ইস্! এমন চোখের ভুলও হয়!

যাই হোক, দেরি হয়ে গেছে বলে তাড়াতাড়ি দাড়ি কামাতে বসলাম। দুটো টান দিয়েছি, অমনি থুতনির নিচেটায় খচ্ করে কেটে গিয়ে রক্ত পড়তে লাগল।

একে নতুন ব্লেড, তার ওপর তাড়াতাড়ি হাত চলছিল কেটে যাওয়াটা স্বাভাবিক। কিন্তু রক্ত কিছুতেই আর বন্ধ হয় না। আমি তখন এমন নার্ভাস হয়ে গেলাম যে কোনোরকমে তুলো দিয়ে জায়গাটা জোরে চেপে ধরে শুয়ে রইলাম। ডাক্তারখানায় যাব সে শক্তিটুকুও ছিল না।

এসব ঘটনা কাউকে জানাবার নয়, তবু আমার কাছে রীতিমতো অস্বস্তিকর। সেদিন রক্তপাত দেখে ভয় পেয়েছিলাম। মনে হয়েছিল কিছু একটা অশুভ ঘটনা যেন ঘটতে চলেছে। আজ খোলা জানলা দেখে আরো ঘাবড়ে গেলাম। মনে হল অশুভ কিছু একটা প্রতিদিন যেন এক পা এক পা করে এগিয়ে আসছে। অথচ কী যে করব ভেবে পাচ্ছি না।

ক'দিন পর।

কোথা থেকে একটা বেড়াল এসে জুটেছে। সাদা লোমে ঢাকা বেড়ালটা দেখতে বেশ সুন্দর। খুব আদুরে। এসেই আমার পায়ে লুটোপুটি খেতে লাগল। বুঝলাম কারো বাড়ির পোষা বেড়াল। ভুল করে এখানে চলে এসেছে। এসেছে যখন থাক। দুবেলা আমার পাতের এঁটো কাঁটা খেয়ে ও থেকে গেল। ভাবলাম ঘড়িটা তো দোকানে। এখন বেড়ালটাই আমার সঙ্গী হোক।

আমাদের এই গলির মুখে কতকগুলো রাস্তার কুকুর রাত্তিরে আড্ডা জমায়। অচেনা লোক দেখলেই এমন ঘেউ ঘেউ করে ওঠে যে বাছাধন পালাতে পথ পায় না। ফলে চোর-টোরের ভয় থাকে না।

রাত তখন কত জানি না। হঠাৎ কুকুরের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল। এত রাত্রে কুকুরগুলো অমন করে ডাকছে কেন?

আমি ধড়মড় করে উঠে বসলাম। প্রথমে অন্ধকারেই দেখলাম সাদা বেড়ালটা পাগলের মতো একবার খোলা জানলাটার দিকে যাচ্ছে, একবার খাটের তলায় ঢুকছে। ওদিকে রাস্তার কুকুরগুলো ক্রমাগত চিৎকার করে যাচ্ছে। কিন্তু এ চিৎকার অন্যরকম। অচেনা লোক দেখে তাড়া করে যাওয়া নয়— এ যেন কিছু একটা দেখে আতঙ্কে আর্তনাদ করে ওঠার মতো।

আশ্চর্য! কুকুরগুলো এত রাত্রে এই গলির মধ্যে এমন কী দেখল যে ভয়ে অমন করে ডাকছে!

তাড়াতাড়ি উঠে আলো জ্বেলে জানলা দিয়ে মুখ বাড়ালাম। আলো আর সেই সঙ্গে পরিচিত মুখ দেখে কুকুরগুলো শান্ত হল।

পরের দিন পাড়ার লোকদের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। তাঁরা রীতিমতো ভয় পেয়ে গেছেন। আজ দিন দশ-পনেরো ধরে প্রতি রাত্তিরেই নাকি কুকুরগুলো ঐরকম বীভৎস সুরে ককিয়ে ককিয়ে ডাকে। কেন যে অমন করে ডাকে কে জানে! নিশ্চয় ভয়ানক কিছু দ্যাখে, কিন্তু সেটা কি বস্তু?

আমি বুঝলাম, অন্য দিনের ডাক আমি শুনতে পাইনি।

আমার ঘরটা পুরনো, ভাঙাচোরা। রাতের বেলা আরশোলা, উচ্চিংড়ে প্রভৃতি নানারকম পোকামাকড় ওড়ে। মাকড়সাগুলো তো রীতিমতো ঘরবাড়ি বানিয়ে ফেলেছে।

কি একটা জিনিস যেন পড়ে গেল— সেই শব্দে হঠাৎ গভীর রাত্রে ঘুম ভেঙে গেল। আলো জ্বেলে দেখি আলমারির গায়ে ছাতাটা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, সেটা পড়ে গেছে। আর অমন ধীর শান্ত বেড়ালটা হঠাৎই বীর বিক্রমে বাইসনের শিং ধরে ঝুলছে।

শুধু ঝোলাই নয়, তার দুটো থাবা থেকে সরু সরু আটটা বাঁকানো তীক্ষ্ণ নখ বের করে বাইসনের মুখটা আঁচড়াচ্ছে।

নিশ্চয় দেওয়ালে পোকামাকড় ধরবার জন্যে লাফাতে গিয়ে বাইসনের শিং-এ আটকে গিয়ে ঝুলছে— তা বলে নেপাল থেকে কেনা আমার অমন শখের বাইসনটার মুখ আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দেবে?

আমি আর সহ্য করতে পারলাম না। উঠে, হাতের কাছে আর কিছু না পেয়ে ছাতাটা তুলে নিয়ে বেড়ালটাকে দু-চার ঘা দিয়ে ঘর থেকে দূর করে দিলাম।

পরের দিন ঘুম থেকে উঠেই চোখ পড়ল বাইসনের মাউন্ট করা মুখটার দিকে। হতভাগা বেড়ালটা মুখটাকে একেবারে নষ্ট করে দিয়েছে। একে বীভৎস মুখ, তার ওপর বেড়ালের নখের আঁচড়ে আঁচড়ে এখন ভয়ংকর হয়ে উঠেছে।

বাইরে থেকে নেপালে যারা বেড়াতে যায় তারা যে শুধু ইম্পোরটেড গুড্‌স অর্থাৎ বিদেশী জিনিসপত্তর, যেমন ছাতা, টর্চ, সেফ্‌টিরেজার, লাইটার রেকর্ড-প্লেয়ার কেনে তা নয়, কিউরিও থেকেও দুষ্প্রাপ্য পুরনো আমলের জিনিস কেনার দিকে ঝোঁকে।

নেপালে যে হোটেলে ছিলাম সেখানে সবার মুখেই শুনলাম, এখানে কোথাও বাইসনের মাউন্ট করা শিংসুদ্ধ মাথা পাওয়া যায়। দুর্দান্ত জিনিস। ভক্তপুরে নেয়ারি রাজাদের ঘরে নাকি বহুকাল ছিল। তারপর এখন নেপালের কিউরিও শপে তার গতি হয়েছে।

কিন্তু কোন কিউরিওর দোকানে পাওয়া যায় তা সঠিক কেউ জানে না।

জিনিসটা যে কী, কেনই বা দুর্দান্ত, কিসের জন্যেই বা লোকের এত আকর্ষণ কিছুই জানি না। শুধু ওটা কেনার জন্যে পাগল হয়ে উঠলাম। নানা মঠ, মন্দির, প্যাগোডা দেখতে দেখতে একদিন একটা ট্যাক্সি ভাড়া করে ভক্তপুরে চলে এলাম।

'ভক্তপুর' নাম থেকেই বুঝতে পারা যায় এক সময়ে জায়গাটায় ভক্তরা থাকতেন। তাঁরা হিন্দু কি বৌদ্ধ তা জানি না। তবে কাছাকাছি হিন্দুদের অনেক পুরনো মন্দির দেখতে পেলাম।

ভক্তপুর জায়গাটা নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু থেকে পুব দিকে আট মাইল দূরে। এখানেই এক সময়ে দুশো বছরেরও আগে নেয়ারি রাজারা বাস করতেন। তাঁদের রাজপ্রাসাদ এখনো আছে।

ঘুরতে ঘুরতে এখানে একটা কিউরিওর দোকান পেলাম। ভেতরে ঢুকে দেখি, নানারকমের পুরনো পুঁতির মালা, রুদ্রাক্ষের মালা, কারুকার্যকরা বড় বড় ছোরা, দেওয়ালে টাঙিয়ে রাখার জন্যে ভীষণদর্শন মুখ, এমনি অনেক জিনিস রয়েছে। আমি কৌতূহলী হয়ে এদিক-ওদিক কিছু খুঁজছি দেখে দোকানি জিজ্ঞেস করল— কি চাই?

আমি একে বিদেশী, তার ওপর এদেশের কিছু জানি না— সসংকোচ বাইসনের শিং-এর কথা জিজ্ঞেস করলাম।

দোকানদার আমার মুখে বাইসনের শিং-এর কথা শুনে কিছুক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল। তারপর বলল, আপনি কিনবেন?

এমনভাবে বলল যেন ও জিনিস কেনার অধিকার আমার নেই।

বললাম, দামে পোষালে আমি কিনব। তার আগে জিনিসটা দেখতে চাই।

লোকটি তখন একজন কর্মচারীর হাতে একগোছা চাবি দিয়ে আমাকে কোথাও নিয়ে যেতে বলল।

দোকান থেকে বেরিয়ে গলি-ঘুঁজি দিয়ে শেষে একটা বিরাট প্রাসাদের মস্ত কাঠের দরজার কাছে লোকটা এসে দাঁড়ালো। এ চাবি ও চাবি দিয়ে গোটা পাঁচেক দরজা খুলে শেষে সুন্দর একটা সাজানো-গোছানো ঘরে এনে দাঁড় করালো।

ঘরটি পুরনো কালের রাজা-রাজড়াদের জিনিসপত্রে ভর্তি। রাজসিংহাসন, রাজার মাথার ছাতা, বিরাট ঢাল, বাঁকা তরোয়াল, গোলাপপাস, আতরদান, ঝাড় লণ্ঠন এমন কত কী! হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল দেওয়ালে টাঙানো রয়েছে বিরাট এক মোষের মাথা। দেখেই বুঝলাম এইটেই সেই বাইসন!

বাইসন হচ্ছে আমেরিকার এক জাতীয় বুনো মোষ। মোষ যে এরকম ভয়ংকর হয় তা জানা ছিল না। চোখ দুটো লাল— যেন ক্রোধে জ্বলছে। মোটা মোটা দুটো বাঁকানো শিং।

বোঝা যায়, কোনো এককালে কোনো রাজা দুর্ধর্ষ এই জীবটিকে শিকার করেছিলেন। তারপর তাঁর এই বীরত্বপূর্ণ কীর্তিটাকে চিরস্মরণীয় করে রাখার জন্যে গোটা মাথাটা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে যেমন ছিল তেমনি রেখে হরতনের আকারে একটা কুচকুচে কালো কাঠের ফ্রেমে মাউন্ট করে রেখেছেন। এর বিশেষত্ব হচ্ছে, শিংগুলো এমন কিছু দিয়ে রং করা যা দেখলে যে কেউ মনে করবে এটা বুঝি সোনার।

একটা কথা ভেবে আশ্চর্য হলাম—আমেরিকার বাইসনের নাগাল নেপালের রাজা পেলেন কি করে!

সে কূটতর্ক থাক। জিনিসটা দেখে আমার এত পছন্দ হল যে টাকার মায়া না করে কিনে ফেললাম।

হোটেলে সবাই এই দুষ্প্রাপ্য মহামূল্যবান জিনিসটা দেখে ঈর্ষায় ফেটে পড়ল। শুধু হোটেলের ম্যানেজার আমায় বললেন, বাবু, এটা তো কিনলে কিন্তু রাখবে কোথায়?

বললাম, কেন? আমার ঘরে।

ম্যানেজার হেসে বললেন, এ বাইসন যে সে ঘরে থাকে না। রাজপ্রাসাদ চাই। কত জনে নিয়ে গেছে, শেষে বিনা পয়সায় ফেরত দিয়ে বেঁচেছে।

আমি কোনো উত্তর দিইনি। বুঝলাম ম্যানেজার আমায় ঠাট্টা করছে। আমার ঘর-বাড়ি যত ভালই হোক, এ জিনিস মানাবে না।

কুসংস্কারে বা অলৌকিকত্বে আমার এতটুকু বিশ্বাস নেই। আমি ওটিকে কলকাতায় এনে আমার সেই ভাঙাচোরা ভাড়াটে ঘরে সযত্নে টাঙিয়ে রেখেছিলাম। তারপর থেকেই যে সব ছোটোখাটো ঘটনা ঘটছিল তা অস্বস্তিকর হতে পারে কিন্তু অস্বাভাবিক বা অলৌকিক বলে মনে করিনি। আজ বেড়ালটার নখের আঁচড়ে আঁচড়ে বাইসনের অমন মুখটা বিকৃত হয়ে যাওয়ায় দুঃখ পেলাম।

কয়েক দিন পর।

অফিস-ফেরত ওয়েলিংটন স্কোয়ায়ের দিকে গিয়েছিলাম সেই ভুটানিটার সন্ধানে। দেখি ওরা এ বছরের মতো পাততাড়ি গোটাচ্ছে। আমি যে লোকটির কাছ থেকে মাফলার কিনেছিলাম সে লোকটিও রয়েছে। কিন্তু সে তখন তার দেশীয় লোকদের সঙ্গে কি একটা বিষয় নিয়ে দুর্বোধ্য ভাষায় এমনই তর্ক করছিল যে আমায় দেখে লজ্জা পেল। আমি কিছু বলার আগেই সে ইশারায় আমায় বাড়ি চলে যেতে বলল। একটু পরে সে নিজেই গিয়ে টাকা নিয়ে আসবে।

তখন সন্ধে হয়ে গেছে। তার ওপর লোডশেডিং। শেষ মাঘে হঠাৎ শীতটা যেন জাঁকিয়ে বসেছে। সর্বাঙ্গে চাদরটা ভাল করে জড়িয়ে অন্ধকার গলির মধ্যে দিয়ে সাবধানে হেটে বাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালাম। পকেট হাতড়ে চাবি বের করে তালা খুললাম। সঙ্গে সঙ্গে গা-টা কেমন যেন ছম্‌ছম্‌ করে উঠল। এমন তো কোনোদিন হয় না।

আমি চৌকাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে জুতোটা খুললাম। দু হাতে দরজার দুটো পাল্লা ছড়িয়ে দিলাম। এবার অন্ধকারে মেঝেতে পা ফেলতেই যে দৃশ্য দেখলাম তাতে আমার হৃদ্‌পিন্ডটা লাফিয়ে উঠল। মেঝেতে সাদা মতো কি একটা পড়ে আছে। আর তার সামনে দুটো জ্বলন্ত চোখ। শুধু জ্বলন্ত নয়, জীবন্ত।

সেই জীবন্ত চোখ দুটো যেন অন্ধকারের মধ্যেও আমাকে চেনবার চেষ্টা করছে।

আমি ভয়ে চিৎকার করতে গেলাম। কিন্তু স্বর বেরোল না। আমার মাথা ঘুরতে লাগল, পা টলতে লাগল। বুঝতে পারলাম আমি জ্ঞান হারিয়ে ফেলছি... আর ঠিক সেই সময়েই কে যেন বাইরে থেকে ডাকল— বাবুজি!

কেমন করে তারপর দশ-পনেরো মিনিট কেটেছে জানি না। হঠাৎই দেখলাম কারেন্ট এসে গেছে। আর ভুটানি লোকটি একদৃষ্টে মেঝের ওপর লক্ষ্য করছে। বেড়ালটা রক্তাক্ত অবস্থায় মরে পড়ে আছে— তারই পাশে বাইসনের শিংসুদ্ধু মাথাটা কাঠ থেকে খুলে পড়েছে।

ভুটানি জিজ্ঞেস করল, বাবুজি, এ জিনিস কোথায় পেলেন?

দেওয়ালে ঠেসান দিয়ে দাঁড়িয়ে ক্লান্তস্বরে সব ঘটনাই বললাম।

ও বলল, বাবুজি, এ জিনিস ঘরে রাখবেন না।

বললাম, কি করব?

সে বলল— আমি ব্যবস্থা করব। তবে এখন নয়, রাত বাড়লে। আর বাবু, আজকের রাতটা আপনি এখানে থাকবেন না। আমি একাই থাকব।

অগত্যা প্রাণের দায়ে এক অচেনা অজানা ভুটানির হাতে ঘর ছেড়ে দিয়ে আমি এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গেলাম।

পরের দিন সকালে এসে দেখি ঘরের সামনে লোকের ভিড়। বাড়িওলা ভোরে উঠে দেখে ঘর খোলা অথচ আমি নেই। বুঝলেন চোর এসেছিল। তারপরই লোক ডাকাডাকি করেছেন। আমায় দেখে তিনি ব্যস্ত হয়ে বললেন, কি মশাই! কাল কোথায় ছিলেন? এদিকে—

আমি সব কথাই চেপে গেলাম। শুধু বললাম, বিশেষ দরকারে কাল রাত্তিরে এক আত্মীয়ের বাড়ি থাকতে হয়েছিল।

দেখুন দেখি! আর সেই সুযোগেই চোর এসে হানা দিল। কুকুরগুলোও ডাকল না মশাই! আশ্চর্য!

বাড়িওলা আলাদা ডেকে নিয়ে গিয়ে বললেন, কি কি জিনিস চুরি গেছে, ঠান্ডা মাথায় একটা লিস্ট করে ফেলুন। থানায় জানাতে হবে তো। বলে তিনি শশব্যস্তে ওপরে চলে গেলেন।

লিস্ট করার দরকার হয়নি। কেননা আমি ভাল করে দেখেছি, কিছুই চুরি যায়নি। যাবার মধ্যে গেছে বাইসনের শিংওয়ালা মাথাটা আর সেই ভুটানি লোকটি। □

সেই সব ভূত/ সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ



আমাদের গাঁয়ে একসময় প্রচুর ভূত ছিল। শুধু রাতবিরেতে নয়, দিনদুপুরেও তারা একলা-দোকলা মানুষকে বাগে পেলে ভয় দেখিয়ে দুষ্টুমি করত।

দুষ্টুমিই বলা উচিত। কারণ কখনও তারা কারুর ঘাড় মটকেছে বা ঠ্যাং ভেঙেছে বলে শুনিনি। তবে ভয়ের চোটে কেউ ভিরমি খেয়ে মারা পড়লে কিংবা দৌড়ে পালাতে গিয়ে কারুর ঠ্যাং ভাঙলে সেজন্য তো আর ভূতকে দায়ী করা চলে না। যার যা কাজ। ভূতের কাজটাই হল মানুষকে ভয় দেখানো। যে ভূত ভয় দেখায় না, সে আবার কিসের ভূত?

কথাটা বলতেন আমার বড়মামা।

বড়মামা রেলে চাকরি করতেন। ছুটিছাটায় আমাদের বাড়ি আসতেন। সাংঘাতিক সাংঘাতিক সব ভূতের গল্প বলে আমাদের রক্ত জল করে ফেলতেন। গল্প শোনার পর আমরা যারা ছোট তাদের অবস্থা তখন শোচনীয়। কিন্তু তারপরই বড়মামা হো হো করে হেসে বলতেন, ওরে! ভূতকে কক্ষণো ভয় পাবি না। কারণ কী জানিস? মানুষ যেমন ভূতকে ভয় পায়, ভূতও মানুষকে খুব ভয় পায়। ভূত যদি ভয় দেখায়, তোরাও তাকে ভয় দেখাবি। দেখবি, ব্যাটাচ্ছেলে তক্ষুনি কেটে পড়েছে।

সে-কথা শুনেও যে খুব একটা সাহস পেতাম, তা নয়। আমার তো খালি ভাবনা হত, ভূত বড়দের ভয় পেতেও পারে, কিন্তু আমাদের মতো ছোটদের কি আর ভয় পাবে?

আমাদের বাড়ির পিছনদিকটায় ছিল একটা বাগান। তার ওধারে একটা ঝিল। ঝিলের ওপারে ছিল ঘন জঙ্গল। ঠাকমা বলতেন, ঝিলের জঙ্গলে থাকে এক কন্ধকাটা। আর ঝিলের ধারে থাকে এক শাঁকচুন্নি। শাঁকচুন্নিটা রোজ রাত্তিরে আলো জ্বেলে ঝিলের ধারে কী যেন খুঁজে বেড়ায়। কন্ধকাটা আলো সইতে পারে না। তাই সে এসে শাঁকচুন্নির সঙ্গে খুব ঝগড়া বাধায়। ঝগড়ার চোটে সারারাত্তির ঘুমোতে পারিনে।

ঠাকমা থাকতেন বাড়ির পিছনের ঘরে। কখনও-কখনও রূপকথা শোনার লোভে আমি ঠাকমার কাছে শুতে যেতাম। রূপকথা বলতে বলতে ঠাকমা হঠাৎ থেমে গেলে বলতাম, তারপর কী হল বলো না?

ঠাকমা আস্তে বলতেন, ওই আবার বেধেছে।

কি বেধেছে?

কন্ধকাটার সঙ্গে শাঁকচুন্নির ঝগড়া। শুনতে পাচ্ছিস না তুই?

কৈ, না তো!

জ্বালাতন! বলে ঠাকমা উঠে গিয়ে ওদিকের জানালাটা বন্ধ করে দিতেন। তারপর বলতেন, এর একটা বিহিত করা দরকার। কালই মোনা ওঝাকে ডেকে পাঠাতে হবে।

মোনা ছিল ভূতের ওঝা। ভূতগুলোর সঙ্গে নাকি বেজায় ভাব। তারা তাকে খুব সমীহ করে। একবার হলো কী, সিঙ্গি মশাই রাত নটার বাসে শহর থেকে ফিরছেন। হাতে ছিল এক ভাঁর রসমালাই। ঠাক্‌রুনতলার বটগাছের কাছে যেই এসেছেন, অমনি গাছ থেকে ঝুপ ঝুপ করে কয়েকটা ছায়ামূর্তি লাফিয়ে পড়ে তাঁকে ঘিরে ধরেছে। রসমালাইয়ের ওপর ভূতদের লোভ হতেই পারে। 'দেঁ দেঁ' করে তারা চেঁচাচ্ছিল।

এসব ক্ষেত্রে নিয়ম হল, 'দেব-দিচ্ছি' করে বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে হয়। কিন্তু সিঙ্গিমশাই নিয়মটা ভুলে গিয়ে পড়লেন একটা গর্তে। আর একটা ঠ্যাংও গেল ভেঙে। রসমালাইয়ের ভাঁড়টা হাত থেকে ছিটকে পড়েছিল। ভূতেরা আহ্লাদ করে রসমালাই সাবাড় করল। সিঙ্গিমশাই যন্ত্রণায় কাতরাতে কাতরাতে সবই দেখলেন। কিন্তু কী আর করা যাবে?

তাঁর কাতরানি রামু ধোপা শুনতে পেয়েছিল। সে বেরিয়েছিল তার গাধাটাকে খুঁজতে। গাধাটার ছিল বিচ্ছিরি স্বভাব। প্রায় রাত্তিরেই দড়ি ছিঁড়ে খেলার মাঠে চলে যেত এবং পছন্দসই কোনও ভূতকে পিঠে চাপিয়ে ছুটোছুটি করত। আসলে রামুর গাধার সঙ্গে ভূতদের ছিল বেজায় গলাগলি, বন্ধুতা।

তো রামু সিঙ্গিমশাইকে কাঁধে করে বাড়ি পৌঁছে দিয়েছিল। তারপর শহরের হাসপাতালে কয়েকমাস কাটিয়ে সিঙ্গিমশাই ফিরে এলেন বটে, কিন্তু একটি ঠ্যাং হাঁটুর ওপর থেকে বাদ। ক্রাচে ভর করে হাঁটতেন এবং নতুন নাম পেয়েছিলেন 'খোঁড়াসিঙ্গি'।

খোঁড়াসিঙ্গি ভূতের ওপর খাপ্পা হয়ে মোনা ওঝাকে তলব করেছিলেন। বলেছিলেন, শুধু ঠাকরুন্‌তলার নয়, গাঁয়ের সব ভূতকে গঙ্গার ওপারে তাড়িয়ে দিয়ে আয় তো মোনা। যা চাস, পাবি।

মোনা ওঝা বলল, তাড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক হবে সিঙ্গিমশাই? কাউকে ভিটেছাড়া করা যে মহাপাপ। তাছাড়া ওদের সঙ্গে আমার কতকালের সম্পর্ক। যা বলি, তাই শোনে। এ কাজ আমি পারব না সিঙ্গিমশাই।

খোঁড়াসিঙ্গি তর্জনগর্জন করে বললেন, তা হলে তোকেই ভিটেছাড়া করব বলে দিচ্ছি। বেশ বুঝেছি, তুই-ই যত নষ্টের গোড়া। তোরই আস্কারা পেয়ে হারামজাদাগুলোর এত বাড় বেড়েছে। দাঁড়া! কালই পঞ্চগেরামি করে তোর বিচারের ব্যবস্থা করছি।

সে আমলে 'পঞ্চগেরামি' অর্থাৎ পঞ্চগ্রামী মানে পাঁচ গাঁয়ের মাতব্বর লোকদের ডেকে বিচারসভার আয়োজন। সেই বিচারসভা বসল চণ্ডীমণ্ডপে। মোনাকে ডেকে আনা হল। মোনা ওঝা কিন্তু একটুও দমে যায়নি। সে মুচকি হেসে বলল, বাবুমশাইরা! ওপরে দেবতা, নিচে মা বসুমতী। ন্যায্য বিচার করে বলুনদিকি দোষটা কার? সিঙ্গিমশাইয়ের ঠ্যাং কি ভূতগুলো ভেঙেছে, নাকি নিজেই গর্তে আছাড় খেয়ে নিজেই ভেঙেছেন? জিজ্ঞেস করুন তো সিঙ্গিমশাইকে।

সবাই একমত হলেন যে, ভূতগুলো সিঙ্গিমশাইয়ের ঠ্যাংয়ে আঘাত করেনি, এটা সত্যি। কিন্তু পাশের গাঁয়ের চক্কোত্তি মশাই বললেন, মানছি, ওরা সিঙ্গিমশাইয়ের ঠ্যাং ভাঙেনি। তবে এ-ও তো ঠিক যে, ভূতগুলো ওঁকে ভয় না দেখালে উনি দৌড়ে পালাতেন না এবং গর্তে পড়তেন না। ঠ্যাংও ভাঙত না।

মোনা ওঝা হাত নেড়ে বলল, ভুল! এক্কেবারে ভুল। ভূতগুলো ওঁকে কক্ষনো ভয় দেখায়নি। মা চণ্ডীর দিব্যি করে বলুন উনি।

মাতব্বররা সিঙ্গিমশাইকে জিজ্ঞেস করলেন কথাটা। সিঙ্গিমশাই গাঁইগুই করে বললেন, না-মানে, ঠিক ভয় দেখায়নি। তবে আমার হাতে রসমালাইয়ের ভাঁড় ছিল। সেটা কেড়ে নিতে এসেছিল।

মোনা ওঝা বলল, আবার ভুল হল বাবুমশাইরা! কেড়ে নিতে এসেছিল, নাকি চেয়েছিল? মা-চণ্ডীর দিব্যি, সত্যি কথাটা বলুন।

আমাদের গাঁয়ের মা-চণ্ডী জাগ্রত দেবী। তাঁর ভয়ে খোঁড়াসিঙ্গিকে স্বীকার করতে হল, রসমালাইগুলো কেড়ে নেবে বলে মনে হচ্ছিল বটে, তবে ওরা 'দেঁ দেঁ' করে চেঁচাচ্ছিল সেটা মিথ্যা নয়।

তা হলে? মোনা ওঝা একগাল হেসে বলল, এবার বলুন দোষটা কার? হাতে রসমালাই দেখলে কেউ চাইতেই পারে। আপনি ইচ্ছে হলে দেবেন, নয় তো দেবেন না, আপনি বললেই পারতেন, দেব না। তা না করে আপনি দৌড়ে পালালেন। গর্তে পড়ে ঠ্যাংটি ভাঙলেন। আর দোষটা দিচ্ছেন অন্যকে?

মামলা ভেস্তে যাচ্ছে দেখে খোঁড়াসিঙ্গি বললেন, কিন্তু আমার নালিশ তো এই মোনার বিরুদ্ধে। মোনার আস্কারাতেই এ গাঁয়ের ভূতগুলোর বড্ড বাড় বেড়েছে।

মোনা ওঝা বলল, প্রমাণ?

মাতব্বররাও বলে উঠলেন, হ্যাঁ। প্রমাণ চাই। সাক্ষী চাই। সিঙ্গিমশাই, কৈ আপনার সাক্ষীদের ডাকুন।

সাক্ষী পাওয়া গেল না। আমাদের গাঁয়ের লোকেরা বলল, ভূতগুলো বাড়াবাড়ি করলে বরং মোনা ওঝাই এসে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়। কাজেই মোনা তাদের আস্কারা দেয় বলা চলে না। তাছাড়া আজ অব্দি মোনা ওঝা কারুর পেছনে ভূতকে লেলিয়ে দিয়েছে বলেও জানা নেই।

'পঞ্চগেরামি' বিচারসভায় মোনা ওঝা বিলকুল খালাস পেয়ে গেল।

কিন্তু খোঁড়াসিঙ্গির রাগ পড়েনি। কিছুদিন পরে উনি কোত্থেকে এক সাধুবাবাকে নিয়ে এলেন। সাধুবাবা ঠাকরুনতলায় ত্রিশূল পুঁতে মড়ার খুলির সামনে ধুনি জ্বেলে ধ্যানে বসলেন। গাঁ-সুদ্ধু ছোটবড় সবাই ভিড় জমাল সেখানে। আমরা, ছোটরাও ব্যাপারটা দেখতে গেলাম।

সাধুবাবা একসময় ধ্যান ভেঙে লালচোখে চারদিক দেখে নিয়ে মড়ার খুলিটা তুলে নিলেন। মন্তর আওড়ে গর্জন করলেন, আয় আয়! যে যেখানে আছিস, চলে আয়। এই খুলির মধ্যে ঢুকে পড় সবাই। বেম্মদত্যি, কন্ধকাটা, শাঁকচুন্নি, মামদো, পেঁচো, গোদানো, হাঁদা, নুলো, ভুলো, কেলো, ক্যাংলা-খ্যাংলা দুই ভাই, জটা-জটি, পিশাচ, গলায় দড়ে, যখবুড়ো সব্বাই আয়! সব্বাই এসে ঢুকে পড় এই খুলির ভেতর।

এই বলে সাধুবাবা মড়ার খুলিটা দু'হাতে চেপে ধরে ঝুলিতে ঢোকালেন। ত্রিশূল তুলে হুঙ্কার দিতে দিতে এগিয়ে গেলেন ঝিলের দিকে। ঝিলের জলে মড়ার খুলিটা বের করে দিচ্ছি, যে এই খুলি তুলবে, তার মুখে রক্ত উঠে মারা পড়বে।...

এরপর বেশ কিছুদিন আমাদের গাঁয়ে আর ভূতের সাড়াশব্দ ছিল না। মোনা ওঝা নাকি মনমরা হয়ে ঘুরে বেড়াত। লোকেরা রাতবিরেতে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করত। মাঝেমাঝে দেখতাম, রামু ধোপার গাধাটা ঝিলের ধারে ঘাস খেতে খেতে হঠাৎ মুখ তুলে তাকাত। ওর দৃষ্টিটা খুব করুণ মনে হত। তার খেলার সঙ্গীরা জলের তলায় খুলির ভেতর বন্দী। বেচারার দুঃখ হতেই পারে।

হঠাৎ একদিন হইচই পড়ে গেল।

রামু ধোপা গিয়েছিল ঝিলের জলে কাপড় কাচতে। সে দেখেছে সেই মড়ার খুলিটা ঝিলের ধারে পড়ে আছে। জল থেকে নিশ্চয় কেউ ভূতবোঝাই খুলিটা তুলেছে।

সারা গাঁ ভেঙে পড়ল ব্যাপারটা দেখতে। খোঁড়াসিঙ্গিও ক্রাচে ভর করে হাঁফাতে হাঁফাতে সেখানে হাজির হলেন। আমারও দেখার ইচ্ছে করছিল। কিন্তু বড়রা কিছুতেই ছোটদের যেতে দিলেন না। জলের তলায় খুলি থেকে খালাস পাওয়া ভূতগুলো খাপ্পা হয়েই আছে। কাজেই অবোধ আর দুর্বল ছোটদের ওপর তাদের নজর পড়ার সম্ভবনা আছে।

পরে শুনলাম, দায়টা চেপেছে মোনা ওঝারই কাঁধে। মোনাও তন্ত্রমন্ত্র জানে। কাজেই সাধুবাবার ফেলে দেওয়া খুলি সে ছাড়া জল থেকে তুলবে সাধ্য কার? তাছাড়া মোনা নিশ্চয় কোনও বড় ওঝার কাছে নতুন বিদ্যে রপ্ত করে এসেছে। তবে শেষ পর্যন্ত এতে মোনা ওঝারই জয়-জয়কার পড়ে গেল। মুখে রক্ত উঠে সে মারা পড়েনি। তার মানে, আমাদের গাঁয়ের এই ওঝা সেই সাধুবাবার চেয়ে এখন আরও ক্ষমতাশালী। সিঙ্গিমশাই কেঁচো হয়ে ঘরে ঢুকলেন। কদাচিৎ বাইরে বেরুতেন তিনি। বেরুলেই দিনদুপুর ছাড়া নয়। মোনা ওঝার এতে দাপট বেড়ে গেল।

এদিকে আবার ভূতের সাড়াশব্দ পাওয়া গেল সেদিন থেকেই। পণ্ডিতমশাই পাঠশালার ছুটির পর বাড়ি ফিরছেন। হঠাৎ গাছ থেকে টুপ-টাপ করে ঢিল পড়ল। পণ্ডিতমশাইয়ের বেলায় এ কোনও নতুন ঘটনা নয়। বরং ঢিল পড়া বন্ধ হওয়াতে তাঁর খারাপ লাগত। আবার ঢিল পড়ায় খুশি হয়েছিলেন। বললেন, কীরে তোরা সব কেমন আছিস? গদাই মোড়ল সন্ধ্যাবেলা মাঠ থেকে ফিরছেন। একটা কালো বেড়াল তাঁর সঙ্গ নিল। মোড়ল খুব খুশি হয়ে বললেন, ভাল ছিলিস তো বাবা? নাকি জলবন্দী হয়ে খুব কষ্টে ছিলিস?

এইসব ঘটনা সন্ধ্যাবেলায় ছোটকাকা খুব জমিয়ে বর্ণনা করতেন। আমি কিন্তু তখনও কোনও ভূত দেখিনি বা সে-রকম কোনও সাড়াশব্দও পাইনি। বড়রা বলতেন, ভূত আছে। আমরা ছোটরাও মেনে নিতাম, ভূত আছে। তাছাড়া বড়মামা এসে ভূতের স্বভাবচরিত্র কীর্তিকলাপ শুনিয়ে ভূতের ব্যাপারটাকে আরও পাকাপোক্ত করে ফেলতেন।

তো অমন একটা ঘটনার কিছুদিন পরে ঠাকমার মুখে ঝিলের ধারের শাঁকচুন্নি আর জঙ্গলের কন্ধকাটার ঝগড়ার কথা শুনেছিলাম। বলেছিলেন, মোনা ওঝাকে ডাকতে হবে। মোনা ছাড়া এর বিহিত হবে না।

মোনা ওঝা পরদিন এসেছিল। ঠাকমার মুখে সব শুনে সে বলল, বড় সমিস্যে দিদিঠাকরুন। ওদের ঝগড়া-ঝাঁটির কথা আমার অজানা নয়। অনেক চেষ্টা করেও মিটমাট করাতে পারিনি। আসলে শাঁকচুন্নিটা আলো ছাড়া এক পা হাঁটতে পারে না। মেয়েটা রাতকানা। ওদিকে কন্ধকাটার চোখে ঘা। আলো লাগলেই জ্বালা করে। কাকে দোষ দেব বলুন?

তুই কন্ধকাটাকে বরং অন্য কোথাও গিয়ে থাকতে বল্ মোনা!

যাবেটা কোথায়? সব জায়গাই তো দখল হয়ে আছে।

খুঁজলে নিশ্চয় কোথাও পাওয়া যাবে। তুই খুঁজে দ্যাখ্ না।

মোনা ওঝা একটু ভেবে নিয়ে বলল, মুসলমানপাড়ার গোরস্তানে একটা শ্যাওড়া গাছ আছে। গাছটাতে এক মামদো থাকত দেখেছি। কল রাত্তিরে গিয়ে তাকে ডাকলাম, চাচা আছ নাকি? কোনও সাড়া পেলাম না। আমার সন্দ হচ্ছে, মামদোচাচা ডেরা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে গেছে। প্রায়ই বলত, গাছটা পছন্দ হচ্ছে না রে। হাত পা ছড়িয়ে বসা যায় না। বড্ড বেশি ডালপালা। হাওয়া-বাতাস ঢোকে না।

ঠাকমা খুব উৎসাহ দেখিয়ে বললেন, তাহলে তুই কন্ধকাটাকে গিয়ে কথাটা বল্ মোনা! ওদের ঝগড়ার জ্বালায় সারারাত্তির ঘুমোতে পারিনে!

মোনা ওঝা কিন্তু কিন্তু করে বলল, দেখি, বলে কয়ে। তবে গোরস্তানে কন্ধকাটা যেতে রাজি হবে বলে মনে হয় না।

কেন? রাজি না হওয়ার কি আছে?

বুঝলেন না? কন্ধকাটা হল হিন্দু। মুসলমানদের গোরস্থানে যেতে চাইবে কি?

ঠাকমা ফোকলা দাঁতে হেসে বললেন, ধুর পাগল! ভূতের আবার হিন্দু-মুসলমান কি রে? ভূত হল ভূত। মানুষের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান আছে। ভূতের মধ্যে নেই। তুই কন্ধকাটাকে একবার বলেই দ্যাখ গে না! বলবি, গোরস্তানের তল্লাটে একেবারে সুনসান অন্ধকার। আরামে থাকবে।...

ক'দিন পরে মোনা ওঝা এসে বলল, কেলেংকারি হয়ে গেছে দিদিঠাকরুন! কন্ধকাটাকে বলে-কয়ে রাজি করিয়েছিলাম। কাল সন্ধ্যেবেলায় সে গোরস্তানের শ্যাওড়াগাছে ডেরা বাঁধতে গিয়েছিল। কিন্তু মামদোচাচা আবার ফিরে এসেছে। তাড়া খেয়ে কন্ধকাটা পালিয়ে এল।

ঠাকমা নিরাশ হয়ে বললেন, মুখপোড়া মামদোটা ফিরে এল কেন জানিস?

বলতে গেলে সে অনেক কথা! মোনা ওঝা শ্বাস ছেড়ে বলল। বেঁচে থাকতে এক কাবুলিওলার কাছে দেনা করেছিল। এদিকে কাবুলিওলাও যে মরে ভূত হয়েছে আর মেদিপুরের গোরস্তানের কাছে বাজপড়া তালগাছের ডগায় ডেরা খুঁজে নিয়েছে, মামদোচাচা জানত না। ওকে দেখেই কাবুলিওলা লাঠি নিয়ে তাড়া করেছিল। তাড়া খেয়ে কাঁহা কাঁহা মুল্লুক ঘুরে মামদোচাচা বাড়ি ফিরেছে।

হ্যাঁরে মোনা, তাহলে এক কাজ কর না তুই। ঠাকমা মিটিমিটি হেসে বললেন, ঘটকালিতে লেগে যা। শাঁকচুন্নির সঙ্গে কন্ধকাটার বিয়ে দিয়ে দে। তাহলেই মিটমাট হয়ে যাবে।

মোনা ওঝা ফিক করে হাসল। সেই চেষ্টাই তো করছি দিদিঠাকরুন। শুধু একটাই সমিস্যে। কন্ধকাটার চোখের ঘা সারিয়ে দেওয়া দরকার। তাহলে

শাঁকচুন্নির পিদিমের আলো ওর চোখের ঘায়ে খোঁচা দেবে না। দেখি, তেমন বদ্যি-কোবরেজ কোথাও পাই নাকি!

মোনা চলে গেলে বললাম, আচ্ছা ঠাকমা, কন্ধকাটাদের তো মুণ্ডু নেই শুনেছি। ছোটকাকা বলছিলেন। ওদের চোখ কোথায় থাকে তাহলে?

ঠাকমা বললেন, ধুর বোকা! চোখ থাকে ওদের বুকের ওপর।

কন্ধকাটার বুকে চোখের কথা শুনে খুব ভয় পেয়ে গেলাম। তারপর থেকে দিনদুপুরেও আর ঝিলের জঙ্গলের দিকে তাকাতে সাহস পেতাম না। বড়মামা বলতেন বটে, ভূতকে কক্ষনো ভয় পাবি না। কিন্তু কন্ধকাটার একে তো মুণ্ডু নেই, তার ওপর বুকে দুটো চোখ। মুখোমুখি দেখা তো দূরের কথা, কল্পনা করতেই যে রক্ত হিম হয়ে যায়!

তো শেষ পর্যন্ত মোনা ওঝা ভূতের কোবরেজ খুঁজে পেয়েছিল। সেই কোবরেজের মলমে নাকি কন্ধকাটার চোখের ঘা সেরে যাচ্ছিল। আগামী কালীপুজোয় অমাবস্যার রাত্তিরেই কন্ধকাটার সঙ্গে শাঁকচুন্নির বিয়ের দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল। মোনা রোজই এসব খবর দিয়ে যেত। বিয়েতে খরচাপাতির ব্যাপার আছে। ঠাকমা সবই দিতে রাজি হয়েছিলেন।

কিন্তু হঠাৎ এক অঘটন ঘটে গেল।

হঠাৎই বলা চলে। কারণ ইতিমধ্যে আমাদের গাঁয়ে বিদ্যুৎ সরবরাহের পরিকল্পনা হয়েছে এবং খুঁটি পোঁতার কাজও শেষ, কিন্তু বিদ্যুতের পাত্তা ছিল না। লোকেরা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। এতদিনে খবর পাওয়া গেল, সামনে দুর্গাপুজোয় বিদ্যুৎ আসছে। উদ্বোধন করতে আসছেন বিদ্যুৎমন্ত্রী। সাজো সাজো রব পড়ে গেল খবর শুনে। শহর থেকে ইলেকট্রিক মিস্ত্রি আসার হিড়িক পড়ল সঙ্গে সঙ্গে। ছোটকাকা আমাদের বাড়িতে মিস্ত্রি এনে বিপুল উৎসাহে কাজে নেমে পড়লেন। বাগানের দিকে আলোর ব্যবস্থা করা হল। তারপর ষষ্ঠীর দিন সন্ধ্যাবেলায় খেলার মাঠে জনসভা হল। বিদ্যুৎমন্ত্রী এসে সুইচ টিপে উদ্বোধন করলেন। চারদিক উজ্জ্বল আলোয় ভরে গেল।

সে রাত্তিরে আমরা প্রায় জেগেই কাটালাম। এত আলো, এমন উজ্জ্বল আলো ছেড়ে কি ঘুমোতে ইচ্ছে করে?

শুধু ঠাকমার মুখ গম্ভীর। কেন গম্ভীর, তা সকালবেলায় জানতে পারলাম। বাগানের কোনায় একটা বেলগাছ ছিল। সেই গাছে থাকত এক বেম্মদত্যি। সকালে দেখি, ঠাকমা বেলতলায় চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছেন। দৃষ্টি ঝিলের দিকে।

ঠাকমার কাছে গেছি, সেই সময় মোনা ওঝা ঝিলের দিক থেকে হন্তদন্ত হয়ে এসে ধপাস করে বসে পড়ল। ঠাকমা বললেন, খুঁজে পেলি?

মোনা ওঝা ফোঁস করে শ্বাস ফেলে বলল, নাহ্। সব পালিয়েছে। কেউ নেই।

ঠাকমা বেলগাছের ডগার দিকে মুখ তুলে বললেন, এ বুড়োও পালিয়েছে। কাল রাত্তিরে স্পষ্ট দেখলাম যেই, ওই আলোটা জ্বলেছে, অমনি বুড়ো গাছ থেকে নেমে পালিয়ে গেল। ওই দ্যাখ্, হাত থেকে হুঁকোটা পড়ে গেছে। কল্কেটাও পড়ে আছে. দেখতে পাচ্ছিস?

মোনা উদাস চোখে হুঁকোটার দিকে তাকিয়ে বলল, দিদিঠাকরুন যদি হুকুম দেন, বাবা বেম্মদত্যির হুঁকো-কল্কে আমিই নিয়ে যাই।

নিয়ে যা। ঠাকমা করুণ মুখে বললেন। তবে এঁটো করিসনে যেন। বামুন বুড়ো জানতে পারলে কষ্ট পাবে। রোজ রাত্তিরে বুড়ো হুঁকো খেত আর খকখক করে কাসত। আহা, কোথায় ভিটেছাড়া হয়ে চলে গেল সব?

মোনা ওঝা হুঁকোকল্কে কুড়িয়ে নিয়ে বলল, আমার সবচেয়ে দুঃখুটা কী জানেন দিদিঠাকরুন? শাঁকচুন্নি আর কন্ধকাটার বিয়েটা ভন্ডুল হয়ে গেল। এ আলো কি যেমন-তেমন আলো? ইলেকটিরি বলে কথা। আমি যে মানুষ, আমারও চোখ জ্বালা করে। তবে দেখবেন দিদিঠাকরুন, এ পাপ সইবে না। আমি বরাবর বলে আসছি, কাউকে ভিটেছাড়া করার মতো পাপ আর নেই। এই মহাপাপ কি ভগবান সইবেন ভাবছেন? কক্ষনো না।...

ঠিক তাই।

মোনা ওঝার কথা ফলেছে বলা চলে। এখন আমি বড় হয়েছি। কলকাতায় থাকি। খবর পাই, আমাদের গাঁয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা, দিনের পর দিন বিদ্যুৎ থাকে না। মোনার ভগবান নাকি লোডশেডিং নামে এক সাংঘাতিক দানো পাঠিয়ে দিয়েছেন। সে ভিটেছাড়া ভূতগুলোকে ফিরিয়ে এনেছে। তাছাড়া চোখে সইয়ে সইয়ে বিদ্যুতের আলো দিয়ে ভূতগুলোকে সে চাঙ্গা করে তুলেছে। সেইসব ভূতই নাকি তার কাটে। ট্রান্সফর্মার চুরি করে। কত উপদ্রব ঘটায়। ঠাকমা বেঁচে নেই। মোনাও বেঁচে নেই। বেঁচে থাকলে শাঁকচুন্নি আর কন্ধকাটার বিয়েটা লোডশেডিংয়ের দৌলতে ঘটা করেই ওঁরা দিতেন।

বললে তোমরা হয়তো বিশ্বাস করবে না। গত পুজোয় গাঁয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম। রাত্তিরে হঠাৎ লোডশেডিং। অভ্যাসমতো ঠাকমার সেই ঘরে শুয়েছিলাম। রাত দুপুরে বাগানে হঠাৎ খকখক করে কাশির শব্দ শুনে জানলার উঁকি মেরে দেখি, সেই বেলগাছে হুঁকোর আগুন জুগজুগ করছে।

খুব খুশি হলাম। মানুষের জীবনে ভূতটুত না থাকলে কি চলে? জীবনটাই যে নীরস হয়ে যাবে, যদি না থাকে ভূতপেত্নী, যদি না থাকে অন্ধকার!... ❑

*

মেছোভূত / বরেন গঙ্গোপাধ্যায়



মাছ ধরা একটা নেশা। এই নেশাতেই পড়ে গিয়েছিলাম এক সময়। আয়োজনের ত্রুটি নেই, দামী হুইল আর ছিপ কিনে ফেললাম। কেবল হুইল আর ছিপ থাকলেই তো হয় না, চার আর টোপও দরকার। কত মশলাপাতি কিনে যে টোপ বানাতাম তার হিসেব নেই। খবর পেলেই ছুটে যেতাম কোথায় পিঁপড়ের ডিম পাওয়া যায়, কোথায় মৌচাক কী বোলতার চাক। মাছ ধরার জন্য পুকুরের ধারে বাঁশ পুঁতে মাচাও বানিয়ে নিয়েছিলাম একটা। অথচ কপালের ফের, রুই কাতলা কালেভদ্রে এক আধবার হয়তো তুলতে পেরেছি কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই পুঁটি ট্যাংরা কই মাগুর। এত আয়োজন করে বড় মাছ যদি না তোলা যায়, মন খারাপ লাগবে বৈকি! প্রায় দিনই কুচোকাচা মাছ নিয়ে বাড়ি ফেরার সময় বেশ মন খারাপ হয়ে যেত।

তা, সেই পুকুরের ধারে মাছ ধরার জন্য আরো কয়েকজন ছিপ নিয়ে এসে বসত সেসময়। দু'একজনের সঙ্গে একটু বন্ধুত্বও হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যারা মাছ ধরে তারা ছিপ ফেলে কখনো বকবক করে না। কেবল জলের উপর ফাতনার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে। ফাতনা একটু নড়ে উঠলেই আর রক্ষে নেই, পৃথিবী যদি রসাতলেও যায় মাছটাকে ডাঙায় না তোলা অবধি মাথার ঠিক থাকে না।

আমি যেখানে বসতাম সেখান থেকে হাত পঁচিশেক দূরে বসত মনোজ। মনোজের কপালটাও ঠিক আমারই মতো, ওকেও খুব বেশি একটা রুই কাতলা

ধরতে দেখতাম না। সেই মনোজ একদিন বিরক্ত হয়ে বলল, এ তো আর পারা যাচ্ছে না ভাই। মাছ ধরার জন্য যা খরচ করছি, তাতে বাজার থেকে কিনে খেলে অনেক লাভ হত।

বিশু, আমাদেরই আর এক মাছ ধরার বন্ধু, কথাটা শুনতে পেয়েই হেসে উঠল, তা যা বললে ভাই। কিন্তু বাজারের মাছ আর ছিপে ধরা মাছের স্বাদ যে আকাশপাতাল তফাত। ও ভাই তুমি যাই বলো, এ পুকুরে বড় মাছটাছ আর আছে কিনা সেটাই আমার সন্দেহ। আমাদের বোধহয় এবার থেকে অন্য পুকুরে গিয়ে বসা উচিত।

বললাম, বড় মাছ যে নেই, সেটা কিন্তু ঠিক নয়। সেবার পরাশরবাবু দু'কেজি ওজনের একটা কাতলা ধরেছিলেন মনে আছে? আসলে আমাদের ছিপ ফেলার মধ্যেই কোথাও যেন একটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।

মনোজ গাঁক গাঁক করে উঠল, মাছ ধরা আমাকে শেখাবি নাকি। জীবনে কত মাছ ধরেছি তার হিসেব দিলে তোর মাথা ঘুরে যাবে।

আমি আর কথা বাড়াই না। আবার ফাতনার দিকে চোখ পেতে বসে থাকি। ঘড়িতে বড় জোর চারটে। আর ঘন্টা খানেক কি ঘন্টা দেড়েক এখানে বসা যাবে। তারপর মন খারাপ করে বাড়িতে গিয়ে ঢুকতে হবে। ফালতু বকবক করে আর লাভ নেই।

যাই হোক আরও মিনিট দশ পনের বোধ হয় কেটেছিল, হঠাৎ কোত্থেকে মোটাসোটা একটা লোক ছিপ হাতে এগিয়ে এসে পুকুরের একধারে বসে পড়ল।

মনে মনে ভাবলাম, যাক বাবা, হতভাগাদের দলে আরো একজন বাড়ল।

দেখলাম, লোকটার কেমন গম্ভীর গম্ভীর মুখ। কোনো দিকেই নজর নেই। পুকুরের ধারে একটা জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল। তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সেই টোপ কপালে তিনবার ছুঁইয়ে পুকুরের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দিল। দিয়ে ফাতনার দিকে চোখ পেতে বসে রইল।

থাকো বসে। আমরাও পাত্তা দিলাম না। পাত্তা দেওয়ার কোনো কারণও ছিল না। কেন না, আমরা সারাদিন বসে বসে কি মাছ পেয়েছি তা জানি। বড়জোর চার ছ'ইঞ্চি সাইজের দুটো একটা চারাপোনা, দু'দশটা ট্যাংরা কি কই-টই। লোকটা দিনের শেষে এসে কত আর ধরবে!

তবু কেন জানি লোকটার দিকে মাঝে মাঝে তাকাচ্ছিলাম। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে ফতুয়ার মতো একটা জামা। দেখি, মাঝে মাঝে ফতুয়ার পকেট থেকে কী যেন বার করে মুখে পুরছে।

মনোজের দিকে তাকালাম, কি খাচ্ছে রে?

কে জানে, ছেড়ে দে না। ও সব আলতু-ফালতু লোকের দিকে না তাকিয়ে নিজের ফাতনার দিকে নজর রাখ।

লোকটা বোধহয় ডালমুট কিংবা বাদাম ভাজা-টাজা খাচ্ছে, খুব চালু। আমি আবার আমার ফাতনার দিকে নজর দিলাম।

আরো মিনিট কয়েক কেটে গেল। হঠাৎ চমকে উঠলাম। দেখি, লোকটা মাছ বাঁধিয়েছে টোপে। ছিপে টান মেরে উঠে দাঁড়িয়েছে। সুতো তখনো জলের নিচে। বোধহয় একটা বড় মাছই আটকেছে। ছোট মাছ হলে ছিপের টানে মাছটা উঠে আসত। বড় মাছ বলেই তা সম্ভব হল না। সুতোটা জলের ওপর এখন এপাশ-ওপাশ দৌড়চ্ছে, হুইল থেকে সুতো ছাড়তে শুরু করেছে লোকটা। ছোট ছিপটা ধনুকের মতো বাঁকা হয়ে উঠেছে।

আশ্চর্য কপাল লোকটার। দশ মিনিট বসতে না বসতেই বড় মাছ বাঁধিয়ে ফেলল। হাঁ করে তাকিয়ে থাকি। জলের নিচে বঁড়শিতে আটকে যাওয়া মাছটার গায়ে যে বেশ জোর বোঝাই যাচ্ছে। এরকম অবস্থায় মাছটাকে তুলতে হলে বেশ কায়দা জানা দরকার। জলের নিচে খুব করে দৌড়তে দিতে হয় মাছকে। শেষ পর্যন্ত দৌড়তে দৌড়তে যখন ও ক্লান্ত হয়ে পড়বে তখন ওকে নেটের মধ্যে ফেলে ডাঙায় তুলে আনতে হবে। তা না করে সুতো ধরে বোকার মতো টানলে মাছটা সুতো ছিঁড়ে পালিয়ে যেতে পারে।

কিন্তু না, লোকটাও কম যায় না। মিনিট কয়েক লড়াই চালিয়ে শেষ পর্যন্ত মাছটাকে ডাঙায় তুলে ফেলল। আই বাপ এ যে দু'কেজির কম নয় রে! কি কপাল মাইরি। এসে মিনিট পাঁচেক বসেই অত বড় একটা মাছ ধরে ফেলল, আর আমরা সারাদিন বসে সামান্য এই কটা ছোট মাছ পেলাম।

মনোজের দিকে তাকালাম। কী কান্ড দেখলি?

মনোজ আর কী উত্তর দেবে! বোকার মতো হাসে।

একেই বলে লাক!

লোকটা ততক্ষণে তার ছিপ গুটিয়ে নিয়েছে। মাছটার মুখের মধ্যে দড়ি ঢুকিয়ে ভাল করে বেঁধে নিল। তারপর সেই বিরাট মাছটাকে হাতে ঝুলিয়ে গম্ভীর মুখে পুকুর ছেড়ে হনহন করে চলে গেল।

ওদিকে সূর্যটা তখন ডুবিডুবি। আমাদের ওঠার সময় হয়ে এসেছিল।

কী রে মনোজ, সন্ধ্যা তো হয়ে এল, চল বাড়ি ফিরি এবার।

দেখলাম, বেশ খানিকটা দূরে পরাশরবাবুও তাঁর ছিপ গুটোতে শুরু করেছেন। সবারই কেমন গম্ভীর মুখ। হুট করে অজানা একটা লোক এসে অত বড় একটা মাছ ধরে নিয়ে গেল, আর ওরা সারাদিন বসেও তেমন কিছু জোটাতে পারল না, মুখ গম্ভীর হওয়ারই কথা।

মনোজ বলল, চল। আমাদের কপালে নেই, হবে না। লোকটা কিন্তু জব্বর মাছটা ধরে নিয়ে গেল রে।

কী আর বলব। ছিপ গুটিয়ে ফেললাম। আগামী শনি আর রবি পরপর

দু'দিন ছুটি আছে, ঠিক হল শনিবার আবার এসে বসব এখানে। বড় মাছ এবার ধরতেই হবে। এর মধ্যে কলকাতার নিউ মার্কেট থেকে বেশ খানিকটা চার কিনে এনে রাখব। দেখি মাছ সেই চারের গন্ধে এগোয় কিনা।

মনোজ আর আমি কাছাকাছিই থাকি। বাড়িমুখো হাঁটা দিলাম।

যথাবিহিত পরের শনিবার আবার পুকুরের জলে চার-ফার ফেলে ছিপ নিয়ে বসলাম। হে ভগবান, আজ আর বিমুখ করো না গো, জব্বর একটা মাছ দিও। ছোট ছোট মাছ ধরে কারো কাছে আর মুখ দেখাতে পারি না ভগবান।

মনোজ বলল, আজ যা চার ঢালা হয়েছে তাতে বড় মাছ এদিকে না এসেই পারবে না।

বললাম, মাছেরাও আজকাল খুব চালাক হয়ে গেছে রে। ফাতনা থেকে সুতো ঝোলা দেখেই ওরা বুঝতে পারে।

দেখাই যাক কী হয়। দু'জনেতে আবার ফাতনার দিকে চোখ পেতে বসে রইলাম। বেশ কিছুক্ষণ কেটে গেল। হঠাৎ মনে হল, ফাতনাটা বুঝি একটু নড়ে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে ছিপ হাতে নিয়ে আমি তৈরি হই। বড় মাছ যদি হয়, ফাতনাটাকে এক্ষুনি টুক করে জলের নিচে তলিয়ে নিয়ে যাবে। আর সঙ্গে সঙ্গে টান মেরে বুঝে নিতে হবে কেমন মাছ। যদি বড় মাছ হয়, হুইল থেকে সুতো ছাড়তে হবে। উত্তেজনায় আমি তাকিয়েই থাকি ফাতনার দিকে। কিন্তু না, আর কোনো সাড়াশব্দ নেই। তবে কি ফাতনাটা জলের ঢেউয়েই নড়েছিল, কেমন মন খারাপ হয়ে যেতে থাকে আবার।

হতাশ হয়ে বসে রইলাম।

ওদিকে পরাশরবাবু সটাক করে ছিপ টেনে একটা মাছ তুললেন। ছোট মাপের মৃগেল বোধহয়। তা হোক বউনি হল পরাশরবাবুর।

আমার এমনই কপাল, বউনি হল ঘন্টা দুয়েক পরে। একটা পাঁচ-ছ' শ' ওজনের শোল। ওদিকে মনোজ ততক্ষণে কয়েকটা শিঙি আর মাগুর মাছ ধরে ফেলেছে।

দুপুর গড়িয়ে বিকেল হতে শুরু করল। আরো দু'একটা করে ছোটখাট মাছ আমরা সবাই ধরে ফেলেছি। কিন্তু আজকের দিনেও বড় মাছের কোনো লক্ষণই নেই।

মনোজের দিকে তাকালাম, আজকের দিনটাও বৃথা গেল রে। ফালতু ফালতু পয়সা খরচ করে চার আনালাম।

মনোজ বলল, মাছ ধরা এবার থেকে ছেড়েই দেব ভাবছি। কপালে না থাকলে ওসব হয় না।

কি আর বলি, ঘড়িতে ততক্ষণে সাড়ে চারটে বেজে গেছে। আর বড়জোর ঘন্টা খানেক কি ঘন্টা দেড়েক বসা যাবে। আবার টোপ ফেলে ফাতনার দিকে তাকাই।

হঠাৎ এ সময় চমকে উঠলাম, এই মনোজ, সেই লোকটা রে। সেই যে সেদিন অত বড় মাছটা ধরে নিয়ে গেল।

হ্যাঁ, সেই লোকটাই। পরনে মালকোঁচা মারা ধুতি, গায়ে ফতুয়া। চোখ মুখ কেমন গম্ভীর গম্ভীর।

লোকটা কারো দিকে তাকাল না। ধীরে ধীরে পুকুরের ধারে গিয়ে বসে পড়ল। তারপর বঁড়শিতে টোপ গেঁথে পুকুরের জলে ছুঁড়ে ফেলল।

দেখে মনে হয়, বেশ বেরসিক। যেন একটু আলাপ-সালাপ করতে গেলে দাঁত খিঁচিয়ে উঠবে। লোকটাকে আমি খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ করতে থাকি।

ঠিক সেদিনকার মতোই ফতুয়ার পকেট থেকে ডালমুট কিংবা বাদাম ভাজা বার করে টুকটুক করে খেতে শুরু করেছে।

মনোজ বলল, দেখা যাক, আজ বেটা কী মাছ ধরে! বুঝলি বার বার ঘুঘু ধান খেতে পারে না।

কথাটা তখনো শেষ হয়নি মনোজের, লোকটা ছিপ হাতে নিয়ে টান মেরেই উঠে দাঁড়িয়েছে। নির্ঘাৎ বড় মাছ। হুইল ঘোরাতে শুরু করেছে। আশ্চর্য ব্যাপার, লোকটা কি মন্ত্রতন্ত্র জানে নাকি!

মিনিট দশেক মাছটা জলের নিচে ছুটোছুটি করে শেষটায় লোকটার হাতে ধরা দিল। আই বাপ, এ যে বিশাল মাছ। আড়াই তিন কেজির কম হবে না। এ রকম দুটো মাছ হলেই একটা বিয়েবাড়ির কাজ চলে যায়।

কী দারুণ কপাল দেখেছিস? চল না লোকটার সঙ্গে একটু আলাপ করি।

মনোজ বলল, কী আলাপ করবি?

না মানে, লোকটা বসতে না বসতেই অত বড় মাছ পেয়ে যাচ্ছে। ওর কাছ থেকে কৌশলটা জেনে নেওয়া যায়।

ঠিক আছে চল। ছিপ গুটিয়ে নিয়ে আমি আর মনোজ লোকটার কাছে এগিয়ে এলাম।

লোকটা সেই আগের দিনের মতোই মাছের মুখে দড়ি ভরে নিয়ে শক্ত করে একটা গিঁঠ দিয়ে হাতে ঝুলিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। সে কিন্তু মনোজদের দিকে তাকাবার প্রয়োজন মনে করে না। গম্ভীর মুখেই হাঁটতে শুরু করে।

মনোজই ডাকল, দাদা শুনছেন?

লোকটা ঘাড় ঘুরিয়ে একবার তাকাল। ব্যস। ওইটুকুই। তারপর আবার হাঁটতে শুরু করল।

আচ্ছা বেরসিক তো। ও দাদা, আমাদের সঙ্গে একটু কথা বললে কি দোষ হবে?

লোকটা আবার দাঁড়াল, গম্ভীর মুখ। আমার সময় নেই, সন্ধের আগেই আমাকে মাছটা পৌঁছে দিতে হবে।

কোথায় পৌঁছে দেবেন?

কেন হে ছোকরা? তোমাদের কি দরকার?

না মানে, রাগ করবেন না। আমারও আপনার মতোই এ পুকুরে মাছ ধরতে আসি, কিন্তু আজ পর্যন্ত এত বড় মাছ কোনোদিন ধরতে পারিনি।

লোকটা হি হি করে হাসল কেবল।

মাথায় ছিটটিট নেই তো! মনোজ বলল, আপনার বাড়ি কোথায়? কোথায় থাকেন?

যেখানেই থাকি না, তোমাদের কি?

আমাদের কিছু না। আসলে মাছ ধরার কৌশলটা একটু যদি শিখিয়ে দিতেন।

মাছ ধরবে? ধর না, শেখাবার কি আছে। বঁড়শিতে টোপ গাঁথবে, জলে ফেলে ফাতনার দিকে তাকিয়ে থাকবে, আবার কি!

তাই তো করি। কিন্তু কেবল ছোট ছোট মাছ ওঠে, বড় মাছ কোনোদিন পেলাম না।

বড় মাছ ধরবে?

আপনি যদি একটু দয়া করে শিখিয়ে দেন।

শিখবে। কিন্তু এখন তো আমার হাতে সময় নেই। সন্ধের মধ্যেই আমাকে মাছ পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে। ঠিক আছে তোমরা আমার সঙ্গে এস, হাঁটতে হাঁটতে যতটুকু পারি বলে দেই।

উৎসাহে লোকটার সঙ্গে হাঁটা শুরু করি আমি আর মনোজ।

লোকটা বাঁ দিকে ঘুরে জঙ্গলের দিকে এগোতে শুরু করল। এ জঙ্গলে সাপ শেয়াল কত কিছু থাকতে পারে। আমি মনোজের দিকে তাকাই।

মনোজ চোখের ইশারা করে, চল না। ভয় কি!

লোকটা একবার দু'বার আকাশের দিকে তাকায়, সন্ধে হতে আর কত দেরি হে?

মনোজ বলল, আমার ঘড়িতে এখন ছটা।

ছ'টা মানে, আজ সূর্যাস্ত হওয়ার কথা ছ'টা বারোতে, তাই না? তার মানে এখনো সন্ধে হতে আরো বারো মিনিট বাকি আছে। একটু তাড়াতাড়ি চল।

বললাম, এই জঙ্গলের ভিতর দিয়ে আপনি আমাদের কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন?

ফের কথা বলে! বড় মাছ কী করে ধরে যদি জানতে চাও, বকবক করো না। চল।

আমরা আবার চুপ করে লোকটার পিছন পিছন হাঁটতে থাকি। লোকটার হাতে ঝোলানো সেই বিশাল মাছটা। আর এক হাতে ছিপ আর হুইল। দেখাই যাক না, কোথায় নিয়ে যায় আমাদের।

জঙ্গল আরো ঘন হয়ে আসে। অন্ধকারটাও যেন জড়িয়ে ধরতে থাকে। দুটো একটা জোনাকিও চোখে পড়ে আমাদের।

অন্ধকার গাছগুলোকে ঠিক মতো চেনা যাচ্ছে না, কী গাছ ওগুলো!

লোকটাই বলল, গাব গাছ! গাব গাছ চেন?

গাব গাছ সচরাচর চোখে পড়ে না। আমরা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে লক্ষ্য করি। হঠাৎ মনোজ আমাকে ইশারা করে, ওই দেখ গাছের ডাল থেকে কত মোটা একটা দড়ি ঝুলছে।

হ্যাঁ, এই দড়িটার নিচে গিয়ে আমি এখন দাঁড়াব। আর তা হলেই তোমরা বুঝতে পারবে কি করে আমি বড় মাছ ধরি।

কেমন যেন রহস্যময় লাগে লোকটার কথা। আমি আর মনোজ মুখ চাওয়া-চাওয়ি করি।

লোকটা ধীরে ধীরে এগিয়ে গিয়ে দড়ি-ঝোলা গাছটার নিচে দাঁড়াল। আর ঠিক এই সময়ই আমাদের নজরে আসে লোকটার দুটো হাতই ফাঁকা, মাছটাও নেই, ছিপটাও নেই।

মনোজ চেঁচিয়ে উঠল, আপনার মাছ?

লোকটা হি হি করে একটু হাসল, যার মাছ সে নিয়ে গেছে। বললাম না, সন্ধে হলেই যার মাছ তাকে পৌঁছে দিতে হবে। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখ, ছ'টা বারো কখন হয়ে গেছে।

কী ব্যাপার বল তো!

মনোজ ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল, ছটা বত্রিশ।

তারপর আরো আশ্চর্য ঘটনা ঘটল। গাছের দিকে তাকিয়ে শিউরে উঠি, লোকটাও নেই দড়িটাও নেই।

সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল আমাদের। মনোজ চিৎকার করে উঠল, ভূত ভূত।

তারপর দু'জনে মিলে দে ছুট। ছুটতে ছুটতে জঙ্গল থেকে যখন বেরুলাম তখন বেশ রাত। কিন্তু ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমাদের।

পরদিন ফের মনোজের সঙ্গে দেখা। মনোজ বলল, আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, জঙ্গলের ভিতর ওই গাব গাছে দড়ি ঝুলিয়ে একটা লোক ফাঁসি দিয়ে মরেছিল কয়েক বছর আগে। কাল বড্ড বেঁচে গেছি আমরা।

এর পরও আমরা অনেক দিন ওই পুকুরেই মাছ ধরতে গেছি, কিন্তু মেছোভূতটাকে আর কোনোদিন আমরা চোখে দেখিনি। ❑

ফাঁকি/ অজয় দাশগুপ্ত



দিনটা ছিল শনিবারের বিকেল।

অমল অফিস থেকে ফিরে বারন্দায় বসে রাস্তার দিকে তাকিয়েছিল। তখনো সন্ধ্যা হয়নি। আকাশে ধূসর স্থির একখণ্ড মেঘকে যেন স্পর্শ করে কটা পাখি চলে গেল। অমলের মনে হল, সময় এমন করেই চলে যায়। এমনি হঠাৎ, চকিতে।

দেখতে দেখতে চাকরি জীবনের দশ বছর কেটে গেল অমলের। যৌবনটা গত প্রায়। ঠিক এমন ক্ষণেই ব্যাপারটা ঘটল। অমলের বিয়ে ঠিক হয়ে গেল।

অমল কিছুতেই রাজি হয়নি প্রথমে। বিবাহে তার এই অনীহা অবশ্য অর্থনৈতিক অস্বাচ্ছন্দ্যর জন্যে নয়। যাইহোক এটা এক ধরনের এক আলসেমি। জীবন গতানুগতিক চলে যাচ্ছে। না খেতে পেলে যেমন পেট মরে যায় তেমনি জৈবিক ক্ষুধাও অমলের মৃতপ্রায় হয়ে এসেছিল। তাই সে ভেবে নিয়েছিল, অফিস আড্ডা নিয়ে বেশ তো আছি— আবার বিয়ে কেন।

কিন্তু অমলের মা শুনলেন না। তিনি কেঁদেকেটে অমলকে রাজি করালেন। মেয়ে দেখার পালা চলল। এই ব্যাপারে বউদিদের উৎসাহের প্রাবল্য প্রচণ্ড। তারা একেকটি মেয়ে দেখেন, তার ছবি অমলের সামনে হাজির করে খিলখিল করে হাসেন, অমল মতামত জানানোর আগে নিজেরাই তা নাকচ করে আবার নতুন কোনো মেয়ের সন্ধানে লেগে পড়েন।

অমলের কাছে এটা খুবই বিরক্তিকব। তবু এই বিরক্তি তাকে হজম করতে হচ্ছিল নির্বাক হয়ে। অমল এমনও ভেবেছিল, এইভাবে মেয়ে দেখতে দেখতে দিন ফুরিয়ে যাবে— বিয়ে আর শেষ পর্যন্ত ঘটবে না।

যা ভাবা যায় তা শেষ পর্যন্ত হয় না। অমলের নৈরাশ্যপীড়িত এই চিন্তাও তাই ফলবতী হল না। পছন্দর মেয়ে পাওয়া গেল বর্ধমানে। বউদিরা সকলে একমত— এবার অমলকে মেয়ে দেখতে বলা হল। বড় বউদি বললেন, 'ঠাকুরপো, তুমি নিজে একবাব দেখ এস, তারপর কথাবার্তা পাকাপাকি হবে।'

'না না, তাব কি দবকার' অমল বলে উঠেছিল, 'তোমবা সবাই দেখেছ, যথেষ্ট; একজন মেয়েমানুষকে বাব বাব উল্টে পাল্টে দেখবাব কি আছে; আমার ওসব পোষাবে না।'

'না ভাই ঠাকুরপো, যাকে বলে জীবনসঙ্গিনী –' মেজবউদি বলে উঠলেন, 'নিজে যাচাই কবে নেওয়া ভাল, আব আজকাল তো সব ছেলেই মেয়ে দেখে।'

'কি কবে যাচাই করবে মেজদি?' ছোটবউদি মুখ টিপে হাসলেন। 'বিয়ের আগে সবরকম যাচাই-এব বেওযাজ তো এখনো এদেশে চালু হযনি।'

'তুই থাম ছোট্—' বড বউদি ধমক দিলেন। তাবপব অমলের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'একবাব যাও না বাপু বন্ধুবান্ধব সঙ্গে কবে. চোখেব দেখাটা দেখে এস।'

'কি লাভ তাতে?' অমল তিন বউদিব দিকে তাকায। 'চেহাবা তো ছবিতে দেখেছি।'

'ছবি আব বক্তমাংসব চেহাবা এক নয ঠাকুবপো—' বড বউদি বলে উঠলেন, 'ছবি ছবিই, তাতে সব বোঝা যায না।'

'তোমবা তো বুঝেছ?' অমল বলল।

'সেইজন্যেই তোমাকে বলছি।' মেজবউদি উত্তব দিলেন।

'আমাকে বলে লাভ নেই'... অমল মাথা ঝাঁকাল, 'ওসব মেয়ে দেখা-টেখা আমাকে দিয়ে হবে না। তোমাদেব মতামতই আমার মত।'

'তাহলে এই তোমাব শেষ কথা?'

'হ্যাঁ।'

'তবে আমরা এগোতে পারি?' বডবউদি অমলেব স্বীকৃতি চাইলেন।

'যা খুশি।' অমল মাথা নামিযে নিল।

'ঠিক আছে।' বউদিরা চলে গেলেন।

কথাবার্তা ঠিক হয়ে গেল। অমলের বিয়ের তারিখ পর্যন্ত। আজ শনিবার, আগামী বুধবার বিয়ে। মাঝখানে তিনটি মাত্র দিন। অমল বিয়ের আগে আজই শেষ অফিস করল। পনের দিনেব ছুটি নিয়েছে।

আজকের সন্ধেটা তাই হালকা লাগছে অমলেব। ফাঁকা বাড়িতে একা

অমল। বউদিরা সকলে আসন্ন উৎসবের কেনাকাটা করতে গিয়েছেন। তাদের সঙ্গে রয়েছেন সেজদা। বড়দা ও মেজদার ফিরতে রাত হবে। মা গিয়েছেন পাড়ার কীর্তনের আসরে। একা অমল একবার রাস্তা একবার আকাশ দেখছে আর ভাবছে ভবিষ্যৎ। তার জীবনের নিঃসঙ্গতার বৃত্তে কেউ ঢিল ছুঁড়েছে। চিন্তার তরঙ্গের নতুন বৃত্ত রচনা করে চলেছে।

সন্ধে নেমে এল। রাস্তার বাতি অমলের চোখের সামনে জ্বলে উঠল।

বারান্দার পর সামান্য ফাঁকা জায়গা। একটা গন্ধরাজের গাছ রয়েছে। তারপর গেট। বারান্দার আলো ইচ্ছে করে জ্বালেনি। অন্ধকারটা ভাল লাগছে। রাস্তার আলো গেট পর্যন্ত এসে ম্লান হয়ে গেছে। গন্ধরাজ গাছটাকে অদ্ভুত ঝাঁকড়া লাগছে।

অমল এই পরিবেশে স্থিত হয়েছিল। তার দৃষ্টি পড়ল দরজার দিকে।

অমল চমকে উঠল।

একজন যুবতী তাদের দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়ে বাড়ির নম্বর দেখছে। তারপরই গেট খুলে মেয়েটি এগিয়ে আসতে লাগল। অমল উঠে দাঁড়াল চোখে অবাক দৃষ্টি নিয়ে। মেয়েটি গন্ধরাজ গাছ পর্যন্ত এগিয়ে এসে দাঁড়াল। অমল আর তার মধ্যে তখনো বেশ খানিকটা ব্যবধান। সে হাত তুলে নমস্কার করল। অমল তাকে চিনতে পারল না। প্রতি-নমস্কার জানাল।

'এটা কি অশোক রায়র বাড়ি?' মেয়েটি প্রশ্ন করল।

'হ্যাঁ—' অমল উত্তর দিল, 'আপনি কোত্থেকে আসছেন?'

'বর্ধমান থেকে।'

বর্ধমান থেকে কথাটা শুনেই অমল মেয়েটিকে চিনতে পারল। তার মনে পড়ল, এই মেয়েটির সঙ্গেই তো আমার বিয়ে হবার কথা। কী আশ্চর্য, বিয়ের কনে বিয়ের আগে ছেলের বাড়িতে না বলে না কয়ে এভাবে চলে এল, কি ব্যাপার!

অমল তোতলা হয়ে গেল। তার কিরকম অস্বাভাবিক লাগছে। মেয়েটির মাথার ঠিক আছে তো! অমল আর কোনো কথা বলে উঠতে পারল না। একটা তোতলামি তাকে পেয়ে বসল।

'আমার নাম ব্রততী।' কিন্তু মেয়েটি সহজভাবে বলল। 'অমলবাবু বাড়িতে আছেন,— তাঁর সঙ্গেই আমার একটু দরকার ছিল, অনেকদূর থেকে এসেছি।'

'আমার সঙ্গে দরকার?'

'আপনিই অমলবাবু?' ব্রততী এগিয়ে এল।

'হ্যাঁ, কি ব্যাপার বলুন তো?' অমলের হাড়ে কাঁপুনি ধরল। এমন অভাবনীয় নাটকের কথা সে ভাবতেও পারল না। আজ বাদে কাল যার বিয়ে, সেই বিয়ের মেয়ে ভাবী স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে এসেছে কি কারণে?

'বসতে পারি?' হেসে ব্রততী প্রশ্ন করল। সে বারন্দায় উঠে এসেছে।

অমল নিজের ভুল বুঝতে পারল। একটা আকস্মিকতায় সে ভদ্রতাটুকু ভুলে গেছে। তাড়াতাড়ি নিজেকে গুছিয়ে বলল, 'হ্যাঁ-হ্যাঁ বসুন।'

বারন্দার অন্য একটি খালি চেয়ারে ব্রততী বসল। তার যে খুব একটা তাড়াহুড়ো আছে দেখে মনে হয় না। চেয়ারের একপাশে ব্যাগটা ঝুলিয়ে রেখে বলল, 'আমাকে তুমি করেই বলতে পারেন অনায়াসে। দুদিন বাদে তো তাই বলতেন।'

অমলও বসে পড়ল।

সে ব্যাপারটা গুছিয়ে উঠতে পারল না। এমন সমস্যায় অমল এর আগে জীবনে পড়েনি। একি অসহায় অবস্থা। অমলের পালাতে ইচ্ছে করছিল। ব্যাঙের মতো সে যেন সাপের মুখে ধরা পড়ে গেছে।

'খুব বিব্রত করলাম বোধ হয়।' ব্রততী বলে উঠল। 'জানতাম বিব্রত হওয়াটাই স্বাভাবিক। তবু না এসে পারলাম না।'

'না না বিব্রত করবার কি আছে।' যদিও অমল ঘেমে উঠেছে। 'কি ব্যাপার বলুন— ও হ্যাঁ বলো— মানে তুমি বলাই তো ঠিক হবে?'

ব্রততী খিলখিল করে হেসে উঠল। তার হাসিতে কোনো সঙ্কোচ নেই। সে বলল, 'আপনি কিন্তু ঘাবড়ে গেছেন— আর আমি যে খুব বেহায়া মেয়ে তাই ভাবছেন।'

'সে রকম ভাবছি না, হ্যাঁ কি যেন বলবে বলছিলে?' অমল কোনোরকমে কথাগুলো বলে ফেলল।

'আপনার সঙ্গে আমার বিয়ে হবার কথা ছিল'— ব্রততী শুরু করল।

অমল এবার যেন বুঝতে পারল মেয়েটি কি বলতে এসেছে। যাতে আমি না বিয়ে করি—

'সে বিয়ে আর হবে না—' ব্রততী কাটা কাটা বলে যাচ্ছে।

অমলের এবার রাগ হল। মনে হল মেয়েটা অতি বাজে। যদি তোমার কিছু ইয়ে-টিয়ে থেকেই থাকে তো আগে জানালে না কেন? লজ্জা? সেই লজ্জার অবরোধ ভেঙে আজ শেষ মুহূর্তে তো ঠিক এসেছ—

'এর জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।' ব্রততী দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করল।

না, এসব মেয়েকে ছেড়ে দেওয়া যায় না। এখন সমস্ত ব্যবস্থার পর উপহাসের পাত্র হব। অসম্ভব! আজকাল ওরকম প্রেম সব মেয়েরই থাকে। বিয়ের জল পড়লে প্রেম পচে যায়। এর বেলায়ও তাই হবে।

'আপনি কি এই বলতে এসেছেন?' অমল নিজেকে স্থির করল। সে আপনি সম্বোধনেই ফিরে গেল। তীক্ষ্ণ চোখে ব্রততীর দিকে তাকাল। 'বিয়ে হবে না কেন?'

'কথাটুকু বলাই আমার উদ্দেশ্য নয়—' ব্রততী বলতে লাগল। 'যা হবার তা হতই— এ কথা বলবার দরকার ছিল না। বুঝলেন অমলবাবু, আমি বড় দুঃখী মেয়ে— যাকে দুঃখ দিতে চলেছিলাম তাকে একবার চোখে দেখবার বড়ই বাসনা ছিল, তাই দেখে গেলাম।'

'আমার নিদারুণ সৌভাগ্য দেখছি'— অমল বিদ্রূপ করল।

'সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য তা জানি না—' ব্রততী বলে উঠল, 'তবে আমি তৃপ্ত হলাম।' হঠাৎ সে উঠে দাঁড়াল। তারপরই বলল, 'চলি, বিরক্ত করবার জন্য দুঃখিত।' সে যাবার জন্য পা বাড়াল।

অমলের ভীষণ রাগ হল। ইচ্ছে করল টেনে একটা চড় মারে— অমল ক্রোধ দমন করল। কড়া কণ্ঠে বলল, 'শুনুন—'

ব্রততী কিন্তু এই হুঙ্কার শুনল না। সে যেমন চলে যাচ্ছিল, তেমনি এগিয়ে গেল। যেন অমলের চিৎকার শুনতে পায়নি। অমলের রাগ প্রচণ্ডতর হল। সে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে দুহাত বাড়িয়ে পেছন থেকে ব্রততীকে জড়িয়ে ধরতে গেল।

আলো যেমন অক্লেশে পিছলে যায়— ব্রততী পিছলে গেল। বিহ্বল অমল একরাশ শূন্যতা জড়িয়ে ধরে দেখল তার ধারে-কাছে কোনো মানুষ নেই।

বিহ্বলতা থেকে অকস্মাৎ লাফ দিয়ে অমানুষিক একটা ভয় অমলকে ঘুসি মারল। দু-চারবার গোঁ-গোঁ করে অমল মাথা ঘুরে জ্ঞান হারাল।

জ্ঞান ফিরতে সবাই কি হয়েছে জিজ্ঞেস করল। যা ঘটেছে, অমল তা বলতে পারল না। সে ভাবল ব্যাপারটা সম্পূর্ণই তার মনগড়া— বললে সবাই ঠাট্টা করবে। যদিও অমলের সন্দেহ রয়ে গেল সত্যিই ওটা মনগড়া ব্যাপার না অন্যকিছু। আমতা-আমতা করে অমল বলল, 'হঠাৎ মাথাটা ঘুরে গিয়েছিল কেন বুঝতে পারিনি।'

সে রাত কাটল। পরদিন দুপুরে অমল স্পষ্ট বুঝল, কাল সন্ধেয় যা ঘটেছে তার চেয়ে বড় বাস্তব আর কিছুই নেই। কিন্তু এমন বাস্তব ব্যাপার যে আজও ঘটে সেটা ভেবে সে শিউরে উঠল। একটা বেদনায় অসহ্য কান্নায় তার বুকের ভেতরটা দুমড়ে মুচড়ে গেল।

বেলা দুটো নাগাদ বড়দার নামে একটা টেলিগ্রাম এল। কি মর্মান্তিক ঘটনা!

টেলিগ্রামে লেখা ছিল, 'বিয়ের ব্যবস্থা বন্ধ রাখুন— কাল সন্ধে সাতটায় ব্রততী মারা গেছে। পরে খবর জানাচ্ছি।'

টেলিগ্রামটা কাঁপা হাতে নিয়ে অমল সাদা হয়ে গেল। বিবর্ণ! তখন

রাত ছিল বড়জোব সাতটা থেকে সাড়ে সাতটা। ব্রততীর কণ্ঠ, 'সে বিয়ে আর হবে না।'

সারাটা দিন অমল গোপনে কাঁদল। ব্রততীর ছবি, ব্রততীর কণ্ঠ তার সঙ্গী হয়ে রইল। মন থেকে একটা চিন্তা কিছুতেই ও তাড়াতে পারল না-- ব্রততী কি তার জন্যই মরল। সেই কি তবে হত্যাকারী!

চিঠি এল মঙ্গলবার। ব্রততীর মৃত্যুর সমস্ত বিবরণ বুকে করে। অমল সেই চিঠি পড়ে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তার বুক হালকা হল এটুকু জেনে— ব্রততী আত্মহত্যা করেনি, সে তার আততায়ী নয়।

শুক্রবার রাত থেকে ব্রততীর কলেরা হয়েছিল। এশিয়াটিক কলেরা। শনিবার হাসপাতালে প্রচণ্ড চেষ্টার পরও ব্রততী হেরে যায়। সে বাঁচল না। অমলের জন্য বেঁচে উঠল না। অমল এখন স্পষ্ট বুঝতে পারল— ব্রততী তাকে স্বামীত্বে বরণ করে নিয়েছিল মনে মনে; আর তাই জীবন-যুদ্ধে হেবে গিয়ে সে অমলকে দেখতে এসেছিল একবার চোখেব দেখা — কথাটা যতই অবিশ্বাস্য হোক অমল একান্তে এইটুকু বুঝতে পারল। অমল এই বোধকে ব্রততী ভেবে আঁকড়ে ধরল। ❑



কাজের লোক / আনন্দ বাগচী



স্কুল ফাইনাল পরীক্ষার পর জয়দীপ বলল, “শোভন, চল, বেলুনদাদার ওখানে কয়েকদিন কাটিয়ে আসি। ফাস্টোকেলাস জায়গা। বাগান আছে, পুকুর আছে, বাষ্পীয় শকট আছে। শহরকে শহর, গ্রামকে গ্রাম, ডবল মজা।”

আমি ওর কথার ভঙ্গিতে হেসে ফেলে বললাম, “বাষ্পীয় শকট, সেটা আবার কী বস্তু, মোটরগাড়ি?”

“ইয়েস সার! আমরা বলি মর্কট গাড়ি। নাইনটিন্‌থ সেঞ্চুরির এক অদ্ভুতুড়ে প্রাণী বলেই মনে হবে। যেমন বর্ণ, তেমনই বাহার। নাগরা জুতোর মতো শুঁড় তোলা, হুড খোলা চেহারা। জগঝম্প ব্যান্ডপার্টির সাড়ে তিন প্যাঁচের বিউগিল-পানা হর্ন, যখন ভেঁপু দেয় গাধার ডাক ছাড়ে। তার দরকার হয় না, রাস্তায় বেরোলে এমনিতেই কুকুরের দঙ্গল তাড়া করে।”

“বুঝেছি!” আমি হাসতে-হাসতেই বলি, “ডাকসাইটে ব্যাপার! কিন্তু হঠাৎ বেলুনদাদার কথা মনে পড়ল যে তোর? কিছু ব্যাপার আছে, তাই না?”

হাতের ভাঁজকরা বাংলা খবরের কাগজখানা খুলে একটা বিজ্ঞাপন দেখাল জয়দীপ। বিজ্ঞাপনটা দেখে আমি থ। যাবজ্জীবনের জন্য নির্বাক কাজের লোক আবশ্যক। দ্রুত, কর্মঠ, নির্ঝঞ্ঝাট। বেতন যোগ্যতা অনুযায়ী। তলায় ওর বেলুনদাদার পুরো নাম-ঠিকানা।

আমি ভুরু কুঁচকে ওর দিকে তাকালাম, “ব্যাপারটা কি? বেশ রহস্যের গন্ধ আছে যেন!”

"গড নোজ।" জয়দীপ যাত্রার ঢঙে ওপরের দিকে হাত দেখাল। তারপর বলল, "আজ ক'দিন ধরে বিজ্ঞাপনটা নাগাড়ে বেরোচ্ছে। অবশ্য বেলুনদাদা মানেই, বঙ্গরহস্য। চল, দেখেই আসি, বুড়োর মাথায় আবার কী খামখেয়াল চাপল।"

জয়দীপের গ্রেট গ্র্যান্ডফাদার, সাধু-বাংলায় যাকে বলে প্রপিতামহ, মানুষটা মেজাজি এবং মজার। হাতে অঢেল পয়সা থাকলে যেমন হয়। জয়ের মুখেই শুনেছি, রায়বাহাদুর বিমানবিহারী মজুমদারকে লোকে নাকি আড়ালে একশো বাহাদুর বলে ডাকে। পাড়ার লোকের ধারণা ভদ্রলোকের বয়সের ট্রি-স্টোন, যাকে বলে গাছ-পাথর নেই। কথাটা অবশ্য ঠিক নয়, ওঁর বয়সের গাছ এবং পাথর দুইই আছে। বয়সের দৌলতে বটগাছের মতো ডালপালা ছড়িয়েছেন চারপাশে। অসংখ্য নাতি-নাতকুড়ে তাঁর বংশ, মানে পরিবার সিকিটাক কলকাতা শহর দখল করে বসেছে। এই গেল গাছের কথা, এবার পাথর। বটতলার শিবলিঙ্গ শিলার মতো তাঁর জীবনের গোড়ায়ও মাইল-স্টোনের কায়দায় ইয়ার-স্টোন আছে। তাঁর জন্মসালের স্মৃতিফলক। খবরের কাগজের ভাষায় যাকে বলে পাথুরে প্রমাণ। উনি বলেন জীবনের ভিত্তি-প্রস্তর। একদিন গপ্পো করতে করতে উনি নাকি বলেছিলেন, "তোদের মতো আমার তো বার্থ সার্টিফিকেট নেই, বয়স মাপা ম্যাট্রিকের সার্টিফিকেটও নেই, কিন্তু আমি জন্মেছিলুম কোন সালে জানিস? যে বছর কাইট সাহেব কলকাতায় এসে প্রথম বেলুনে উঠেছিলেন। ক্যালকাটা টু বারাসত এয়ার ফ্লাইট। সারা কলকাতা তোলপাড় করা সেই সনের সেই মাসের সেই দিনে! দ্যাট মিনস্, পঞ্চাশ সালের ৬ নভেম্বর। আঠারো শতক।"

"নিজের জন্মদিনের কথা তোমার মনে আছে! তুমি কি জাতিস্মর নাকি?" জয়দীপ অবাক হওয়ার ভান করে জানতে চেয়েছিল।

উনি খুকখুক করে হেসে বলেছিলেন, "দুর ব্যাটা, জাতিস্মর-ফর কিছু না, আসলে খেরোর খাতা, জমাখরচের প্রাইভেট খাতা, বলতে পারিস ঘরকা দলিল। আমার বাবা..."

জয়দীপ মজা করে কথার মাঝখানেই দু'চোখ ছানাবড়া পাকিয়ে আঁতকে উঠেছিল, "আরিব্বাস! তোমারও বাবা ছিল তা হলে? তুমিই তো আমার বাবার বাবা তস্য বাবা, দি গ্রেটেস্ট গ্র্যান্ড ফাদার। উরিঃ ফাদার, সেই তোমারও..."

জয়দীপের মাথায় স্নেহসূচক একটা গাঁট্টা কষিয়ে ওর বেলুনদাদা বললেন, "ওরে ব্যাটা, পেকে ঝুনো হয়ে গেছিস দেখছি! সবটা শোন আগে। আমার বাবা ছিলেন কবি মুনিষ্যি। তিনি খেরোর খাতায় হিসেবপত্তরের জঞ্জালের মধ্যে চার লাইন স্বরচিত পোয়েট্রি রেখে দিয়েছেন। সে খাতা এখনও আমার সিন্দুকে রাখা আছে রেকর্ড হিসেবে। কাইটের বেলুন-ভ্রমণ নিয়ে কবি ঈশ্বর গুপ্ত যে বিখ্যাত সংবাদ কবিতা লিখেছিলেন সেটা তখনকার মানুষের মুখে-মুখে ফিরত।

সেই কবিতার প্রথম চার লাইনের সঙ্গে বাবা নিজের চার লাইন জুড়ে লিখলেন—

"এ আবার কোথা হতে আইল 'কাইট'?
বিনাসূত্রে উড়িয়াছে কেমন 'কাইট'
পাখা নাই শূন্যে এসে কেবল 'ফাইট'
নাহি বলে, বলে চলে কলের 'কাইট'।
আঠারোশো পঞ্চাশের ৬ নভেম্বরে
শঙ্খধ্বনি ওঠে রাত্রি প্রথম প্রহরে।
মমালয়ে অবতীর্ণ মানব 'বিমান'
ওরফে 'বেলুন' নামে প্রথম সন্তান।"

মনে-মনে হিসেব কষে জয়দীপ তাজ্জব হয়ে বলল, "দ্যাট মিনস্, আজ থেকে চার বছর আগেই তুমি সেঞ্চুরি করেছ। এটা উনিশশো চুয়ান্ন। গুড, গুড! এ যে রূপকথার গপ্পো!"

রূপকথা না হলেও আশ্চর্যকথা, তাতে সন্দেহ নেই। এগারোটি পুত্র ও তিন কন্যার মধ্যে বিমানবিহারীই ছিলেন তাঁর বাবার প্রথম সন্তান। জন্মেছিলেন ওল্ড বালিগঞ্জের এই থুখুড়ে পৈতৃক বাড়িতে, যার বয়স প্রায় দেড়শো বছর কোন্ না হবে। ভাইবোনদের সকলেই দীর্ঘজীবী হলেও কেউ আর এতদিন বেঁচে নেই, আশির কোঠায় রান করেই বোল্ড আউট হয়ে গেছে একের-পর-এক। কিন্তু সেঞ্চুরি হাঁকিয়েও বেলুনদাদা একশো চার বছর বয়সেও স্টিল গোয়িং স্ট্রং। হুইল চেয়ারে বসেননি, লাঠি ধরেননি, নিজের পায়ে খাড়া হয়ে দাপটে চলে-ফিরে বেড়াচ্ছেন। এত বয়সেও তাঁর হাঁটুর কব্জায়, মানে মালাইচাকিতে জং ধরেনি, দাঁত, কোমর কিস্যু পড়েনি, শিরদাঁড়া বাঁকেনি। সিজিন্ড সেগুনের মতো শক্ত বুড়ো, চাবুকের মতো মেজাজ, বন্দুকের নলের মতো ভয়ঙ্কর মুখ। ডাইনে-বাঁয়ে যখন-তখন ফায়ার করেন। ওঁর মুখের জ্বালায় ছেলেপুলে নাতিপুতিরা কেউ সঙ্গে থাকেন না, কাছেই বাড়ি বানিয়ে তাঁরা আছেন। দূর থেকেই নজর রাখেন, নিয়ম করে খাবারদাবার পাঠিয়ে দেন। কিন্তু এই শ'-পেরনো বুড়ো তাতে মচকাবার পাত্তর নন। একাই থাকেন কাজের লোকদের নিয়ে, বাদশাহি মেজাজে। একমাত্র এই জয়দীপের কাছেই তিনি অন্য মানুষ। ওর ওপর রাগেন না, বকেন না, ভীষণ ভালবাসেন। বন্ধুর মতো মেশেন। কিছুদিন না দেখলেই হাতচিঠি পাঠান।

আমি জয়দীপের দিকে তাকিয়ে বললাম, "কেন এবার তলব আসেনি? কোনও চিঠি, চিরকুট?"

জয়দীপ ঘাড় নেড়ে বলল, "না। সেটাই আরও স্ট্রেঞ্জ লাগছে। আমি যাচ্ছি, তুই যাবি তো বল।"

আমি মনে-মনে ভাবলাম, রেজাল্ট বেরনোর আগে তো এখন ধু-ধু

ছুটি। ঘুরে এলে মন্দ আর কী হয়। সে বুড়োর এত গল্প শুনেছি, তাকে একবার নিজের চোখে দেখে আসা-ই যাক। শতক-পেরনো মানুষকে দেখতে তো খবরের কাগজের রিপোর্টাররাও দৌড়োন। অত পরমায়ুওলা মানুষকে তো আমি কখনও চোখেই দেখিনি। ঠিক করলাম যাব। আমাকে দেখে যদি উলটোপালটা কিছু বলেন স্ট্রেট ফিরে চলে আসব! বাগবাজার থেকে বালিগঞ্জ এক ঘন্টার তো মামলা। এমন নয় যে, কোনও ভিন দেশে কি অন্য জগতে যাচ্ছি!

আমার ধারণা ভুল, গিয়ে দেখলাম অন্য জগৎই বটে! জায়গাটা যদি ওল্ড বালিগঞ্জ হয় তবে বাড়িটাকে বলতে হয় ওল্ডেস্ট ক্যালকাটার শেষ স্যাম্পেল। চারপাশের হালফ্যাশানের চোখ-ধাঁধানো বাড়িগুলোর মাঝখানে লালকুঠি যেন চোখ টিপে ধরে। মনে হয় শহরের সঙ্গে গ্রামদেশ যেন কানামাছি খেলছে। ফটকে এক তালপাতার সেপাই-মার্কা দরোয়ান টুলে বসে ঘুমোচ্ছিল, তাকে জাগানো গেল না। জয়দীপ বলল, "ও বদ্ধ কালা। কাতুকুতু না দিলে ও চোখ খুলবে না। চল, আমরা ভেতরে ঢুকি।"

লোহার গেট বেয়ে উঠে ওপারে নেমেই আমি থ হয়ে গেলাম। আম, কাঁঠাল, বেল, কতবেলের বাগানের ভেতর দিয়ে সত্যি-সত্যি একটা পুকুর দেখা যাচ্ছে, তার চারকোনায় চারটে তালগাছ। একপাশে বাঁশঝাড়। আমাদের পায়ের শব্দে দুটো বুনোপ্রাণী ছানাপোনা নিয়ে ঝোপের মধ্যে গা ঢাকা দিল। অ্যালসেশিয়ান ভেবে থমকে দাঁড়িয়ে পড়েছিলাম, জয়দীপ আমার হাত ধরে টানল, "ও কিছু নয়, শেয়াল। বেলুনদাদার পোষা।"

আমি অবাক, কলকাতা শহরে শেয়াল! বললাম, "রাতে বেলায় ডাকে?"

জয়দীপ আমার অজ্ঞতায় হাসল। বলল, "ডাকে। শুধু শেয়াল কেন, সন্ধেবেলায় পিলে-চমকানো হুতোম-প্যাঁচার ডাকও শুনতে পাবি।"

বন-বাগান-পুকুর পেরিয়ে লালকুঠি। লালচে রঙের পাথরের তৈরি একতলা অট্টালিকা। অট্টালিকা শব্দটাই প্রথম মাথায় এল, কারণ বাড়িটার একদিন বেশ ভারিক্কি চেহারার শ্রীছাঁদ ছিল, জলুস ছিল। এখন শুধু ভারটুকুই আছে। কর্ণের রথের মতো মাটির মধ্যে অনেকখানি বসে গেছে বাড়িটা। কেমন জবুথবু, এখানে-ওখানে কালশিটে-পড়া চেহারা। ভাঙেনি কোথাও, তবে মচকে গেছে মনে হয়। বিশাল একটা হাতি যেন হাঁটু দুমড়ে বসে পড়েছে।

বাড়ির ভেতরে ঢুকে বিমানবিহারীবাবুর ঘরের সামনে দাঁড়িয়ে জয়দীপ ঠোঁটে আঙুল রেখে চাপা গলায় বলল, "এ পাশে সরে এসে দাঁড়া, ভেতরে ফায়ার হচ্ছে।"

আচমকা কথাটা শুনে ভড়কে গিয়েছিলাম, কিন্তু গুলিগোলা না, ব্ল্যাঙ্ক ফায়ার। মেঘ ডাকা গলায় কেউ বোধ হয় কোনও বাচ্চা ছেলে-টেলেকে ধমকাচ্ছে।

দরজার সামনে থেকে একপাশে থামের আড়ালে সরে গেলেও ঘরের ভেতরের ধমকধামকগুলো স্পষ্ট শোনা যাচ্ছিল।

"সেদিনের ছোকরা, তোমার এইসব পাকামি কেন হে? ফের যদি দেখি হেঁসেল বাড়ির ফাইফরমাশ খাটছ তো কান মলে দেব। যাও, এসব ছাইভস্ম নিয়ে কেটে পড়ো! এর মধ্যে বিষ আছে না অমৃত আছে তুমি কি চেখে দেখেছ, খোকন?"

খোকন নিরুত্তর, তার কোনও কথা শুনতে পেলাম না। কয়েক সেকেন্ড পরেই ছিপছিপে চেহারার এক বৃদ্ধ বেরিয়ে এলেন, মাথা নিচু করে হাঁটছিলেন। বেশ চিন্তান্বিত মনে হচ্ছিল ওঁকে। হাতে একটা টিফিন ক্যারিয়ার।

"সর্বোনাশ!" জয়দীপ ফিসফিস করে বলে, "এ যে ছোটঠাকুর্দা দেখছি!"

"খুব ভয় পেয়েছিস মনে হচ্ছে!" আমি কানে-কানে বলি।

ওর ছোটঠাকুর্দা গাছপালার আড়ালে চলে যাওয়ার আগে পর্যন্ত জয়দীপ কথা বলল না, কেমন সিঁটিয়ে থাকল। মনে হল ও কেবল ভয় পায়নি, কেমন যেন চমকেও গেছে।

আমি এবার সহজ গলায় বললাম, "কী রে আমার কথা শুনতে পাসনি নাকি?"

জয়দীপ লম্বা একটা নিশ্বাস ফেলে বলল, "বাব্বা! যা রাগি মানুষ, আমরা ওঁকে যমের মতো ডরাই। চল, এবার আমরা ভেতরে যেতে পারি।"

আমি ওর পেছন-পেছন আড়ষ্ট পায়ে ভেতরে ঢুকলাম। ঘরে একজনই মাত্র মানুষ। ডেকচেয়ারে বুদ্ধমূর্তির মতো খাড়া হয়ে বসে আছেন। চোখ দুটো বন্ধ। সাদা চুল সাদা দাড়িতে ঋষি-ঋষি ভাব, যেন ধ্যান ভাঙালেই চোখ দিয়ে আগুন ছুটবে, একটা যাচ্ছেতাই অভিশাপ দিয়ে বসবেন। জয়দীপ কিন্তু ঘাবড়াল না। বলল, "এই যে দাদাজি, কাকে বকঝকা করে এখন সাধু সেজে বসা হয়েছে?"

"কে, রে!" মনে হল দূরের আকাশে মেঘ ডাকল। তারপর চোখ খুলে বললেন, "ও বাবা! একেবারে জোড়া শালিক এসেছে আমার ঘরে! সঙ্গে কে এটি, শোভন না?"

আচমকা নিজের নাম শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। জয়দীপ হেসে ফেলে বলল, "বিউটিফুল! মেমোরি টেস্ট দিলে এখনও একশোয় একশো পাবে। এই সেই শোভন, আমার ফ্রেন্ড। কিন্তু দাদা, তোমার মেজাজটা কিন্তু বিউটিফুল না। একটু আগে ধমকাচ্ছিলে কাকে?"

দাড়ির ফাঁকে লুকোচুরি হেসে উনি বললেন, "তুমি তো জানোই জয়বাবু, আমি একটু রগচটা আছি—"

জয় ওঁকে কথা শেষ করতে দিল না... হেসে উঠে বলল, "একটু?"

"আচ্ছা না হয় একটু বেশিই হল, তাতে কি? আজকাল ছেলেগুলো কী যে হয়েছে! তাই শ্রীমানকে দিলুম আচ্ছা করে কড়কে। অবশ্য কানটাই মলে দেব ভেবেছিলাম।"

জয় ঘরের এপাশ-ওপাশ তাকাল, কাউকে দেখতে পেল না। অবাক হয়ে বলল, "তোমার শ্রীমানটি কে? গেল কোথায়?

"কেন, তোদের সামনে দিয়েই তো সুড়সুড় করে বেরিয়ে গেল, দেখিসনি?"

"অ্যাঁ!" একটি মাত্র শব্দ করে জয়দীপ যেন বোবা হয়ে গেল। আমি নিজেও হিসেব মেলাতে পারছিলাম না।

"হ্যাঁ। তোর ছোট্‌দাদু। কে বলবে ছোকরার বয়স বাহাত্তর পেরিয়েছে।"

"মাই গড!" জয়দীপ বলল, "ওহো, তুমি তো আবার 'গড'-এ বিশ্বাস করো না।"

"করি, তবে উলটে দিলে। আমাকে তিনবার কামড়েছিল! তিন চোদ্দং ছাপ্পান্ন, থুড়ি বিয়াল্লিশ, খুব মনে আছে।"

আমরা দু'জনেই হো-হো করে হেসে ফেললাম। জয়দীপের গ্রেট গ্র্যান্ড ফাদার একটু লজ্জিত হয়ে বললেন, "আটানব্বই বছর আগের নামতা বাপু, তার ওপর কুকুরের কামড়, মাথার ঠিক থাকে না!"

"নেইও। নইলে খবরের কাগজে কোথায় নিজের বিয়ের বিজ্ঞাপন দেবে, তা না, দিচ্ছ কাজের লোকের জন্য বিজ্ঞাপন। সাইলেন্ট সারভেন্ট! নির্বাক যুগের সিনেমায় ওরকম কাজের লোক দেখা যেত শুনেছি।"

"পেয়েছি, জয়বাবু পেয়ে গেছি। ওই দ্যাখো, ব্যাটা একেবারে ম্যাজিক মাস্টার! বলার আগে-আগে চলে এসেছে!"

মানুষের গা থেকে কি ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝলক বেরোয়? চমকে পেছন ফিরে তাকিয়ে যাকে দেখলাম সেরকম চেহারা কেবল গল্পের বইয়ের পাতায়ই দেখা যায়। আলকাতরা মাখানো পিপের মতো গোলাকার বেঁটেখাটো চেহারা, কাঁধের ওপর যেন ভাত সেদ্ধ করা মেটে হাঁড়ি বসানো। দুটো কাঁচাগোল্লা চোখের নিচে চুনকাম করা ঝাঁটাগোঁফ। ট্রে ভর্তি খাবার-দাবার বুকের কাছে ধরে বেশ তরিবত করে আমাদের দেখছে। সত্যি বলতে কি আমাদের দু'জনেরই গায়ে কাঁটা দিল।

বিমানবাবু একটু মাথা হেলিয়ে বললেন, "বহুত আচ্ছা। এবার হুক্কা লাগাও।"

লোকটা চোখের পলকে একটুও শব্দ না করে সামনের টেবিলটার ওপরে ট্রে নামিয়ে ওঁর পাশে রাখা গড়গড়ার মাথা থেকে রুপোর কলকেটা তুলে নিয়ে ঘর থেকে ভ্যানিশ হয়ে গেল।

রহস্যময় হাসি হেসে বিমানবাবু বললেন, "বলার দরকার ছিল না তবু বললাম। পেটের কথা ও টপ করে বুঝে নেয়, কী করে কে জানে!"

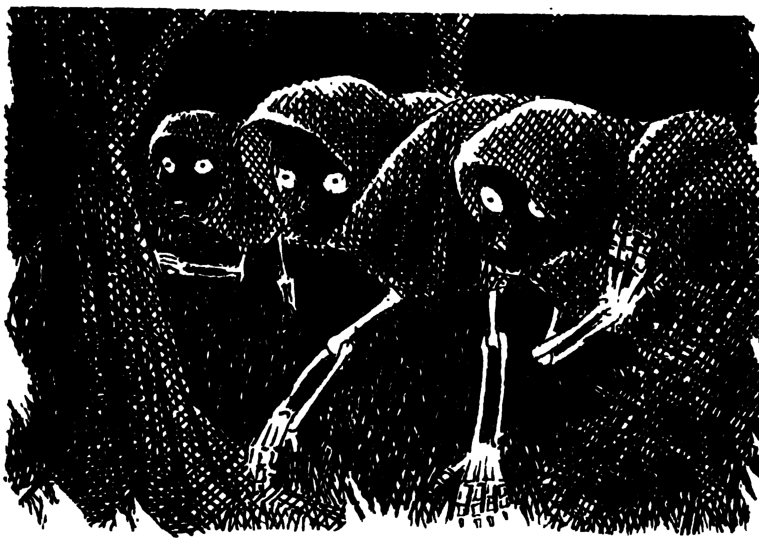
"লোকটা বাঙালি?"

"কে জানে।" উদাস গলায় উনি বললেন, "ও নিজেও জানে কি না সন্দেহ। ব্যাটা আস্ত ভূত, যেমন চেহারা, তেমনই..."

কথা শেষ হল না। অম্বুরি তামাকের মিষ্টি গন্ধটা আমাদের নাকে এসে লাগল। আমরা তিনজনেই চমকে তাকালাম। গড়গড়ার ওপর কখন কলকে বসে গেছে, আর তা থেকে অল্প-অল্প ধোঁয়া উঠছে। লোকটাকে কিন্তু আমরা কেউই দেখতে পেলাম না। ❑



পারঘাট / সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়



আমাদের একটা বাড়ি ছিল। বাড়িটা খুব পুরনো। আমরা থাকতে থাকতে সেটা আরো পুরনো হল। বেশ বড় বাড়ি। এ মাথা থেকে ও মাথা। কিছু কিছু ঘরে সারা দিন চিন্‌চিন্‌ করে বালি ঝরে পড়ত। ভেন্টিলেটারে চড়াই পাখির বাসা। সারা দিন তাদের কিঁচকিঁচ, কাঁচি দিয়ে কাপড় কাটার শব্দের মতো ডাক। বাড়িটার পেছনে ছিল গঙ্গা। সারা দিন ভিজে ভিজে বাতাস। দেয়ালে দেয়ালে নোনা ধরা। যেন নানা দেশের ম্যাপ। আমরা ভাইবোনেরা নানা দেশ খুঁজে পেতুম সেই ম্যাপে। কোনোটা অস্ট্রেলিয়া, কোনোটা গ্রেট ব্রিটেন, জাপান। গঙ্গার দিকে ঝোপঝাপ গাছগুলো সব ডুবে যেত জলে। একটা কদম গাছ ছিল। মনে হত, নাইতে নেমেছে জলে। একগাছ গোল গোল ফুল। আমরা কল্পনার চোখে সেই গাছে শ্রীকৃষ্ণকে যেন দেখতে পেতুম, ডালে বসে বাঁশি বাজাচ্ছেন। বাগানটা জলে ডুবে গেলে আমরা পায়ে সরষের তেল মেখে সেই জলে ছপছপ করে খেলতে নামতুম। মাঝে মাঝে হলুদ সাপ জলে লাট খেত। আমরা একটুও ভয় পেতুম না। জানা ছিল, জলে বিষধর সাপ থাকে না। অনেক মাছ ঢুকে পড়ত বাগানে। বেশির ভাগই আড়ট্যাংরা। ছোটো ছোটো চিংড়ি তিড়িং-বিড়িং করে লাফাত। জল নেমে গেলে পলি পড়ে থাকত। মিহি চিকচিকে। বিজবিজ করত ছোট ছোট কাঁকড়া। দু একটা চিংড়িও লাফাত। পাতার ঝোপে অসহায় আড়ট্যাংরা। আমরা কোনোটাই ধরতুম না। আড়ট্যাংরা তো

খেতেই নেই। ওরা নোংরা খায়। একবার একটা বিশাল ময়াল সাপ কোথা থেকে চলে এসেছিল। জ্যাঠামশাই বলেছিলেন, সাপটা খুব ভালমানুষ। ওকে ভয় পাওয়া উচিত হবে না। বাগানের এককোণে ঝাঁকড়া একটা বকুলের ছায়ায় ছোট একটা ঘর ছিল। এক সময় এক সাধু থাকতেন ওই ঘরে। জোয়ারের জল ওই ঘরে ঢুকে পড়ত। একটা পাথরের বেদী ছিল। বেদীটা জলে ডুবু ডুবু হয়ে থাকত। আমরা তার ওপর উঠে খেলা করতুম। জলভরা ঘরে কথা বললে বেশ গমগম করত। আমাদের মজা লাগত। সাপটা ওই ঘরেই আশ্রয় নিয়েছিল। পুরো একটা দিন ছিল। আমরা দুধ খেতে দিয়েছিলুম। খেয়েছিল। মনে হয় পেট ভরেনি। অত বড় সাপ। ছোট এক বাটি দুই। কি হবে! নস্যি। ছোট একটা ছাগল দিলে গিলে ফেলত। ময়ালটা দিনের জোয়ারে এসে রাতের জোয়ারে চলে গেল। সেই থেকে ঘরটার নাম হয়ে গেল ময়াল গুহা। বাগনাটায় এত কিছু ছিল, তবু আমরা নির্ভয়ে যেতুম। কেউ আমাদের কিছু বলতেন না। বাবা বলতেন, বিপদের মুখে এগিয়ে যাওয়া উচিত। তা না হলে মানুষ ভীতু হয়ে যায়। জীবন জিনিসটা খুব সহজ নয়। কত কী হবে! কত কী ঘটবে!

আমাদের সেই বাড়িটার নিচের তলায় অনেক ঘর ছিল। সেই ঘরগুলো আমরা ব্যবহার করতুম না। করার প্রয়োজন হত না। তালাবন্ধ পড়ে থাকত বারো মাস। আমরা থাকতুম দোতলায়। আমাদের একতলায় ইঁদারার মতো বড় একটা কুয়ো ছিল। সেই কুয়োর সঙ্গে সুড়ঙ্গপথে গঙ্গার যোগ ছিল। গঙ্গায় জোয়ার এলে, জোয়ারের জল কুয়োয় এসে ঢুকত। হুড়হুড় করে ভরে যেত। বর্ষায় উপচে পড়ত। তখন ঘটি, বাটি ডুবিয়ে জল তোলা যেত, দড়ি বালতির প্রয়োজন হত না। বাড়িটা এমন কায়দায় তৈরি ছিল, ঘরের মধ্যে ঘর, তার মধ্যে ঘর। সে বেশ মজা। আমাদের লুকোচুরি খেলার খুব সুবিধে হত। কে কোথায় লুকিয়ে আছি সহজে ধরা যেত না। অনেক ঘরের কোন ঘরে? সেই ঘরটা আবার কোন ঘরে ঢুকে আছে!

ছাতটা খুব বিশাল ছিল। খেলার মাঠের মতো। পশ্চিমে গঙ্গা। ছাতে উঠলে ওপারটা পরিষ্কার দেখা যেত অনেক দূর পর্যন্ত। ঘাট, মন্দির, বাগান, বাড়ি। ছাতে একটা চমৎকার ঘর ছিল। সেই ঘরে সাদা চাদর পাতা একটা বিছানা ছিল। কারো শরীর খারাপ, মন খারাপ হলে কোনো কারণে রাগ হলে এই ঘরে এসে শুয়ে থাকত। সবাই বলত গোঁসাঘর। আমরা যখন কানমলা বা চড়চাপড় একটা দুটো খেতুম, খেতুম যে না তা তো নয়, ছোটদের একটু দুষ্টুমি করতে ইচ্ছে করবেই, আর বড়দের ধৈর্য কম হবেই, আর বাঁদর, গাধা, উল্লুক বলবেই। তাতেও রাগ না কমলে, কান ধরে টান, গালে ছোটমতো একটা চড়। তাইতেও রাগ না কমলে মাথায় গাঁট্টার তেহাই। চড়, চাপড় বা

ছাগল, গাধা, বাঁদর বললে, আমাদের তেমন রাগ হত না। হনুমান বললে খুশিই হতুম। জানতুম, ওটা রাগ নয়, ভীষণ একটা আদর। উল্লুক শব্দটায় আমাদের ঘোরতর আপত্তি ছিল। জিনিসটাকে আমরা কখনো কোথাও দেখিনি। আমাদের বাগানে হনুমান আসত। রাস্তায় বাঁদর নাচাত। স্কুলের মাঠে গাধাও চরত। উল্লুক জিনিসটা আমরা চোখে দেখিনি। উল্লুকের 'লুক' কেমন জানা ছিল না। ভাল্লুক হলে আপত্তি ছিল না। ভাল 'লুক' মানে ভাল্লুক। উৎকট লুক মানে উল্লুক। উল্লুকের সঙ্গে কানমলা খুবই অপমানজনক। যেমন ঝোলে গাঁদাল পাতা। আর উল্লুক কথাটা বেশি ব্যবহার করতেন আমাদের কাকা আর মাস্টারমশাই। যাকে বলতেন, সে অমনি গোঁসাঘরে গিয়ে আশ্রয় নিত। অতবড় বাড়ি। অত ছেলেমেয়ে, লোকজন। গোঁসাঘরে কে চলে গেল তখনই কারো খেয়াল হত না। ধরা পড়ত খাওয়ার সময়। গুনে গুনে পাত পড়ত। একটা কেন খালি! খোঁজ কোথায় গেল। প্রথমেই গোঁসাঘরে অনুসন্ধান। উপুড় হয়ে পড়ে আছে বিছানায়।

-চল্, মা ডাকছে, খেতে দিয়েছে।

-যা, যা খাব না।

-চল্।

-যাব না আ আ।

কথায় আছে, ধরে আনতে বললে বেঁধে আনে। হাত ধরে টানতে গেল। খামচাখামচি, ঝটাপটি। কেস আরো খারাপ দিকে চলে গেল। সে ফিরে গিয়ে, যা নয় তাই বলে নালিশ করে দিলে, আমাকে লাথি মেরেছে। গালে আঁচড়ে দিয়েছে। বলেছে, যা যা, মা আমার সব করবে। মায়ের মেজাজ সেই সময় ভাল থাকলে কিছু নয়। মা নিজেই গিয়ে, অভিমান ভাঙিয়ে নিয়ে আসবে। অভিমানীর তখন এক আলাদা ডাঁট, যেন জামাই বসছেন খেতে। সবচেয়ে বড় মাছের টুকরোটা তার পাতে। চার চামচে চাটনি বেশি। মানে বেশ আদর, বেশি খাতির। তিনি যেন খেতে বসে সকলকে ধন্য করছেন। আর যদি মায়ের মেজাজ চড়া থাকে, তাহলে হয়ে গেল। মা সমান ঝাঁঝিয়ে বলবে, না খাবে, না খাবে। ক'দিন আর না খেয়ে থাকবে! পেটের জ্বালা ধরলে ঠিক নেমে আসবে। আমার দিদি একবার টানা তিনদিন ওই গোঁসাঘরে ছিল। দিদির কানের একটা দুল অসাবধানে কীভাবে হারিয়ে গিয়েছিল। মা দিদিকে বলেছিল, পেতনী। এই পেতনী কথাটা দিদি খুব অপছন্দ করত। বাঁদরী বললে তেমন রাগ করত না। গাধী বললেও না। দিদিকে দেখতে তো খুব সুন্দর ছিল! তাই পেতনী বললে ভীষণ রেগে যেত। আর মা দিদিকে মাসে অন্তত একবার পেতনী বলবেই। ভূত বললেও হয়। ভূতরা নাকি সবাই পুরুষ। দিদি গোঁসাঘরে চলে গেল। খাওয়ার সময় মা বললে, 'যা, মহারানীকে ডেকে আন।' ডাকতে গেলুম।

দিদি ঝাঁঝিয়ে উঠল, 'পেতনীরা ভাত খায় না। মাঝরাতে পেঁচা ধরে খায়। যা, তোর মাকে বল গে যা।' আমি এসে মাকে বললুম। একটু বাড়িয়েই বললুম, 'তোমার মেয়েকে তুমিই ডেকে আনো। আমাকে মিচকে পটাশ, দালাল— এই সব বলেছে।' মা বললে, 'তা তো বলবেই। কি যুগ পড়েছে দেখতে হবে তো। অন্যায় করব আবার চোখও রাঙাবো। যদ্দিন ইচ্ছে, তদ্দিন না খেয়ে থাক। পেটের জ্বালা ধরলে ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আসবে।' আমি সঙ্গে সঙ্গে মায়ের কথাটা দিদিকে গিয়ে রিপোর্ট করে দিলুম। একটা শব্দ বেশি যোগ করে। ল্যাজের জায়গায় বললুম, 'কুকুরের মতো ল্যাজ নাড়তে নাড়তে আসবে।' ব্যাপারটা খুব ঘোরালো হয়ে গেল। দিদির ঝাড়া দু'দিন উপোস, মায়েরও দু'দিন। মেয়ে না খেলে মা খায় কি করে! শেষে দিদি দেয়ালে লিখলে, 'আর একবার সাধিলেই খাইব।' তিন দিনের দিন জ্যাঠাইমা স্পেশ্যাল রান্না করে মা আর মেয়েকে পাশাপাশি বসিয়ে আদর করে খাওয়ালেন। সরু চালের ভাত, মাছের ঝোল। আমড়ার অম্বল। পোস্ত। আমরা সবাই জানলা দিয়ে উঁকি মেরে মেরে দেখতে লাগলুম দু'জনের অনশন ভঙ্গের দৃশ্য। কাকিমা আমাদের শিখিয়ে দিচ্ছেন, মহাত্মা গান্ধী দিনের পর দিন অনশন করতেন। অনশন ভঙ্গের দিন রামধুন গাওয়া হত। তোরাও সবাই মিলে গা, রঘুপতি রাঘব রাজারাম। মা আর মেয়ের সে কী ভাব! মেয়ের পাত থেকে মা কাঁচালঙ্কা তুলে নিচ্ছে।

অনেক খাট-পালঙ্ক ছিল, তবু আমাদের শোয়ার ব্যবস্থা ছিল মেঝেতে। বাবা বলতেন, ছাত্র-ছাত্রীরা সব ব্রহ্মচর্য পালন করবে। একটু কষ্টে থাকবে। সাধারণ খাবার খাবে। বাবুগিরি করবে না। সত্যকথা বলবে। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠবে। দুপুরে ঘুমোবে না। ছোট ছোট করে চুল ছাঁটবে। দশ আনা ছ আনা ছাঁট চলবে না। তার মানে কিছু বড় কিছু ছোট চলবে না। সব সমান মাপ। সেই ছাঁটের নাম ছিল কদমছাঁট। একটা বিশাল বড় ঘর ছিল। সেইটাকে বলা হত দক্ষিণের ঘর। সেই ঘরে মেঝে থেকে ছাত পর্যন্ত লম্বা, সাতটা জানলা আর তিনটে দরজা ছিল। সেই ঘরটাকে বলা হত হলঘর। সেই দূর অতীতে যাঁরা বাড়িটা তৈরি করিয়েছিলেন, তাঁরা এই হলঘরে বসে নাচ, গান, বাজনা করতেন। সেই ঘরের মেঝেতে মা একটা ঢালাও বিছানা করে দিতেন। একটা করে মাথার বালিশ। তাঁবুর মতো বিশাল এক মশারি, টান টান করে খাটানো। সেই বিছানায় আমরা সবকটা ভাইবোন পাশাপাশি। মাঝে মধ্যে গৃহযুদ্ধের মতো, মশারির মধ্যে আমাদের মশারিযুদ্ধ হত। শুরুটা হত খুব সামান্যভাবে। পায়ে পায়ে লড়াই। শেষে হাতাহাতি। সর্ব শেষে মশারির দড়ি-ফড়ি ছিঁড়ে প্রলয়কান্ড। সেইখানেই শেষ নয়। শেষের পরেও একটা শেষ থাকত, যেটাকে বলে অবশেষ। সেই অবশেষে বড়দের আগমন। প্রথম যে

শুরু করেছিল তাকে সনাক্তকরণ। বিচার। সাক্ষীসাবুদ। আত্মপক্ষ সমর্থনে দোষীর হাঁউমাউ। সব শেষে বিচারকের রায়, বাঁদরটার সাতদিন সব খেলাধুলো বন্ধ। সকাল থেকে রাত শুধু পড়বে আর কড়া কড়া অঙ্ক কষবে।

সেই মেঝের বিছানায় বালিশে মাথা রেখে শুতে শুতে দিদি একদিন আবিষ্কার করলে, ঘরটার নিচে যে তালাবন্ধ ঘরটা, সেই ঘরে কে যেন একটানা সংস্কৃত মন্ত্র পড়ে চলেছে। তখন অনেক রাত। দিদি আমাকে ফিসফিস করে ডাকছে, 'বিলু, বিলু, বালিশে কান পেতে শোন।' হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কে একজন ভারি গলায় মন্ত্র পড়ছে। পরপর তিনদিন একই সময়ে আমরা সেই শব্দটা শুনলুম। মাঝরাত থেকে শুরু করে সেই ভোররাত পর্যন্ত।

দিদি খুব সাহসী ছিল। চারদিনের দিন দিদি বললে, 'চল বিলু, আমরা দেখে আসি। ব্যাপারটা কি!'

আমি বললুম, 'আমার ভীষণ ভয় করবে।'

'ভয় করবে? তুই না ছেলে? চল, পা টিপে টিপে, টর্চ হাতে যাব। আমি তো আছি।' পাঁচ সেলের টর্চ হাতে দিদি আগে আগে, পায়ে পায়ে আমি। দিদির ফ্রকের পেছনটা ধরে আছি। মনে হচ্ছে, ঘুরে ঘুরে প্যাঁচালো সিঁড়ি দিয়ে অন্ধকারের পাতকুয়ায় নেমে চলেছি আলোর রেখা ধরে। নিচেটা হিম হিম। সাতশো ঝিঁঝি পোকা একসঙ্গে ডাকছে। অন্ধকার যেন কাঁপছে। বাইরে গঙ্গার দিকের বাগানে কদমের ডালে বসে ডাকছে প্যাঁচা, যেন রাতের অন্ধকার করাত দিয়ে কাটছে। গাছের পাতায় বাতাসের ঝুপঝাপ শব্দ। লম্বা একটি গলি। দু'পাশে রক। সারি সারি তালাবন্ধ ঘর। ওপর থেকে যে ঘরটায় মন্ত্রপাঠ হচ্ছিল বলে ধারণা, সেই ঘরের দরজায় কিন্তু বিশাল একটা পেতলের তালা ঝুলছে দেখা গেল। ভয়ে বুকটা ছাঁত করে উঠল। দিদি পা টিপেটিপে এগোচ্ছে। নিজে দরজায় কান রাখল। অনেকক্ষণ ধরে কি শুনল! আমাকে ইশারায় ডেকে কান পেতে শুনতে বলল। ঘরের ভেতরে সত্যিই অদ্ভুত একটা শব্দ হচ্ছে। যেন দশ বারটা ডুমো ভোমরা একসঙ্গে ভোম্‌ভোম্‌ করছে। গভীর, গম্ভীর, ওঁকারধ্বনির মতো। দিদি টর্চ নিবিয়ে রেখেছে। ঘোর অন্ধকারে গায়ে গা লাগিয়ে দরজায় কান পেতে দু'জনে শুনছি। ভীষণ ভয় করছে। গায়ে কাঁটা দিচ্ছে, শীত করছে। দরজার পাশেই একটা জানলা ছিল। ভেতর থেকে বন্ধ। দিদি কি মনে করে জানলাটা ঠেলতেই একটা পাল্লা হড়াস করে খুলে গেল। এত সহজে খুলে যাবে আমরা ভাবতেও পারিনি। সুন্দর একটা গন্ধ বেরিয়ে এল খোলা জানলা দিয়ে। অন্ধকারে উঁকি মেরে মনে হল, ঘরের মেঝেতে কেউ বসে আছেন। সাদা মতো। শব্দটা সেই মূর্তি থেকেই আসছে। দিদি ঝট করে টর্চ লাইটটা টিপল। হঠাৎ আলোর ঘরটা যেন চমকে উঠল। আমরা অবাক হয়ে দেখলুম, ঘরের মেঝেতে একটা আসন পাতা রয়েছে,

আর কোথাও কিছু নেই। মানুষের মূর্তি আমাদের চোখের ভুল। দিদি যেই টর্চটা নেবালো, সঙ্গে সঙ্গে মনে হল মূর্তিটা আছে। আলোয় নেই, অন্ধকারে আছে। ভয়ে শরীর পাথরের মতো হয়ে গেছে। দিদিও বেশ ভয় পেয়ে গেছে। ছুটে পালিয়ে আসতে পারছি না। পা দুটো যেন মেঝেতে থাম হয়ে গেছে। হঠাৎ কে যেন খুব ভারি গলায় পরিষ্কার বললে, 'যাও, শুয়ে পড়।' আমরা কাঁপতে কাঁপতে ওপরে এসে, দু'জনে জড়াজড়ি করে শুয়ে পড়লুম।

পরের দিন সকালে গিয়ে দেখি, জানলাটা বন্ধ হয়ে গেছে। দিদি মাকে জিজ্ঞেস করলে, 'ওই ঘরটা কোনোদিন খোলো না কেন মা!'

'ওই ঘরে বসে তোদের দাদু সাধনা করতেন। মৃত্যুর সময় বলে গিয়েছিলেন, বারোটা বছর ওই ঘর যেন খোলা না হয়। কেউ যেন না ঢোকে। এখনো দু'বছর বাকি আছে। দু'বছর পরে ওই ঘর খুলে পুজো হবে।'

এদিকে আমাদের কি হল, রাতের ঘুম চলে গেল। মাঝরাতে বাড়ির সবাই যখন সুখে ঘুমোচ্ছে, তখন আমি আর দিদি টর্চ হাতে পা টিপে টিপে, আস্তে আস্তে নিচে নেমে যেতুম। সেই ঘর। সেই শব্দ। আমাদের আর ভয় করত না। জানলাটা খোলা মাত্রই সুন্দর একটা গন্ধ। অন্ধকার আসনে শ্বেতমূর্তি। আমরা অপেক্ষা করে থাকতুম, যদি কোনো কণ্ঠস্বর আসে। সেই প্রথম দিনের মতো, 'যাও শুয়ে পড়।'

এসেছিল কণ্ঠস্বর। সে এক ভয়ঙ্কর ইঙ্গিত। 'তোমাদের বাড়িটা থাকবে না। গঙ্গা গ্রাস করবে।'

আমরা সেকথা বিশ্বাস করিনি। এতকালের এত বড় একটা বাড়ি জলে চলে যাবে। দিদি মাকে বললে। মা বললে বাবাকে। বাবা জ্যাঠামশাইকে। জ্যাঠামশাই কাকাবাবুকে। সবাই বললেন, 'গঙ্গা যদি নেনই আমাদের তো কিছু করার নেই। গঙ্গার সঙ্গে লড়াই করার ক্ষমতা আমাদের নেই।'

সত্যিই তাই। প্রবল জোয়ারে একটু একটু করে পাড় ভাঙতে ভাঙতে প্রথমে গেল সেই সাধুর কুঠিয়া। ভাদ্রমাসের অমাবস্যার রাত। ভাদ্রমাসে গঙ্গায় ষাঁড়াষাঁড়ীর বান আসে। বিশাল তার শক্তি। পর পর দুটো ঢেউ আসে। একটা ষাঁড় আর একটা ষাঁড়ী। সেই রাতে বান এল। প্রথম ঢেউয়ের আঘাতেই কুঠিয়ার পাড় ভেঙে গেল। দ্বিতীয় ঢেউয়ের আঘাতে ঘরটা ধসে পড়ল ধুস করে। আমরা আমাদের ছাতে দাঁড়িয়ে দেখলুম। বেদীঅলা অমন সুন্দর ঘরটা ঝুপ করে জলে পড়ে গেল। ঘোলা জল পাক মেরে ছুটে চলেছে দক্ষিণ থেকে উত্তরে। সেই বছরেই বাগানটার তিনের চার অংশ গঙ্গায় চলে গেল। বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ারকে ডেকে আনলেন। তিনি সব দেখে বললেন, কিছু করার নেই। গঙ্গা পুব দিকে সরে আসছে। পশ্চিমে চর। পুবে ভাঙন। তিন লাখ টাকা খরচ করে বাঁধাতে পারেন, তবে টাকাটা জলে যাওয়ার সম্ভাবনাই বেশি।

মাঝরাতে আমি আর দিদি একদিন সেই ঘরের জানলা খুলে দাদুর অস্পষ্ট ঝাপসা মূর্তিকে বললুম, 'আমাদের এমন সুন্দর বাড়িটা গঙ্গায় চলে যাবে? আপনি কিছু করবেন না। আমাদের কদম গাছ, বকুল গাছ, বেল গাছ, পিটুলি গাছ! খেলার মাঠের মতো আমাদের অত বড় ছাত! দক্ষিণের হলঘর। ঘরের ভেতর ঘর।'

কোনো উত্তর নেই।

'আপনি অত বড় সাধক। ইচ্ছে করলে সব পারবেন।'

কোনো উত্তর নেই।

'আর দু'বছর পরে আপনার ঘর তাহলে কে খুলবে?'

এইবার পরিষ্কার শোনা গেল, 'আমার ঘর খুলবেন মা গঙ্গা। আমার সাধনা, আমার আত্মা তিনি ভাসিয়ে নিয়ে যাবেন সাগরে।'

সেই দিনের কথা মনে আছে। আমরা বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। তিন চারটে লরিতে আমাদের সব মাল উঠেছে। আমাদের একশো বছরের বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি দূরে, ঘিঞ্জি একটা জায়গায়, যেখানে অনেক লোক, সারাদিন অনেক গাড়ি, দোকানপাট, কলকোলাহল। সেখানে গাছ নেই, পরিষ্কার বাতাস নেই। সারাদিন একটা কারখানার চিমনি ভুসভুস করে ভুসো ধোঁয়া ছাড়ে আকাশে।

কত দিন হয়ে গেল, সেইসব দিনের কথা। যেখানে আমাদের বাড়িটা ছিল সেখানে এখন গঙ্গা। একটা ফেরিঘাট হয়েছে। কত যাত্রী রোজ এপার ওপার করে। আর দাদুর ঘরটা যেখানে ছিল, সেইখানে হয়েছে টিকিটঘর। পারে যাওয়ার টিকিট মেলে সেই ঘরে। ❑



কেন দেখা দিল না/ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়



আমার বন্ধু শঙ্করকে গুয়াহাটি যেতে হয়েছিল অফিসের কাজে। আমিও তখন যাচ্ছিলাম দিল্লি হয়ে রাজস্থান। দু'জনে সম্পূর্ণ দু'দিকে যাব। দমদম এয়ারপোর্টে বসে গল্প করলাম খানিকক্ষণ। আমার প্লেন সাড়ে পাঁচটায় আর শঙ্করের প্লেন ছাড়বে সাড়ে ছ'টায়।

শঙ্কর বলল, "তুই রাজস্থানে ঘুরবি। শুনে আমার খুব লোভ হচ্ছে। অফিসের কাজ না থাকলে আমি তোর সঙ্গে চলে যেতাম।"

আমি বললাম, "আমারও তো ওদিককার প্লেনের টিকিট কাটা হয়ে গেছে। না হলে দিল্লির বদলে ঘুরে আসতাম গুয়াহাটি।"

প্লেনে ওঠার জন্য আমারই আগে ডাক পড়ল।

শঙ্কর জিজ্ঞেস করল, "তুই কবে ফিরবি, সুনীল?"

আমি বললাম, "কুড়ি তারিখ শনিবার সকালে।"

শঙ্কর বলল, "আমি ফিরে আসব তার অনেক আগেই। তা হলে ওই কুড়ি তারিখ ফিরেই তুই আমার বাড়িতে চলে আসিস। তোর বেড়াবার গল্প শুনব। আর রাত্তিরে আমরা খাব একসঙ্গে।"

আমি বললাম, "ঠিক আছে, ওই কথাই রইল।"

আমি চলে গেলাম প্লেনের দিকে। তারপর দিল্লি ছুঁয়ে রাজস্থানে ঘোরাঘুরি করলাম বেশ কয়েকদিন। ইচ্ছেমতন এক-এক জায়গায় থেকেছি। কোথায় কোন

হোটেলে উঠছি, তা আমার বাড়ির কেউ জানত না, জানবার দরকারও বোধ করেনি।

ফিরে এলাম ঠিক কুড়ি তারিখেই। আরও কয়েকদিন থেকে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু আজকাল তো ট্রেনের টিকিট যে কোনও সময় চাইলেই পাওয়া যায় না!

বাড়ি ফিরে সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠছি, দোতলার মুখে দাঁড়িয়ে আছে আমার ছোট ভাই। আমাকে দেখে তার মুখখানা যেন ছাই রঙের হয়ে গেল।

সে বলল, "দাদা, তুই খবরটা শুনেছিস?"

আমি জিজ্ঞেস করলাম, "কী খবর?"

"তুই শঙ্করদার খবর এখনও জানিস না?"

"শঙ্করের খবর? কি হয়েছে শঙ্করের?"

আমার ছোটভাই চুপ করে গেল। আমি দৌড়ে ওপরে উঠে এসে তাকে ধরে ঝাঁকুনি দিয়ে বললাম, "কি হয়েছে? কিছু বলছিস না কেন?"

"শঙ্করদা মারা গেছে!"

কয়েক মুহূর্তের জন্য যেন আমার জ্ঞান চলে গিয়েছিল। মাথায় কিছু ঢুকল না।

তারপর আমি চিৎকার করে বললাম, "মিথ্যে কথা! হতেই পারে না!"

এই তো সেদিন দেখা হল শঙ্করের সঙ্গে। আমি বিদায় নেওয়ার সময় সে আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলল, "কুড়ি তারিখে দেখা হবে। আমার চেয়েও শঙ্করের স্বাস্থ্য অনেক ভাল। সুন্দর চেহারা। সে কী করে হঠাৎ মরে যাবে?"

কিন্তু এক-একটা ঘটনা থাকে, চিৎকার করে প্রতিবাদ জানালেও মিথ্যে হয়ে যায় না। এইসব খবর নিয়ে কেউ মিথ্যে ঠাট্টাও করে না।

শঙ্কর সত্যিই নেই। গুয়াহাটিতে গিয়ে তার হার্ট অ্যাটাক হয়েছিল। কোন চিকিৎসার আগেই তার শেষ নিশ্বাস পড়ে।

অন্য বন্ধুবান্ধবরা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। খবর পাওয়া গিয়েছিল প্রায় একদিন পরে, কারণ টেলিফোনের লাইন পাওয়া যাচ্ছিল না। প্লেনে ফিরিয়ে আনার অনেক ঝামেলা। শঙ্করের মামা গুয়াহাটি চলে গিয়ে পোড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

আমি সিঁড়ির ওপর বসে পড়লাম। আমার চোখ দুটি দিয়ে টপটপ করে জল গড়াতে লাগল। শঙ্কর আমার ঘনিষ্ঠ বন্ধু, তার সঙ্গে আর কোনদিন দেখা হবে না? আজ কুড়ি তারখ, শনিবার আজ সে আমাকে নেমন্তন্ন করে রেখেছিল, তার বাড়িতে খাওয়াদাওয়া করার কথা। আজ আমি শঙ্করের মায়ের সামনে দাঁড়াব কি করে?

শঙ্করের মৃত্যুর পরেও তার চিঠি আসতে লাগল। ও খুব চিঠি লিখতে

ভালবাসত। পোস্টকার্ডে ছোট-ছোট চিঠি লিখত অনেককে। সেইসব চিঠি এসে পৌঁছতে লাগল অনেক পরে। সেইসব চিঠি দেখলেই বুকটা ধক করে ওঠে। মনে হয় না, মানুষটা বেঁচে আছে?

এয়ারপোর্টে শেষ দেখা শঙ্করের সেই চেহারা এখনও আমার চোখে ভাসে, তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনতে পাই।

তারপর কেটে গেল তিন মাস। শঙ্করের বাড়ির বৈঠকখানায় আমাদের বন্ধুদের একটা আড্ডা ছিল, এখন আর সেখানে কেউ যায়ই না। তবু প্রায়ই শঙ্করের কথা মনে পড়ে।

আমি আবার একটা নেমন্তন্ন পেলাম মানসের জঙ্গল ঘুরে দেখার। জঙ্গল আমার খুব প্রিয়। ডাক পেলেই ছুটে যাই। আর মানস ফরেস্ট তো অতি বিখ্যাত। থাকার ব্যবস্থা জঙ্গলের মধ্যেই, ডাকবাংলোতে।

তিন দিন ধরে সেই জঙ্গলে প্রচুর ঘোরাঘুরি করার পর একজন অসমিয়া বন্ধু আমাকে তার জিপ গাড়িতে করে পৌঁছে দিয়ে গেল গুয়াহাটির সার্কিট হাউসে। সেখানে আমার নামে একটা ঘর বুক করা আছে।

কী একটা কারণে যেন অসমের সব সরকারি অফিসে স্ট্রাইক চলছে, তাই সার্কিট হাউসে খাবার পাওয়া যাবে না। অসমিয়া বন্ধুটি বাইরে থেকে একগাদা খাবার কিনে নিয়ে এল আমার জন্য।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর সে বিদায় নিল। রাত প্রায় সাড়ে দশটা। সারাদিন জিপ গাড়িতে চেপে এসেছি বলে ধুলোয় গা একেবারে চিটচিটে হয়ে গেছে। তাই আমি স্নান সেরে নিলাম ভাল করে। তারপর খেতে বসলাম।

আজ আর ডাকলে বেয়ারাদেরও পাওয়া যাবে না। প্লেট, চামচ কিংবা এক গ্লাস জলও কেউ দেবে না। সবাই ছুটি নিয়েছে। সার্কিট হাউসের আর কোনও ঘরে কোনও লোক নেই। এত বড় সার্কিট হাউসটা একেবারে নিস্তব্ধ।

আমি একা থাকতে ভালবাসি। হাতে একটা বই খুলে নিয়ে একা-একা খাওয়াটাও পছন্দ করি। যত ইচ্ছে সময় লাগুক, কেউ মাথা ঘামাবে না।

একখানা লুচিতে আলুর দম ভরে সবে মাত্র মুখে দিয়েছি, জানলার কাছে কিসের যেন একটা শব্দ হল। মুখ তুলতেই মনে হল, কে যেন জানলার পাশ দিয়ে চট করে সরে গেল।

আমি ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করলাম, "কে?"

কেউ কোনও উত্তর দিল না। যতদূর জানি, আজ সার্কিট হাউসে কোনও লোক নেই। তা হলে কে দাঁড়িয়েছিল? কেউ থাকলেও লুকিয়ে পড়বে কেন? চোরটোর নাকি?

দরজা খুলে বাইরে উঁকি দিয়ে দেখলাম। না, কেউ নেই। তা হলে আমারই ভুল হয়েছে। জানলার পরদাটা উড়ছে, সেই জন্যই ভুল হতে পারে।

ফিরে এসে বইটা তুলে নিয়ে খাওয়া শুরু করতেই আবার ঠকাস করে জানলার একটা পাল্লা বন্ধ হয়ে গেল। এবার যেন স্পষ্ট দেখতে পেলাম, জানলার পাশ দিয়ে সরে গেল একটা মুখ।

আবার ধমকের সুরে চেঁচিয়ে বললাম, "কে? কে ওখানে?"

কোনও উত্তর নেই। চোখে এত ভুল দেখছি!

উঠে গিয়ে আবার দরজা খুলে দেখলাম, কেউ কোথাও নেই। অন্য সব দরজায় তালা লাগান, মাঝখানে লম্বা বারান্দা, চোর যদি হয় সে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে শব্দ করবে কেন? কেউ কি আমার সঙ্গে লুকোচুরি খেলছে!

এই লুকোচুরি কথাটা মনে আসতেই মনে পড়ল শঙ্করের কথা।

শঙ্কর এই গুয়াহাটিতে এসেই মারা গেছে। শঙ্করের বড়মামা ছাড়া আর আমাদের চেনাশোনা কেউ শঙ্করের মৃতদেহ দেখেনি। মামা-ভাগ্নেতে মিলে কোনও ষড়যন্ত্র করেনি তো? কোনও কারণে শঙ্কর গুয়াহাটিতে লুকিয়ে থেকে নিজের মৃত্যু-সংবাদ রটিয়ে দিয়েছে?

কিন্তু শঙ্করের ছোট ভাইবোনকে আমি কী দারুণ কাঁদতে দেখেছি। শঙ্করের মা শোকে-দুঃখে যেন পাথর হয়ে গিয়েছিলেন। মায়ের কাছে কি কেউ ছেলের নামে এমন মিথ্যে বলতে পারে? শঙ্করের বড়মামাও খুব গম্ভীর ধরনের মানুষ, তিনি এ-ধরনের নির্মম রসিকতা করতেই পারেন না।

নাঃ, শঙ্কর বেঁচে থাকতে পারে না।

আবার খাওয়া শুরু করলাম। এবার ঘরের মধ্যে একটা দমকা হাওয়া ঢুকে এল, ঘরের একদিকের দেওয়ালে একটা জঙ্গলের ছবি, আর-একদিকের দেওয়ালে একটা ক্যালেণ্ডার। হাওয়ায় ক্যালেণ্ডারটা খুলে পড়ে গেল মাটিতে।

আমি ক্যালেণ্ডারটা তুলবার জন্য উঠতে গিয়েও ভাবলাম, থাক, খাওয়ার পর তুললেই হবে।

তখনই মনে পড়ল, আজকের দিনটাও শনিবার, আর এ-মাসের কুড়ি তারিখ। সঙ্গে-সঙ্গে আমার শরীরে একটা শিহরণ বয়ে গেল।

আমি চিৎকার করে বলে উঠলাম, "শঙ্কর, শঙ্কর, তুই কি লুকিয়ে আছিস? আমার সামনে চলে আয়। আমাকে সব কথা বল!"

কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

তিন মাস আগেকার এক কুড়ি তারিখ, শনিবারে শঙ্করের সঙ্গে আমার খাওয়াদাওয়া করার কথা ছিল, আজও সেইরকম একটা দিন। শঙ্কর নেই। আজ কি আমি একা একা খেতে পারি?

খাবার সরিয়ে রেখে আমি বাথরুমে গিয়ে হাত ধুয়ে নিলাম। শঙ্করের জন্য বুকটা হু-হু করে উঠল।

বাথরুমের জানলা দিয়ে বাইরে দেখা যায় অন্ধকার একেবারে ঘুটঘুট

করছে। পাশেই বিশাল ব্রহ্মপুত্র নদী। জলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে, কিন্তু নদীটা দেখা যাচ্ছে না।

বাথরুম থেকে বেরিয়ে দেখি, ঝড়ের মতন হাওয়ায় জানলার পরদা উথালপাথাল করছে। এ-ঘরের সব দরজা-জানলায় বড় বড় ভারী পরদা। এমন পরদা, যার আড়ালে কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকতে পারে।

একেবারে ফাঁকা সার্কিট হাউস, চোর-ডাকাত ঢুকে পড়া সম্ভব নয়। আমার কাছে টাকা-পয়সা প্রায় কিছুই নেই, কিন্তু চোর-ডাকাতরা তা জানবে কি করে?

আমি সবক'টা পরদা সরিয়ে-সরিয়ে দেখলাম। দরজার লাগালাম খিল আর ছিটকিনি। কাছের জানলাগুলোতে শক্ত গ্রিল লাগানো আছে, কেউ ঢুকতে পারবে না।

বইটা পড়ার চেষ্টা করতেই ঝড়ের হাওয়ায় একটা জানলার পরদা খুব উড়তে লাগল। কাচের পাল্লা তো বন্ধ করেছিলাম, খুলে গেল কি করে?

উঠে গিয়ে পরীক্ষা করে দেখলাম। ছিটকিনিটা একটু আলগা মতন, হাওয়ার ধাক্কায় নিজে নিজেই খুলে গেছে। হাওয়া আসছে দারুণ জোরে। অন্য একটা জানলার পরদা সরিয়ে দেখলাম, তার দুটো পাল্লাই খোলা, এটা বোধ হয় বন্ধই করিনি।

এই প্রথম আমি ভয় পেলাম। একই দিকে দুটো জানলা। দুটোই নদীর দিকে। কিন্তু একটা জানলার পরদা দমকা হওয়ায় উড়ছিল, আর অন্য জানলার পরদাটা একটুও নড়েনি। দুটো জানলাই খোলা, দুটো জানলা দিয়েই তো সমান হাওয়া আসার কথা।

বাইরে কিছুই দেখা যায় না। এমন হতে পারে, অন্য জানলাটার কাছেই কোনও বড় গাছ আছে কিংবা দেওয়াল-টেওয়াল কিছু আছে, তাই হাওয়া বাধা পাচ্ছে। এ ছাড়া আর তো কোনও কারণ থাকতে পারে না।

এইসব কথা ভাবলেও সত্যি কথা বলছি, আমার বেশ ভয় করতে লাগল।

এখন আর বই পড়া যাবে না। দুটো জানলায় ভাল করে ছিটকিনি এঁটে আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম।

একটু পরেই মনে হল, জানলায় কেউ ঠক ঠক করছে।

আমি মনে মনে বলতে লাগলাম, কেউ না। কেউ না! ওটা ঝড়ের শব্দ, বাতাসের ধাক্কা। তাছাড়া আর কিছুই নয়।

হঠাৎ প্রচণ্ড একটা ধাক্কায় সেই প্রথম জানলাটার পাল্লা খুলে গেল হাট করে, ঝোড়ো বাতাস ঘরের মধ্যে যেন তাণ্ডব শুরু করে দিল। ঝনঝন শব্দে পড়ে ভেঙে গেল দেওয়ালের ছবিটা।

আমি দারুণ ভয়ে আঁ-আঁ চিৎকার করে উঠলাম।

অন্য জানলাটায় একটুও শব্দ নেই, বাতাসের ঝাপটা নেই। তা হলে এ নিশ্চয়ই অলৌকিক কাণ্ড!

শঙ্কর নেই, তবে কি তার প্রেতাত্মা দেখা করতে চায় আমার সঙ্গে? অর্থাৎ ভূত।

এতকাল ভূতে বিশ্বাস করিনি। কিন্তু এখন ভয়ে কাঁপিয়ে দিচ্ছে সর্বাঙ্গ। সত্যিই মনে হচ্ছে, অন্ধকার ঘরের মধ্যে কেউ ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বেড সুইচটা টিপে আলো জ্বালতেই অবশ্য দেখা গেল, ঘর খালি। কেউ নেই, এলোমেলো বাতাস বইছে শুধু। ছবিটা পড়ে ভেঙে গিয়েছে।

এবার আমি ঠাস করে নিজের গালে একটা চড় কষালাম।

যদি শঙ্কর ভূত হয়ে এসেও থাকে, তাতে আমার ভয় পাওয়ার কী আছে? শঙ্কর আমার অতি প্রিয় বন্ধু ছিল, সে কি আমার কোনও ক্ষতি করবে? কখনও না।

ছেলেমানুষের মতন ভয় না পেয়ে আমার ধৈর্য ধরে দেখা উচিত। ভূত আছে না নেই, তার প্রমাণ হয়ে যাবে। নিজের ঘনিষ্ঠ বন্ধু ভূত হলে ভয় পাওয়ার কোনও কারণই নেই। তার কাছ থেকে ভূতেদের ব্যাপার-সাপার সব জেনে নেওয়া যাবে।

নিজেকে চড় মারার ফলে অনেকটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে পেলাম। খুলে দিলাম দুটো জানলার পাল্লা। আসুক হাওয়া। আরও যদি কেউ আসতে চায় তো আসুক।

বিছানা ছেড়ে চেয়ারে বসলাম বইটা নিয়ে। জোরে বললাম, "শঙ্কর আয়, দেখা দে। কিংবা যদি কিছু বলতে চাস্, বল। আমি ভয় পাব না। তোর যেরকম চেহারাই হোক, ভয় পাব না। আয় শঙ্কর, আয়, তোর সঙ্গে আমার অনেক গল্প বাকি আছে।"

তারপর মাঝে মাঝে বই পড়া আর মাঝে-মাঝে জানলার দিকে তাকানো, এইভাবে কেটে গেল সারারাত। চেয়ারে বসে। কেউ এল না। কেউ কিছু বলল না। শঙ্কর দেখা দিল না। ❑



বন্ধু/ মঞ্জিল সেন



বিমল যখন ধানবাদ স্টেশনে পৌঁছাল, অন্ধকার তখন প্রায় নেমে এসেছে। রেলগাড়ির কামরা থেকে বাইরেটা এতক্ষণ নিঃসীম আর নিঃসঙ্গ মনে হচ্ছিল। বেশ বড় স্টেশন, চারদিকে ছুটোছুটি, ব্যস্ততা। ধানবাদকে কেন্দ্র করে ছড়িয়ে আছে বিহারের কয়লাখনিগুলি, তাই শিল্প-শহর ধানবাদের গুরুত্ব অনেকখানি।

বিমল প্ল্যাটফর্মের এপাশ ওপাশ চোখ বুলাল। বাদলকে ও তার করে দিয়েছিল, আশা করেছিল সে স্টেশনে থাকবে। হয়তো শেষ মুহূর্তে কাজে আটকা পড়ে গেছে। একটা কোলিয়ারির অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজারের দায়িত্ব তো কম নয়। ওর অবশ্য একটু মুশকিলই হল, নতুন জায়গা, পথ-ঘাট অচেনা, ঠিক মত পৌঁছুতে পারলে হয়!

আরে! বিমল প্রায় লাফিয়ে উঠল। ওর থেকে মাত্র কয়েক হাত দূরে দাঁড়িয়ে বাদল ওর দিকে তাকিয়ে মিটি মিটি হাসছে। সেই চিরকেলে দুষ্টুমির হাসি। কখন যে ও এসে দাঁড়িয়েছে বিমল টেরও পায়নি। বিমল একটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলল তারপর হাতের স্যুটকেশটা মাটিতে নামিয়ে দু'হাত বাড়িয়ে এগিয়ে গেল! সঙ্গে সঙ্গে দু'পা পিছিয়ে বাদল বলল, "আমাকে ধরিস না, আমার একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে।'

"কি অ্যাক্সিডেন্ট?" বিমল উদ্বিগ্ন কণ্ঠে প্রশ্ন করল।

উত্তরে বাদল মৃদু হেসে হাওয়াই শার্টটা ফাঁক করল। চমকে উঠল বিমল। বুক জুড়ে ব্যাণ্ডেজ।

"কি হয়েছিল!" বিমল যেন স্তম্ভিত।

'ওই একটা অ্যাক্সিডেন্ট', বাদল যেন প্রসঙ্গটা এড়িয়ে যেতে চাইল তারপর বলল, 'চল্, আর দেরি করিস না। স্যুটকেশটা বইতে পারবি তো, না কুলি ডাকতে হবে?'

বিমল হেসে ফেলল, বলল, 'আমরা দুজনে এত দৌড়-ঝাঁপ আর ব্যায়াম করেছি, তা এই অল্প দিনেই ভুলে গেছিস!'

বাদলও হাসল, বলল, 'নারে, সে সব কথা কি ভোলা যায়। জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলি মনের মণিকোঠায় চিরকাল অক্ষয় হয়ে থাকে।'

ওরা স্টেশনের বাইরে এল। সারি সারি বাস আর কিছু ট্যাক্সি দূরগামী যাত্রীদের জন্য অপেক্ষা করছে। কাছের যাত্রীদের জন্য রয়েছে সাইকেল রিকশা।

ট্যাক্সিতে বেশিরভাগই শেয়ারের যাত্রী, বাদল কিন্তু একটা পুরো ট্যাক্সিই ভাড়া করেছিল। 'এতগুলো টাকা বাজে খরচ করলি কেন?' বিমল একটু আপত্তি করল, আমরা তো শেয়ারেই যেতে পারতাম।'

'তোর সম্মানে না হয় কিছু খরচই করলাম', বাদল হেসে জবাব দিল, 'রোজ তো আর এমন সুন্দর মুহূর্ত আসবে না।'

'তোকে দেখছি কাব্যরসে পেয়েছে', বিমল বলল, আর দুজনেই হেসে উঠল একসঙ্গে।

হাসি থামিয়ে বিমল হঠাৎ বলে উঠল, 'হ্যাঁরে, ট্যাক্সির ঝাঁকুনিতে তোর বুকের ব্যথা বাড়বে না তো?'

'না, ও নিয়ে তুই ভাবিস না', বাদল তাচ্ছিল্যভরা কণ্ঠে জবাব দিল।

পিচ্ঢালা মসৃণ পথ বেয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে ট্যাক্সি, ঝকঝকে রাস্তা, বিমল মনে মনে তারিফ না করে পারল না।

বাদল যে কোলিয়ারিতে কাজ করে তার এলাকায় প্রবেশ করল ওরা। অনেকটা জায়গা জুড়ে অন্ধকারের বুক চিরে সারি সারি যেন আলোর মালা। শ্রমিকদের কোয়ার্টার একদিকে আর কর্তা ব্যক্তিদের অন্যদিকে। ট্যাক্সি বাদলের নির্দেশ মত বাঁক নিল। সুন্দর সুন্দর সব কোয়ার্টার, একেবারে গা ঘেঁসে নয়, বরং একটু ছড়ানো। প্রত্যেক কোয়ার্টারের সামনে ফুলের বাগান।

বাদলের কোয়ার্টারের সামনে ট্যাক্সি থামল। ভাড়া আর বখশিস নিয়ে মস্ত সেলাম ঠুকে বিদায় নিল ট্যাক্সির ড্রাইভার। বিমল লক্ষ্য করে দেখল কোয়ার্টারের ভেতরটা অন্ধকার, গাড়ির শব্দ শুনে কেউ বেরিয়েও এল না।

"তোর লোকজন নেই?" ও একটু অবাক হয়েই বাদলকে জিজ্ঞেস করল।

"আর বলিস কেন!" মুখে বিরক্তির চিহ্ন ফুটে উঠল বাদলের, "দু'জন ছিল, কাল থেকে দু'জনেই পালিয়েছে।"

"তবে তো খুব অসুবিধেয় ফেললাম তোকে," বিমল না বলে পারল না, "তুই হয়তো মনে মনে বিরক্ত হচ্ছিস!"

"এ তুই কি বলছিস!" আহত গলায় বাদল জবাব দিল, "আমার অবস্থায় তুই কি আমাকে অবাঞ্ছিত বলে মনে করতিস!"

বিমল এবার লজ্জা পেল। বাদল আবার বলল, "কত দিন পরে তোর সঙ্গে দেখা! তোর টেলিগ্রাম পেয়ে আমার যে কি আনন্দ হয়েছিল তা তোকে বলে বোঝাতে পারব না। ছোটবেলা থেকে আমরা একসঙ্গে খেলেছি, পড়েছি। বড় হয়েও একসঙ্গে কলেজে পড়েছি। অন্য ছেলেরা ঠাট্টা করে আমাদের হরিহর আত্মা বলে ক্ষেপাতো, আমাদের ভাব দেখে অনেকেরই হিংসে হত। তারপর চাকরিতে ঢুকে আমাদের প্রথম ছাড়াছাড়ি। দু'বছর পরে এই আমাদের প্রথম দেখা। বাংলা দেশের বাইরে এই নির্বান্ধব জায়গায় তোকে কাছে পেয়ে আমার কি মনে হচ্ছে জানিস?"

"কি?" বিমল হেসে ফেলল।

"হৃদয় আমার নাচেরে আজি ময়ূরের মত নাচেরে।"

"সর্বনাশ! কপট গাম্ভীর্যে বিমল বলল, "ভরা বর্ষার কবিতা তুই এই দারুণ নিদাঘে অনায়াসে চালিয়ে দিলি! রবীন্দ্রনাথের আত্মাও যে শিউরে উঠবে।"

বাদলের মুখ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেল। মনে মনে আহত হলে যেমন হয় তেমন ভাব ফুটে উঠল মুখে। ব্যাপারটাকে লঘু করার জন্য বিমল তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "হ্যাঁরে, এই অন্ধকারেই সারা রাত দাঁড় করিয়ে রাখবি নাকি?"

বাদল যেন অপ্রস্তুত হল, বলল, "তুই এক মিনিট দাঁড়া, আমি ভেতরে গিয়ে আলো জ্বালছি।" ও তাড়াতাড়ি ভেতরে গিয়ে আলো জ্বালল। স্যুটকেশটা রেখে প্রথমেই বাথরুমে গেল বিমল।

হাল্ ফ্যাশানের বাথ্‌রুম। এক মানুষ লম্বা পোর্সেলিনের চৌবাচ্চায় টল্ টল্ করছিল ঠাণ্ডা জল। সেই জল গায়ে ঢালতেই সারা অঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল ওর, দূর হল সমস্ত পথের ক্লান্তি।

জামা-কাপড় ছেড়ে বসবার ঘরে ফিরে এসে বাদলকে কিন্তু ও দেখতে পেল না। ও একটা সোফায় গা এলিয়ে দিল। একটা মধুর আবেশে ওর দু'চোখ বুজে এসেছিল, হঠাৎ চমকেই ও দেখল বাদল। ওর সামনে দাঁড়িয়ে।

"খাবি চল্," বাদল বলল, "সারা দিনের ধকল গেছে, খিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।"

বিমলের সত্যিই প্রচণ্ড খিদে পেয়েছিল তাই আর ও আপত্তি করল না। ডাইনিং রুমে খাবার টেবিলে একটা কাচের জগে পরিষ্কার জল আর ফুলকাটা কাচের গেলাস। বড় একটা চীনেমাটির রেকাবিতে শাদা ধবধবে যুঁই

ফুলের মত ভাত। পাশেই দুটো পাত্র, একটাতে আস্ত মুর্গির রোস্ট্ আর অন্যটাতে রুই মাছের কালিয়া, মস্ত মাছের সাইজ।

"একটা প্লেট কেন?" ভাতের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে প্রশ্ন করল বিমল, "তোর খাবার কই?"

"অ্যাক্সিডেন্টের পর আমার শক্ত কিছু খাওয়া বারণ," বাদল রহস্যটা ভাঙল, "ডাক্তারবাবু আমাকে শুধু লিকুইড্ খেতে বলেছেন।"

"সেকি!" বিমল প্রতিবাদ করে উঠল, "আমি একা একা এত সব খাব নাকি?"

"তোর তো আর অ্যাক্সিডেন্ট হয়নি," বাদল হাসল।

"তোর অ্যাক্সিডেন্টের কথা যতবারই জিজ্ঞেস করছি, তুই এড়িয়ে যাচ্ছিস," এবার বেশ রেগেমেগেই বলল বিমল, "কি হয়েছিল বল্‌তো।"

"আগে খেয়ে নে," বাদল হাসল, "গরম গরম খাবার। একটা হোটেলে বলে রেখেছিলাম, এই দিয়ে গেল। মুর্গির মাংসের নাম শুনলেই তোর জিভে জল আসত, তাই আস্ত একটা রোস্টের কথা বলে রেখেছিলাম। দারুণ রাঁধে ওরা।"

শেষ পর্যন্ত বিমলকে একাই খেতে হল। সত্যিই চমৎকার রান্না। বিমল আবার খাইয়ে মানুষ। চেটেপুটে সব সাবাড় করে দিল। কিন্তু ওর মনের মধ্যে কাঁটার মত কি যেন একটা খচ্ খচ্ করে বিঁধতে লাগল, বাদল ওর কাছে কিছু একটা লুকোচ্ছে।

ওরা আবার বসবার ঘরে ফিরে এল। বিমল আয়েস করে একটা সিগারেট ধরিয়ে প্যাকেটটা বাদলের দিকে এগিয়ে ধরল। বাদল হেসে ঘাড় নেড়ে বলল, ওর ওই অবস্থায় ধূমপান নিষেধ।

"এবার বল্ দেখি কী অ্যাক্সিডেন্ট তোর হয়েছে" বিমল একটু জোর দিয়েই বলল, "আর ব্যাপারটাকে তুই এত রহস্যময় করেই বা তুলছিস কেন?"

বাদল হাসল, একটু যেন ব্যথার হাসি। তারপর বলল, "কাল সব বলব, আজ রাতটা আমরা শুধু ছোটবেলার গল্প করব।" এক মুহূর্ত থেমে ও আবার বলল, "তোর মনে আছে, যখন আমরা ক্লাস সিক্সে পড়ি, চাটুয্যেদের বাগানে পেয়ারা পাড়তে গিয়ে কি কাণ্ড! ওদের মালি তাড়া করতেই আমি গাছের ডাল থেকে লাফিয়ে মাটিতে পড়ে দে ছুট, আর ধরা পড়ে তোর সে কি ভেউ ভেউ কান্না। আমার সঙ্গে দুদিন তুই কথাই বলিসনি। তোর রাগ ভাঙাবার জন্যে আমাকে কম সাধ্য-সাধনা করতে হয়নি।"

অনেকদিন আগের সেই ঘটনা মনে করে দুজনেই হেসে উঠল। অতীতের টুকরো টুকরো হারানো সব স্মৃতি যেন ঝিলিক দিয়ে উঠতে লাগল ওদের মনে। হঠাৎ ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই বিমল বলে উঠল, "আরে, রাত একটা বাজে [illegible] কথায় এত রাত হয়েছে বুঝতেই পারিনি।"

বাদল খুব লজ্জা পেল, বলল, "ছি ছি, তুই সারাদিন ট্রেন জার্নি করে এসেছিস, কোথায় তোকে তাড়াতাড়ি শুতে বলব, না এতক্ষণ বকেই যাচ্ছি।"

"বকছি তো আমিও," বিমল হেসে বলল, "আমরা দুজনেই যেন ছোটবেলায় হারিয়ে গেছি।"

বাদল বিমলকে ওর জন্য নির্দিষ্ট শোবার ঘরে নিয়ে গেল। একটা সিংগল বেডের খাটের ওপর পরিষ্কার বিছানা। বাদলই নিশ্চয় কোন ফাঁকে বিছানা পেতে রেখেছে।

নরম বিছানায় গা এলাবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই নেমে এল ঘুম। কতক্ষণ ঘুমিয়েছিল ঠিক নেই, হঠাৎ একটা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিতে বিমলের ঘুম ভেঙে গেল। নতুন জায়গায়, নতুন পরিবেশে, প্রথমে ওর কিছুই ঠাওর হল না। তারপর আস্তে আস্তে অন্ধকার চোখে সয়ে এল। ঠিক তখুনি এক ফালি চাঁদের আলো ছড়িয়ে পড়ল ঘরে। সেই আলোয় বিমল স্পষ্ট দেখল ওর মাথার কাছে মশারির বাইরে, যেন একটা ছায়ামূর্তি। ওর বুকের ভেতরটা হিম হয়ে গেল, চোর-ডাকাত নয়তো! মনে সাহস এনে ধড়মড় করে ও উঠে বসল, তারপর বলল, "কে"?

"আমি," বাদলের গলা, "দেখতে এসেছিলাম তোর কোন অসুবিধে হচ্ছে কিনা।"

"তোর কি মাথা খারাপ হল নাকি?" বিমল এবার অনুযোগের সুরে বলল, "এত রাতে আমার অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে এসেছিস! আমি যদি ভূত ভেবে ভয়ে হার্ট ফেল করতাম!"

বাদল কিন্তু দু-এক মুহূর্ত কোন জবাব দিল না। যখন ও কথা বলল, মনে হল ও যেন বড় ক্লান্ত, বড় দুঃখী।

"খুব ভোরেই আমাকে বেরুতে হবে," ও বলল, "সারাদিন আমার সঙ্গে আর দেখা হবে না। খাবার টেবিলে টিপটে চা থাকবে খেয়ে নিস।" একটু থেমে ও আবার বলল, "এতদিন পরে তোর সঙ্গে দেখা হল, কী যে আনন্দ হচ্ছে! তোকে একটু যত্ন-আত্যি করতে পারলাম না... তোর সঙ্গে কথা ছিল..."

ও চলে গেল।

কেন জানি একটা বিষণ্নতা বিমলের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলল।

বেশ বেলা করেই ঘুম ভাঙল বিমলের, মুখে রোদ এসে পড়েছে। মুখ ধুয়ে ও খাবার ঘরে গেল, টেবিলের ওপর একটা টিপটে গরম চা, যেন এইমাত্র কেউ বানিয়ে রেখেছে! একটা প্লেটে কয়েকটা বিস্কুট। চা পর্ব শেষ করে ও বসবার ঘরে গিয়ে বসল। সেন্টার টেবিলের ওপর একটা খাম। কৌতূহলী হয়ে ও খামটা তুলে নিল। আরে! খামের ওপর যে ওরই নাম লেখা। খামের ভেতর থেকে চিঠিটা বার করে ও পড়তে লাগল:

"ভাই বিমু,

তুই আমার কাছে এসেছিস, আমার কত আনন্দ! কতদিন পরে আমাদের দেখা...! যখন আমরা ছোট, গ্রামের ছেলে, তখনই দু'জন প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, আমাদের কখনও বন্ধুত্ব বিচ্ছেদ হবে না। আমরা আমাদের প্রতিজ্ঞা পালন করেছি। ভাই বিমু, তোকে কিছুই যত্ন করতে পারলাম না, এ আমার দুর্ভাগ্য। তোকে নিয়ে হৈ-চৈ করার কত সাধ ছিল, কিছুই হল না। তুই এই চিঠিটা পড়বার পর কোলিয়ারির হাসপাতালে গিয়ে ডাঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করিস, তাঁর কাছেই সব জানতে পারবি।

বিদায় বিমু, আমাকে ভুলিস না।

—তোর প্রাণের বন্ধু বাদু।"

চিঠিটা দু-তিনবার পড়ল বিমল, মাথা-মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারল না। বাদলের কি সত্যিই মাথা খারাপ হয়েছে! তা না হলে অত রাত্তিরে বন্ধুর অসুবিধে হচ্ছে কিনা দেখতে কেউ যায়!

যা হোক ও তখুনি বেরিয়ে পড়ল। দু'একজনকে জিজ্ঞেস করে হাসপাতালের পথ ধরল। কোলিয়ারির হস্‌পিটাল, বেশ বড়, আধুনিক সাজ-সরঞ্জামের অভাব নেই।

ডাঃ গাঙ্গুলির সঙ্গে দেখা করে নিজের পরিচয় দিতেই তিনি বললেন, "ও আপনিই বিমলবাবু, বড়ই দুঃখের ঘটনা..."

বিমল হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে দেখে তিনি বললেন, "বুঝেছি, আপনি কিছুই জানেন না, আমার টেলিগ্রাম পাবার আগেই রওনা দিয়েছেন।"

বিমল তখনও বিমূঢ়ের মত তাকিয়ে আছে।

ডাঃ গাঙ্গুলি একটু সময় নিয়ে বললেন, "আপনার বন্ধু পরশু বিকেলে একটা অ্যাকসিডেন্টে মারা গেছেন।"

ডাক্তারবাবুর কথাটার মানে বিমলের মাথায় ঢুকল না। কাল রাতটাই তো ও কাটিয়েছে বাদলের সঙ্গে, পরশু মারা গেছে কথার অর্থ কি! বিদেশ-বিভূঁইয়ে এসে বন্ধু যেন অসুবিধেয় না পড়ে তাই কি শেষ কর্তব্য করে গেল বাদল? সে জন্যই কি অ্যাক্সিডেন্টের কথাটা বার বার এড়িয়ে যাচ্ছিল!

"আমার বাড়িতে মাঝে মাঝেই উনি আসতেন," ডাঃ গাঙ্গুলির কথার ওর চমক ভাঙল, "আপনার কথা প্রায়ই বলতেন, খুব ভালবাসতেন আপনাকে। আপনার টেলিগ্রামটা পেয়ে আনন্দে কি যে করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। ভীষণ উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন। ছেলেমানুষের মত চঞ্চল হয়ে উঠেছিলেন। দুপুরের খাওয়া সেরে আসার পথে আমার সঙ্গে দেখা, বলেছিলেন, ডাক্তারবাবু কাল বিমু আসবে, আপনার বাড়ি নিয়ে যাব। তারপরই ঘটল দুর্ঘটনা। কেমন

করে পা হড়কে গভীর খাদে পড়ে গেলেন। বুকে প্রচণ্ড চোট লেগেছিল। কয়েক ঘন্টা বেঁচে ছিলেন, জ্ঞান ছিল না। প্রলাপ বকছিলেন, শুধু আপনার কথা, আপনাদের ছেলেবেলার কথা...”

বিমল আর শুনতে পারল না, দু’হাতে মুখ ঢেকে ফেলল, কান্নার অদম্য আবেগ ও যেন আর চেপে রাখতে পারছে না। ডাঃ গাঙ্গুলি ওকে কিছুক্ষণ সময় দিলেন, তারপর বললেন, “অ্যাকসিডেন্টাল ডেথ্ তাই এখনও দাহ করা হয়নি, আজই বডিটা আমরা রিলিজ করব। আপনার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন, আপনি ইচ্ছে করলে মুখাগ্নি করতে পারেন।”

“আমাকে একবার ওর কাছে নিয়ে চলুন,” জলভরা চোখে বিমল বলল।

ডাঃ গাঙ্গুলি উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “চলুন”।

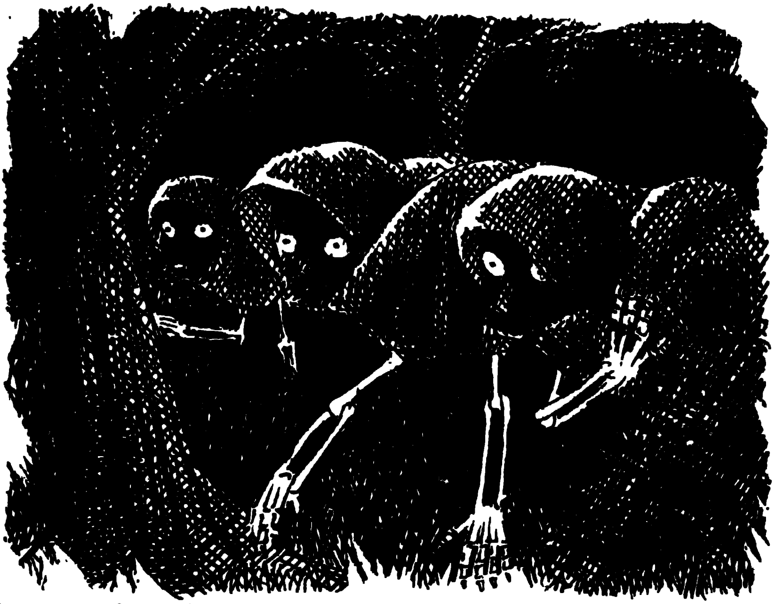
সাদা চাদরে বাদলের দেহ ঢাকা, মুখে কোন ব্যথা বা কষ্টের চিহ্ন নেই, যেন পরম শান্তিতে ঘুমুচ্ছে।

বিমল হাঁটু গেড়ে ওর পাশে বসল, কি ভেবে আস্তে আস্তে চাদরটা ওঠাল। সারা বুকে ব্যাণ্ডেজ, গতকাল সন্ধ্যায় ধানবাদ প্ল্যাটফর্মে ঠিক যেমনটি ও দেখেছিল।

বিমল চাদরটা টেনে দিল। কয়েক মুহূর্ত অপলক দৃষ্টিতে ও তাকিয়ে রইল বাদলের মুখের দিকে, তারপর একসময় হিমশীতল একটা হাত নিজের দু’হাতের মধ্যে তুলে ও বলে উঠল, “ভুলব না... তোকে কোনদিন ভুলব না বাদু।”

ওর কি মনের ভুল! না, সত্যিই ওর কানের পাশে কেউ যেন একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলল।

গুপ্তধনের চাবি / কমল লাহিড়ী



চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ গুম হয়ে বসে রইল অরিন্দম। আজ সারাদিন পরিশ্রমও হয়েছে। তারপর পরিতোষ বলেছিল, ওর সেজদির বাড়িতে নিয়ে যাবে। কিন্তু অফিস থেকে মেসে ফিরে পিসিমার এই চিঠিটাই সব গোলমাল করে দিল।

কিছুই ভাল লাগছে না। চা-টাও ঠাণ্ডা হয়ে গেল। মেসের ঠাকুর চা দিতে এসে চিঠিটা দিয়েছে। পরিতোষটাও এখনো ফিরল না। একটু যে পরামর্শ করবে তার উপায় নেই।

নীল রংয়ের ইনল্যাণ্ডখানা আবার খুলে পড়তে লাগল অরিন্দম। প্রিয়নগর থেকে পিসিমাই লিখেছেন:

পরম কল্যাণবর,

বাবা অমু, এর আগের চিঠিতেও তোমাকে একবার তাড়াতাড়ি আসিতে লিখিয়াছিলাম। কিন্তু ছুটি না পাওয়ায় তুমি আসিতে পার নাই। সব কথা খোলাখুলি লিখিতেও পারি না। তোমার সঙ্গে একবার দেখা হওয়া বিশেষ দরকার। আমার মন ভাল না। যত সত্বর পার একবার আসিও। খুবই বিপদে পড়িয়াছি।

আমার স্নেহাশীর্বাদ নিও। ইতি— পিসিমা।

চিন্তার রেখা ফুটে উঠল অরিন্দমের চোখে-মুখে। একটা কথা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারছে না। এই তো দুমাস আগেই পিসিমার সঙ্গে দেখা করে

এসেছে। নতুন চাকরি। কথায় কথায় তো ছুটি পাওয়া যায় না। হঠাৎ যে পিসিমার কী এমন দরকার পড়ল।

মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই একমাসের ব্যবধানে, বাবা-মা দু'জনকে হারিয়ে অরিন্দম নিঃসন্তান পিসিমার কাছে আশ্রয় পেয়েছিল। পিসেমশাইও খুব ভাল বাসতেন। প্রিয়নগর গ্রাম হলেও, শহরতলির অনেক সুবিধে ছিল। কলকাতার এক বেসরকারি ফার্মে চাকরি করতেন পিসেমশাই। ভালই কাটছিল দিন। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল বেরনোর দিন আবার একটা প্রচণ্ড ধাক্কা এল ওর জীবনে।

গত বছরের ঘটনা। পরীক্ষার রেজাল্ট জেনে খুব তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছিলেন পিসেমশাই। আনন্দ আর উত্তেজনায় একটু অসতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। শিয়ালদহ স্টেশনের সামনে রাস্তা পার হওয়ার সময় দৈত্যের মত বাসটা পিসেমশাইকে চাপা দিয়ে চলে যায়।

পুলিশের কাছে খবর শুনে প্রথমে হতবাক হয়ে গিয়েছিল অরিন্দম। পিসেমশাইর পকেটের ডায়েরি থেকেই ঠিকানা পাওয়া গেছে। খবর শুনে পিসিমা অজ্ঞান হয়ে যান। শেষে অবশ্য সব কিছু পিসিমাই সামাল দেন। শক্ত হাতে হাল ধরে পিসেমশাইর প্রভিডেণ্ড ফাণ্ড ইত্যাদি ব্যবস্থা থেকে শুরু করে, অরিন্দমের এই চাকরিটাও পিসেমশাইর অফিসের লোকজনকে ধরে করে দিয়েছিলেন। প্রিয়নগর থেকে যাওয়া-আসার কষ্ট হবে বলে, কলকাতার মেসে থাকার ব্যবস্থাও করেছিলেন। ধীরে ধীরে সব কিছু অরিন্দমও মানিয়ে নিয়েছিল।

ঠাকুরকে আর এক কাপ চা দেবার কথা বলতে যেতেই পরিতোষের সঙ্গে দেখা হল। ওরা দু'জন এক ঘরে থাকে। চাকরিও এক অফিসে। ঘরে ঢুকেই পরিতোষ বলল, কী রে এখনও রেডি হোসনি, সাড়ে ছ'টা বাজে প্রায়। কথার জবাব না দিয়ে পরিতোষের দিকে পিসিমার চিঠিটা এগিয়ে দিল অরিন্দম।

বোকার মত পিসিমার চিঠিটা হাতে নিয়ে পড়তে শুরু করল পরিতোষ। তারপর অরিন্দমের কাঁধে হাত রেখে বলল, তাহলে তো তোর যাওয়া হবে না। তা এখন কি ট্রেন আছে?

রাত আটটায় একটা গাড়ি আছে। তবে প্রিয়নগর পৌঁছুতে বেশ রাত হয়ে যাবে। তাই ভাবছি।

আর ভেবে কাজ নেই। নিশ্চয়ই পিসিমার কোন বিপদ-টিপদ হয়েছে। চিঠিতে তো সব লেখা যায় না। দেরি না করে তুই বরং আজই বেরিয়ে পড়। একটা দরখাস্ত শুধু লিখে দিয়ে যা। আমি কাল অফিসে বড়বাবুকে দিয়ে দেব।

শেষ পর্যন্ত রাত্রের ট্রেনেই যাওয়া স্থির ঠিক করল অরিন্দম। জিনিসপত্র

একটা ছোট হাত ব্যাগে গুছিয়ে অরিন্দম ঠাকুরের নাম স্মরণ করে রাস্তায় নামল।

নির্দিষ্ট সময় থেকে আধ ঘন্টা দেরি করে ট্রেন ছাড়ল। ওভারহেড তারে কারেন্ট না থাকার ফলে সব ট্রেনই দেরি করে ছাড়ছে। প্রিয়নগর স্টেশনে যখন গাড়ি পৌঁছল তখন রাত সাড়ে এগারোটা বেজে গেছে। রাত্রের ট্রেনে খুব বেশি লোকজন নামে না। আজ নামল শুধু তিনজন। দু'জন যাত্রী এক সঙ্গে কথা বলতে বলতে অরিন্দমের সামনে দিয়ে চলে গেল।

প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে একটু চিন্তা করল অরিন্দম। স্টেশন মাস্টারমশাই-এর ঘরের দরজাও বন্ধ। সামনের দিকে একটা কুকুর কান্নার সুরে ডেকে উঠতে চমক ভাঙল অরিন্দমের। কয়েক পা এগিয়ে গিয়েও থমকে দাঁড়াল। স্টেশনের বাইরে কাঠ-বাদাম গাছটার নিচে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে। মনে সাহস এনে বাদাম গাছটার দিকে পা চালাল অরিন্দম।

আকাশে সরু একফালি চাঁদ ছিল। কিন্তু একখণ্ড কালো মেঘ এসে ঢাকা দিল। স্টেশন থেকে পিসিমার বাড়ি দু'মাইলের মত রাস্তা। কয়েকটা সাইকেল রিকশাও থাকে। আজ ট্রেনের দেরি দেখে বোধহয় চলে গেছে। বাদাম গাছটার কাছে এসে দাঁড়াল অরিন্দম। তারপর সামনের দিকে তাকাতেই চমকে উঠল। না চোখের ভুল তো নয়। বাদাম গাছের আড়াল থেকে ঠিক পিসিমার মত কে একজন সরে গেল। অরিন্দম কিছু বুঝে ওঠার আগেই পিসিমা ওর সামনে এসে বললেন, অমু এলি বাবা। ট্রেনটা যা দেরি করল। মুখপোড়া যতীনটা সেই যে আমাকে রেখে ভাড়া খাটতে গেল আর ফেরার নাম নেই। তা তুই আমার সঙ্গে হেঁটেই চল। এইটুকুন তো রাস্তা পারবি না হাঁটতে! পিসিমার কথা শুনে হেসে ফেলল অরিন্দম। কিন্তু পরক্ষণেই অনেকগুলো প্রশ্ন একসঙ্গে মাথায় ভিড় করে এল। এত রাত্রে পিসিমা স্টেশনে এসেছেন। যতীন অবশ্য ওদের চেনা লোক রিকশা চালায়। ওদের বাড়ির কাছেই থাকে। কিন্তু সেই বা গেল কোথায়?

প্রশ্নগুলো মনের মধ্যে তোলপাড় শুরু করল। পিসিমাকে প্রণাম করতে যেতেই তিনি একটু সরে গিয়ে বললেন, থাক থাক, রাস্তায় প্রণাম করতে নেই। তুই আগে বাড়িতে চল।

তুমি এত রাতে স্টেশনে এলে কেন?

দেখ ছেলের কথা। তোকে চিঠি দিয়েছি না। আমার মন বলছিল তুই আজ ঠিক আসবি। তাই তো যতীনকে নিয়ে রাত্রের ট্রেন দেখতে এলাম। তা সে আবার আমাকে নামিয়ে দিয়ে পলাশপুরে ভাড়া খাটতে গেল। ট্রেন আসার দেরি আছে শুনে আমিও না করিনি।

পিসিমার কথা শুনে মাথার মধ্যে আবার ঝিম-ঝিম করে উঠল। কিন্তু

এখানে দাঁড়িয়ে আর কিছু প্রশ্ন নয়। খিদেও পেয়েছে। ব্যাগটা ভাল করে ধরে একটু হেসেই অরিন্দম বলল, তুমি না সত্যি পাগল। আমি আসতে পারি ভেবে, এই রাত দুপুর অবধি স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছ? নাও আর দেরি না করে চল, আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে।

হ্যাঁ বাবা তাই চল, বাড়ি গিয়েই সব কথা হবে। তোর খাবার আমি ঢাকা দিয়ে এসেছি। অরিন্দমের সঙ্গে বাড়ির দিকে পা চালান পিসিমা।

স্টেশনের সীমানা পেরিয়ে মাটির রাস্তা। পিসিমা আগে আগে হাঁটছেন। অরিন্দমের মনের মধ্যে অনেক কথার ভিড় জমলেও কিছু বলতে পারছে না। কী মনে হওয়ায় পিসিমা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, তোর অফিসে বলে এসেছিস তো অমু। কয়েকদিন এখানে থাকতেও হতে পারে।

হ্যাঁ, পরিতোষের কাছে একটা দরখাস্ত লিখে দিয়েছি। তা তোমার এমন কী দরকার পড়ল একটু খুলে বল তো। অরিন্দম একটু বিরক্তভাবে প্রশ্ন করল।

এবার অরিন্দমের পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে পিসিমা তাঁর বিপদের কথা বলতে লাগলেন। চাপাস্বরে ফিসফিস করে পিসিমা যা বললেন তার কিছুটা অরিন্দম আগেই আন্দাজ করেছিল।

শ্বশুরের আমলের পাঁচটা নবাবী মোহর ছিল পিসিমার কাছে। অরিন্দমকে কয়েকবার দেখিয়েওছেন সে মোহর। এখনকার বাজার-দরে মোহরগুলোর বেশ কয়েক হাজার টাকা দাম হবে। অরিন্দমকে কয়েকবার বলেছিলেন পিসিমা মোহর ক'টা কলকাতায় নিয়ে বিক্রি করে টাকা ব্যাঙ্কে রেখে দিতে। কিন্তু অরিন্দম সে কথায় কান দেয়নি। গত সপ্তাহে পিসিমা নাকি নিজেই একটা মোহর নিয়ে হরেন স্যাঁকরার দোকানে গিয়েছিলেন দাম যাচাই করতে। সেখানে আবার তখন গ্রামের কয়েকটি বখাটে ছেলে বসেছিল। মোহর দেখে হরেন স্যাঁকরা চমকে উঠেছিল প্রথমে। তারপর ছেলেদের দিকে তাকিয়ে, চুপি চুপি মোহরটা পিসিমার হাতে দিয়ে পরে আসতে বলেছিল।

উৎপাত শুরু হল সেই রাত্রি থেকেই। হরেন স্যাঁকরার দোকানের সেই বখাটে ছেলেদের মধ্যে একজন রাজেন, পিসিমার কাছে এসে মোহরের কথা জিজ্ঞাসা করল। আর কলকাতায় গিয়ে বিক্রি করে দেবার কথাও বলল। পিসিমা তো অনেক বকাঝকা করে তাকে তাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু রাজেন পরদিন থেকেই তার দলবল নিয়ে রাত্রে উৎপাত শুরু করল। গ্রামের মাতব্বরদের বলেও ফল হয়নি। পরশু নাকি রাজেন পিসিমাকে ভয় দেখিয়ে গেছে, ওকে মোহর বিক্রি করতে না দিলে পিসিমা খুব বিপদে পড়ে যাবেন। তাই ভয় পেয়ে পিসিমা অরিন্দমকে আসতে লিখেছেন।

কথা শেষ করে পিসিমা বললেন, এখন তুই এসে গেছিস, যা ব্যবস্থা করতে হয় কর।

ওরা যে এরকম করছিল, তুমি সুমনদের দিয়ে পুলিশে খবর দিলে না কেন? সুমন অরিন্দমের স্কুলের বন্ধু। ওর বাবাও পিসেমশাইর বন্ধু ছিলেন। তাই সুমনের নামটা অরিন্দমের মাথায় এল। তাছাড়া বিপদে-আপদে ওরাই তো আগে ছুটে আসে।

একগাল হেসে পিসিমা বলেন, ওমা পুলিস আবার কি করবে। এ সব কথা কি পাঁচকান করতে আছে। ওই রাজেন ছোঁড়াকে আমি টিট্ করে দিয়েছি কথায়। ও আমার আর কিছুই করতে পারবে না। তোর পিসের ছোট সিন্দুকের চাবি আমি লুকিয়ে রেখেছি। মোহরগুলো সেখানেই আছে। তুই বাবা চাবিটা নিয়ে ওগুলো উদ্ধার কর তাহলেই আমার শান্তি। শেষের কথাগুলো বলতে বলতে পিসিমার গলা ধরে এল।

রাগে ঘৃণায় বিষিয়ে উঠল অরিন্দমের মন। দিন দিন দেশটা কী হয়ে উঠছে। অসহায়া বৃদ্ধা মহিলার উপর অত্যাচার করছে বখাটে ছেলেরা আর গ্রামের বয়স্ক লোকেরা তা দেখছে।

কথা বলতে বলতে বাড়ির কাছাকাছি এসে গেল। আবার কয়েকটা কুকুর একসঙ্গে বিশ্রীভাবে ডেকে উঠল। সোজা রাস্তায় না গিয়ে পুপুরের পাশে বাঁশ ঝোপের দিকের রাস্তায় এগিয়ে যাচ্ছেন পিসিমা। কথা না বলে পিছনে হাঁটছে অরিন্দম। বাঁশঝোপের রাস্তা দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে ঢুকল ওরা।

সমস্ত বাড়িটা অন্ধকারে ঢাকা। পকেট থেকে দেশলাই বের করে জ্বেলেই চমকে উঠল অরিন্দম। পিসিমা কোথায় গেলেন। এই তো একটু আগেই পাশে দাঁড়িয়ে কথা বলছিলেন।

পি — সি — মা — কাঁপা-কাঁপা গলায় ডেকে উঠল অরিন্দম।

হঠাৎ সামনের দিকে হাসির আওয়াজ হতে ভয় পেয়ে ঘুরে দাঁড়াল অরিন্দম। বড়ঘরের দরজা ধরে দাঁড়িয়ে পিসিমা তখন ওকেই ডাকছেন, আচ্ছা ভীতু ছেলে তো তুই। উঠোনে দাঁড়িয়ে কী ভাবছিস। এতদিন এ বাড়িতে কাটালি আজ কি সব নতুন ঠেকছে! আয় ঘরে আয় — আমি তোর খাবার আনছি।

পিসিমা যে কখন গিয়ে ঘরের দরজা খুললেন সেটা বুঝে উঠতে পারে না অরিন্দম। ট্রেন থেকে প্রিয়নগরে নামার পর থেকেই একের পর এক অদ্ভুত সব কাণ্ড ঘটছে আজ। আর কিছু ভাবতেও পারছে না অরিন্দম।

ঘরে ঢুকে ব্যাগ থেকে একটা মোমাবাতি বের করে ধরাল। গ্রামে আসার জন্যই সঙ্গে এনেছিল। মোমবাতি জ্বেলে মুখ তুলতেই আবার চমকে উঠল। ঘরে তো পিসিমা নেই। এবার খুবই ভয় পেয়ে গেল ও যদিও এখানকার সবই চেনা। ছোটবেলা থেকে এই ঘরে পিসিমার কাছে থেকেছে কিন্তু আজ পিসিমার হাঁটাচলা কথাবার্তা সবই যেন কেমন ধোঁয়াটে লাগছে।

মোমবাতি হাতে বাইরের বারান্দায় আসতেই আর একদফা চমক। হাতে

খাবারের থালা নিয়ে পিসিমা ওর দিকে তাকিয়ে আছেন। রান্নাঘরের দরজাটাও খোলা। এবারে হেসে ফেলল অরিন্দম। পিসিমা যে ওরই জন্য খাবার আনতে রান্নাঘরে গেছেন সেই কথাটাই মনে পড়েনি।

পিসিমার মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে নিচে নামে অরিন্দম। লেবুতলা পেরিয়ে পাতকুয়া থেকে জল তুলে মুখ হাত ধুয়ে আবার ঘরে ঢোকে। খাবারের থালা সাজিয়ে পিসিমা তক্তপোষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চারখানা রুটি-তরকারি। একবাটি দুধ আর কলাও রয়েছে। রুটি ছিঁড়ে মুখে দিয়ে অরিন্দম বলল, তোমার খাবারটাই দিয়ে দিলে তো?

ওমা আমার যে একাদশী আজ। এগুলো তোর জন্যই করে রেখেছি। তাড়াতাড়ি খেয়ে নে। আরও কথা আছে। আমি যাই রান্নাঘরটা বন্ধ করে হাত ধুয়ে আসি। ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন পিসিমা। এক ঝলক ঠাণ্ডা শীতল হাওয়া এসে ঝাপটা মারল অরিন্দমের চোখে-মুখে।

খিদেও পেয়েছিল। চারখানা রুটি তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে গেল। পিসিমা তো অনেকক্ষণ গেছেন। জলের গ্লাস হাতে নিয়ে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়ে পড়ল অরিন্দম। রান্নাঘরের পাশে, ঘোড়া নিমগাছটার কাছে দাঁড়িয়ে পিসিমা যেন কী করছেন। আস্তে আস্তে বারান্দা থেকে নিচে নেমে একটু জোরে অরিন্দম বলল, অন্ধকারে ওখানে কি করছ পিসিমা?

অরিন্দমের ডাক শুনে ঘুরে তাকালেন পিসিমা। তারপর কয়েক পা এগিয়ে এসে বিষণ্ণ করুণ সুরে বললেন, না রে নিতে পারেনি। যেমন রেখেছিলাম তেমনি আছে। তুই একটু এগিয়ে আয় অমু।

প্রায় যন্ত্রচালিতের মত এবার পিসিমার দিকে এগিয়ে যায় অরিন্দম। ঘোড়া নিমগাছের কাছে গিয়ে ফিস-ফিস করে পিসিমা বলেন, ওই যে উঁচুমত জায়গাটা দেখছিস, সিন্দুকের চাবিটা ওখানেই আছে। মাটি খুঁড়ে তুই ওটা বের করে নে অমু। আর দেরি করিস না।

কথাগুলো বলেই নিমেষের মধ্যে যেন হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন পিসিমা। নিমগাছের ডালটাও হাওয়ায় দুলে উঠল। একটা হিম শীতল হাওয়া আবার অরিন্দমের মুখে লাগল। নিমগাছের উপর পাখির ডানা ঝাপটানোর শব্দ হল। অরিন্দমের কানে তখন পিসিমার চাপাস্বরে বলা কথাগুলোই বাজছে। ভয়ে উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে এবার পি-সি-মা বলে ভীষণ জোরে ডেকে উঠল অরিন্দম। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই কুকুরের কান্নার আওয়াজ ভেসে এল। নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না অরিন্দম। জ্ঞান হারিয়ে টলে পড়ে গেল মাটিতে।

আস্তে আস্তে ভোরের আলো উঁকি দিচ্ছে। অনেক চেষ্টা করেও চোখ দুটো খুলতে পারছে না অরিন্দম। মাথাটা ভীষণ ভারি। ঘরের মধ্যে যেন কথার শব্দ। মনে জোর এনে ধীরে ধীরে চোখ মেলে তাকাল অরিন্দম। মাথার কাছেই

সুমন বসে আছে। পাঁচুকাকা শিবেন জেঠু আরও কয়েকজন দাঁড়িয়ে কী যেন বলছেন। বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে বিছানায় বসতেই চাপা গুঞ্জন ভেসে উঠল ঘরে। শিবেন জেঠুই এগিয়ে এলেন অরিন্দমের কাছে।

বোকার মত তাঁর মুখের দিকে তাকাতে মাথায় হাত দিয়ে সান্ত্বনার সুরে শিবেন জেঠু বললেন, শক্ত হও অমু, এখন তোমার অনেক কাজ।

ধরমড় করে উঠে বসে চিৎকার করে উঠল অরিন্দম, কী হয়েছে সুমন— আমার পিসিমা কোথায়? অরিন্দমের দিকে তাকিয়ে অন্যদিকে মুখ ঘোরাল সুমন। শিবেন জেঠু এগিয়ে এসে অরিন্দমকে ধরে ফেললেন।

সুমন আর শিবেন জেঠুর কাছেই ঘটনাটা শুনল অরিন্দম। পিসিমার সব কথাই ঠিক। রাজেন নাকি সেই মোহরের জন্য ক'দিন পিসিমাকে ভয় দেখিয়েছিল। তবে এতবড় অঘটন সে ঘটে যাবে সে কথা কেউ ভাবেনি। কাল দুপুরের দিকে রাজেন নাকি পিসিমার কাছে এসে মোহরের কথা বলে। এক কথা দুই কথায় পিসিমা চিৎকার করে উঠতেই দুই হাত দিয়ে রাজেন পিসিমার গলা টিপে ধরে। পিসিমাও গায়ের জোরে লড়ছিলেন। গলা ছেড়ে রাজেন পিসিমাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দেয়। চিৎকার শুনে লোকজন ছুটে আসে। রাজেন তখন পালিয়েছে। কিন্তু প্রচণ্ড উত্তেজনায় পিসিমা হার্টফেল করে মারা যান।

পুলিশও এসেছিল। তবে ডাক্তারবাবু আর পঞ্চায়েত প্রধানের জন্য কোন ঝামেলা হয়নি। শিবেন জেঠুই সব ব্যবস্থা করেছেন। সুমন-কল্যাণ-পলাশদের নিয়ে পিসিমার দেহ কাল রাত্রে দাহ করা হয়েছে। অরিন্দমকে খবর দিতেও লোক পাঠিয়েছেন কলকাতায়।

সব কথা শুনে আবার চিৎকার করে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে হয়েছিল অরিন্দমের। কিন্তু তার আগেই সুমন বলল, কাল যখন রাত তিনটের সময় আমরা পিসিমাকে দাহ করে বাড়িতে ফিরে আসছিলাম, তখনই তোকে ঘোড়া নিমগাছতলার কাছে পড়ে থাকতে দেখি। কিন্তু তুই গ্রামে এলিই বা কখন আর ওই ঘোড়া নিমগাছের কাছে গিয়েছিলিই বা কেন?

সুমনের কথার জবাব না দিয়ে এবার তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে নামে অরিন্দম। তারপর সবাইকে অবাক করে— পাগলের মত ছুটে যায় সেই ঘোড়া নিমগাছের কাছে। একটা লাঠি নিয়ে মাটির ঢিপিটা খুঁড়তেই একটা ছোট মত কৌটো বেরিয়ে পড়ে। উত্তেজনায় কাঁপতে কাঁপতে কৌটোর মুখটা খুলতেই একটা চাবি দেখতে পায় অরিন্দম।

চাবিটা বুকের কাছে ধরে এতক্ষণে অরিন্দম ছোট্ট ছেলের মত ফুলে ফুলে কাঁদতে থাকে। ❑

ভূতের টিকি/ সুনীল জানা



তিন্নিকে তো চেন না তোমরা। তার মাথায় কখন যে কি খেয়াল চাপে, তার ঠিক নেই। আর একবার যদি চাপে তো, ব্যস্— পাগল করে ছাড়ে সবাইকে। নিজে যেমন একটা পাগল,— থুড়ি, তিন্নির সামনে কিন্তু ওসব বলতে নেই একেবারে।

এই দেখ না, ক'দিন ধরে কী আরম্ভ করেছে তিন্নি। ওদের বাড়ির দোতলায় পাখি পোষে রুমনিদি। চারতলার মুন্নাদিরা পোষে খরগোস। তাই দেখে তিন্নিরও শখ চাপল অমনি। তাকেও একটা কিছু পুষতে হবে, নইলে আর বোধহয় মান থাকে না তার।

ছোটবেলায় তিন্নি অবিশ্যি একটা ভাঙা লাঠি পুষেছিল কিছুদিন। উঁহু, হেস না শুনে। ওটা ছিল ওর দাদুর লাঠি। লাঠির মুখটা এক্কেবারে একটা ঘোড়ার মুখের মত। সেটাকেই নিজের বাটি থেকে দুধ খাওয়াত তিন্নি, নিজের পাশে শোয়াত, চোখে চোখে রাখত সবসময়। তবে এখন তো তিন্নি অনেক বড় হয়েছে। ইস্কুলে যাচ্ছে। টিফিন খাচ্ছে। তিন্নি বোঝে, এখন আর ওসব ওকে মানায় না। দারুণ বুদ্ধিমতী মেয়ে কিনা!

কিন্তু কিছু একটা পোষা চাই তো তার। কী পোষে, কী পোষে— কয়েক দিন কিছুতেই ঠিক করতে পারে না তিন্নি। তারপর একদিন সক্কালবেলা— তার বাবা যখন ব্যস্ত হয়ে অফিস বেরোচ্ছেন, তিন্নি হঠাৎ কোত্থেকে ছুটে এসে বলল আমার জন্যে একটা ভূত নিয়ে এস, বাবা। আমি ভূত পুষব।

বাবা আজকাল আর তিন্নির কথায় বিশেষ চমকান না। রোজ রোজ কত আর চমকাবেন। তিন্নির উদ্ভুট আজগুবি সব কথা শুনতে শুনতে তাঁর এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। তবু তিনি যেন চোখ একটু কপালে তুললেন। এমনটা তিনি কখনও শোনেননি। তিন্নির দিকে তাকিয়ে তিনি মুচকি হেসে বললেন, কেন? হাতি, ঘোড়া, বাঘ, ভাল্লুক, এরা সব কি দোষ করল?

তুমি আমাকে ঠাট্টা করছ?

বাবার গলার স্বর তিন্নি ঠিক ধরে ফেলেছে। বাবা তাড়াতাড়ি জিভটিভ কেটে বলে উঠলেন, আরে না না। আমি বলছিলাম, বনে-জঙ্গলে কোথায় সব ঘুরে বেড়ায় বেচারারা। পেট ভরে খেতে পায় না ভাল করে। ওদের একটা ধরে এনে পুষলে ভাল হত না?

তিন্নি যেন সাড়ে পাঁচ বছরের পাকা গিন্নি। উত্তরটাও দিল ঠিক তেমনি ভাবে, আহা— কি যে বল। ঘরে এত জায়গা কোথায়?

ওহ্ হো, তাও তো বটে। বাবা গায়ে জামা গলাতে গলাতে বললেন, একটা বাঁদর-টাঁদর দিব্বি পুষলে পার। ওরা তো প্রায় তোমার সাইজেরই।

মা চুপটি করেছিলেন এতক্ষণ। হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলে উঠলেন, শুধু সাইজে নয়, স্বভাবেও। দিনদিন যা বাঁদর হচ্ছে ছেলে-মেয়েগুলো নতুন করে আর বাঁদর পুষতে হবে না।

তিন্নি কি বুঝল কে জানে। আড়চোখে একবার পড়ার টেবিলে দাদার দিকে তাকাল। দাদাও ওদিক থেকে মিটমিট করে তাকিয়ে আছে তিন্নির দিকে। তিন্নি অমনি মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, বাঁদরগুলো বড় বাঁদরামি করে, বাপি। হাত থেকে জিনিস কেড়ে খায়। বাঁদর আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না।

তিন্নি যে কার কথা বলল, কে জানে।

তিন্নির দাদাও সঙ্গে সঙ্গে ফোড়ন কাটল, না বাবা, আর বাঁদর এন না। আমাকে কাল যা খিমচে দিয়েছে তিন্নি। ব্যস্ আর যায় কোথা। তিন্নি অমনি প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ল দাদার উপর, তুই আগে আমাকে চিম্‌টি কাটিস্ নি?

তুমি আমার ঘুড়ি ছিঁড়িস নি?

তুই আমার পুতুলের মুখে গোঁফ আঁকলি কেন?

তুই আমার টিফিন বাক্স ভাঙলি কেন?

তুই আমাকে তাড়কা রাক্ষুসি বলবি কেন?

তুই আমাকে ভুঁড়ো শেয়াল বলবি কেন?

এ বলে, বেশ করেছি বলেছি। আবার বলব।

ও বলে, বেশ করেছি বলেছি। আবার আবার হাজারবার বলব।

এই ঝগড়ার ফাঁকে বাবা তো অফিস পালালেন কোনরকমে। কিন্তু পালিয়ে

আর যাবেন কোথায়। সন্ধেবেলা যেই না বাড়ি ফিরেছেন, অমনি একেবারে ছেঁকে ধরল তিন্নি, কই বাবা, আমার ভূত কোথায়? ভূত আন নি?

না এনে উপায় আছে! এই নাও।

ব্যাগ থেকে বাবা কালো ভূতের মত একটা পুতুল বার করে দিলেন। কিন্তু গুণবতী মেয়েকে এখনও চেনেন না তো। পুতুলটা হাতে নিয়েই তিন্নি চেঁচিয়ে উঠল, এমা— এটা তো পুতুলভূত। এটা আবার কেউ পোষে নাকি? তুমি জ্যান্ত ভূত এনে দাও বাবা। আমি জ্যান্ত ভূত পুষব।

বাবা তখন জামাটামা ছাড়েননি, মুখহাত ধোননি, চা-টা খাননি। ভূতের ঠেলাতে অস্থির হয়ে ধপাস্ করে বসেই পড়লেন সামনের সোফাটিতে। কী অদ্ভুত মেয়ে রে বাবা। পারলে ঠাস্ করে এক চাঁটি লাগান। কিন্তু তারপর পাড়া মাত করে যা কাণ্ড বাধাবে তিন্নি, তাতে ভূত-প্রেত যে যেখানে আছে, সব পালাবে বাড়ি ছেড়ে। প্রাণের দায়ে তিন্নিকে বাবা বোঝাতে লাগলেন, জ্যান্ত ভূতগুলো ভারি বিচ্ছিরি যে। দেখলেই তো ভয় পাবে তুমি।

ইস্ কক্‌খনো না। দাদার মত ভীতু নাকি আমি?

তিন্নির কথায় অমনি যেন ছ্যাঁকা লাগল দাদার গায়ে। সে তড়বড়িয়ে বলে উঠল, তবে যে কাল রাতে আয়নায় ছায়া দেখে চেঁচিয়ে উঠেছিলি?

বারে, সেটা তো তোর ছায়া।

মোটেই না। সেটা তোর ছায়া। যা কালোকুলো বিচ্ছিরি!

ভাগ্— আমি কালো না তুই কালো?

তুই তো কালো, কালীঠাকুরের মত কালো।

তুই ভাতের হাঁড়ির মত কালো।

তুই ছাতার মত কালো।

তুই কোটের মত কালো।

তুই রেডিওর মত কালো।

তুই টেবিলের মত কালো।

ঘরের চারপাশে তাকিয়ে যে যা কালো দেখতে পাচ্ছে, এক নিঃশ্বাসে বলে যাচ্ছে পরপর। সেই সুযোগে বাবা জামাকাপড় ছাড়লেন, মুখহাত ধুলেন, মা খেতে দিলেন বাবাকে। তখনো ভাইবোনের ঝগড়া থামেনি। বাবা বললেন, ঢের হয়েছে। এই নে, ডিমভাজা খাবি আয়। গলায় আরও জোর পাবি। ঝগড়া ফেলে তিন্নি অমনি ছুটল বাবার কাছে। দাদাকে শাসিয়ে গেল, দাঁড়া, আমার ভূতটা আসুক আগে। তোকে মজা দেখিয়ে দেব।

দাদাও বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বলল, কচু। আমি তখন রাক্ষস পুষব একটা।

তিন্নি বলল, আমিও তখন খোক্ষস পুষব একটা—

আবার ভাইবোন ঝগড়া বেধে যায় দেখে বাবা তিন্নিকে টেনে নিলেন

তাড়াতাড়ি। চটপট তার মুখে ডিমভাজা ঢুকিয়ে দিলেন একটুকরো। ব্যস্, ঝগড়া বন্ধ তখনকার মত।

সন্ধেবেলা দিদিমণি এলেন তিন্নিকে পড়াতে। বাবা হাসতে হাসতে দিদিমণিকে বললেন, শুনেছেন আপনার ছাত্রীর কথা? ওর শখ হয়েছে, ভূত পুষবে।

বাহ্— সে তো খুব ভাল কথা। দিদিমণি তিন্নির দিকে মিষ্টি হেসে বললেন, ভাগ্যি ভাল, তিন্নি চাঁদ সূয্যি কিছু একটা পুষতে চায়নি। তাহলে যে কী দশা হত আমাদের।

যা বলেছেন। বাবা হো হো করে হাসতে লাগলেন। একটু দম নিয়ে বললেন, কিন্তু একটা ভূত এখন জোগাড় করি কোত্থেকে বলুন তো? আপনার চেনাশোনা আছে কোনো?

তা আছে আয়না-ভূত একটা। তিন্নির সামনে একটা আয়না এনে ধরলেই— বলতে বলতে দিদিমণি কেমন যেন চোখ মট্‌কে তাকালেন ওর দিকে। ব্যাপারটা কেমন কেমন লাগল তিন্নির। দাদার দিকে তাকিয়ে দ্যাখে, সে মিটিমিটি হাসছে! দিদিমণি বলছেন, কিন্তু তিন্নির কি পছন্দ হবে সেটা?

সেই তো মুশকিল। পছন্দসই একটা ভূত কোথায় পাওয়া যায় বলুন দেখি।

বাবার কথা শুনে তিন্নি পরিষ্কার বুঝতে পারল, হাসি চেপে বাবা প্রাণপণে গম্ভীর হতে চেষ্টা করছেন। দিদিমণি বললেন, আপনি একটা কাজ করুন বরং। 'ভূত চাই' বলে খবরকাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিন। তোমার কেমন ভূত চাই— বাবাকে বলে দাও তো তিন্নি। বেড়ে ভূত, ধেড়ে ভূত, হেঁড়ে ভূত, ধুমসো ভূত, চিমসে ভূত, মোট্‌কা ভূত, পট্‌কা ভূত—

এসব আবার কী! তিন্নি তো জন্মেও এসব ভূতের নাম শোনেনি। সে ফ্যাল্‌ফ্যাল করে দিদিমণির মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তাকিয়ে তাকিয়ে ভূতের নামকীর্তন শুনতে লাগল। দিদিমণি বলতে লাগলেন, ভূতের অভাব কি? কটা ভূত চাই, কেমন ভূত চাই— বলে ফেল না। সোজা ভূত, উলটো ভূত, পালটা ভূত, গোমড়া ভূত, কুমড়ো ভূত, উচ্ছে ভূত, তুচ্ছ ভূত—

বাপ্‌রে, দিদিমণিকেই হঠাৎ যেন ভূতে পেয়ে বসেছে। একটু বোধহয় ঘাবড়ে গেল তিন্নি, চোখ গোল গোল করে তাকাল দিদিমণির দিকে। তারপর ফিসফিস করে বলল, আমার একটা বাচ্চা ভূত চাই— বেশ শান্তশিষ্ট—

হ্যাঁ হ্যাঁ, তাও আছে। তিন্নিকে উৎসাহ দিয়ে দিদিমণি আবার বলতে শুরু করলেন, বাচ্চা ভূত, কাচ্চা ভূত, খোকা ভূত, বোকা ভূত, হেসো ভূত, কেসো ভূত, পোষা ভূত, খোসা ভূত—

বলতে বলতেই অদ্ভুত কাণ্ড! হঠাৎ ঝপ্ করে অন্ধকার হয়ে গেল।

বাবা বললেন, এই যাহ্, আবার লোডশেডিং আরম্ভ হল।

দিদিমণি বললেন, উহুঁ, এ নির্ঘাৎ ভূতুড়ে কাণ্ড। কেমন ভূত ভূত গন্ধ পাচ্ছি যেন। অন্ধকারেই দিদিমণি দিব্বি টের পেলেন, তিন্নি দু-হাত দিয়ে জোরে আঁকড়ে ধরেছে তাকে। অমনি বলে উঠলেন, উঃ, ছাড়ো, ছাড়ো, আমার যে লাগছে তিন্নি। আরে আরে— পায়ের তলায় সুড়সুড়ি দেয় কে আবার? নাম ধরতে না ধরতেই সঙ্গে সঙ্গে সব হাজির হয়ে গেল নাকি? সবাই রামনাম করুন—

আর রামনাম! অন্ধকারে তিন্নির গলা দিয়ে একটা অস্ফুট শব্দ শোনা গেল শুধু। তারপর কোথায় তিন্নি? শূন্যে হাওয়া হয়ে গেল, নাকি ভূতে নিয়ে গেল মেয়েটাকে?

আলো-টালো জ্বেলে তিন্নিকে এঘর-ওঘর অনেক খোঁজা হল। তিন্নি কোত্থাও নেই! কি হবে এখন?

হঠাৎ খাটের তলায় চোখ পড়ল দাদার। আরে! ওটা ওখানে কে রে? তিন্নি নাকি?

হ্যাঁ, তাইতো। তিন্নি বলেই মনে হচ্ছে যেন। বেরিয়ে আয় বেরিয়ে আয়। ভূতের ভয়ে খাটের তলায় লুকিয়েছিস শেষকালে?

ধন্যি মেয়ে তিন্নি। হামা দিয়ে খাটের তলা থেকে বেরিয়ে আসতে আসতে বলল, মোটেই ভয় পাইনি আমি। ওখানে ভূত ধরছিলাম।

এ্যাঁ, বলিস কি? ভূত ধরছিলি? কই ভূত? কোথায় ভূত?

তিন্নির কথায় সবাই যেন হাঁ হাঁ করে উঠল। নির্বিবাদে জামার ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে তিন্নি বলল, একটা প্রায় ধরেই ফেলেছিলাম। আলো দেখেই পালিয়ে গেল হাত ফস্‌কে। এই দেখ না—

কী দেখাচ্ছিস? এক বাক্যে সব্বাই জিজ্ঞেস করে উঠল, তোর হাতে কী ওটা লম্বা কালোপনা? ছেঁড়া ন্যাকড়া? দড়ির টুকরো? নাকি পাখির পালক?

তিন্নি ঠোঁট উলটে বলল, উহুঁ, ওটা ভূতের টিকি। আমার হাতে ছিঁড়ে থেকে গেছে। ❑



নিশি কবরেজ/ শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়



হারানো একটা পুঁথিতে নিশি কবরেজ একটা ভারি জব্বর নিদান পেয়েছেন। গাঁটের ব্যথার যম। তবে মুশকিল হল পাচনটা তৈরি করতে যে পাঁচরকম জিনিস লাগে তার চারটে যোগাড় করা যায়। কিন্তু পাঁচ নম্বরটাই গোলমেলে। পাঁচ নম্বর জিনিসটা হচ্ছে আধ ছটাক ভূত।

নিশি কবরেজ রাতে খাওয়ার পর দাওয়ায় দাঁড়িয়ে আচমন করছিলেন। ঘুটঘুট্টি অন্ধকার রাত্রি। চারদিক নিঝুম। শীতকালের কুয়াশা আর ঠাণ্ডাটাও জেঁকে পড়েছে। আঁচাতে আঁচাতে নিশি কবরেজ পাচনটার কথাই ভাবছিলেন। রাজবল্লভবাবু বিরাট বড়লোক! কিন্তু গাঁটের ব্যাথায় শয্যাশায়ী। ব্যথাটা আরাম করতে পারলে রাজবল্লববাবু হাজার টাকা অবধি দিতে রাজি বলে নিজে মুখে কবুল করেছেন। কিন্তু ভূতটাই সব মাটি করলে। আধ ছটাক ভূত এখন পান কোথায়? হঠাৎ নিশি কবরেজের মনে হল, উঠোনের ওপাশটায় হাঁসের ঘরের পাশে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে।

—কে রে? ওখানে কে?

কেউ জবাব দিল না।

নিশি কবরেজ জলের ঘটিটা ঘরে রেখে হ্যারিকেন আর লাঠিগাছটা তুলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন। দিনকাল ভাল নয়। চোর ছ্যাঁচড়ের দারুণ উপদ্রব। ঘরে কিছু কাঁচা টাকাও আছে। সোনাদানাও মন্দ নেই।

বাঁহাতে হ্যারিকেনটা তুলে ডানহাতের লাঠিটা নাচাতে নাচাতে কয়েক পা এগোতেই উঠোনের ওপাশ থেকে একটু গলা খাঁকারির বিনয়ী শব্দ হল। চোরের তো গলা খাঁকারি দেওয়ার কথা নয়।

—কে রে? ওখানে কে?

ওপাশ থেকে খোনাসুরে জবাব এল। ইয়ে, আমি হলুম গে রামহরি—না, না, থুড়ি আমি হলাম ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ আলোটা ভাল করে তুলে ধরে লোকটাকে দেখার চেষ্টা করতে করতে বললেন, রামহরি বা ধনঞ্জয় নামে এ গাঁয়ে আবার কে আছে? কোথা থেকে আসা হচ্ছে শুনি। দরকারটাই বা কি? রুগী দেখতে হলে রাতে বিশেষ সুবিধা হবে না বলে রাখছি। দিনের বেলা এস।

কে যেন বলে উঠল, আজ্ঞে ওসব কিছু নয়।

নিশি কবরেজ লোকটিকে ঠিক ঠাহর করতে পারলেন না। ওর চোখের জোর কিছু কম নয়। হ্যারিকেনেও কালি পড়েনি তবু ভাল মতো লোকটাকে দেখতে পাচ্ছেন না। শুধু বুঝতে পারছেন, হাঁসের ঘরের পাশে খুব কালো একটা লম্বাপানা ছায়া ছায়া কী যেন।

নিশি কবরেজ মনে মনে ভাবলেন, এবার চোখের বোধহয় বারটা বাজল এতদিনে। না, কাল থেকে চোখে তিন বেলা ত্রিফলার জল দিতে হবে।

নিশি কবরেজ বললেন, রুগীর ব্যাপার নয় তো এত রাতে চাও কি? চোর-টোর নও তো বাপু?

—আজ্ঞে না, চোর-ডাকাত হওয়ার উপায়ও নেই কিনা। একটা সমস্যা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলুম আজ্ঞে।

—সমস্যাটা কি?

—আজ্ঞে বলে দিতে হবে যে আমি রামহরি, না ধনঞ্জয়। নিশি কবরেজ খ্যাঁক করে উঠে বললেন, ইয়ার্কি হচ্ছে? তুমি রামহরি না ধনঞ্জয় তা আমি কি করে বলব? আমি তোমাকে চিনিই না।

—আজ্ঞে আপনি আমাদের চেনেন—থুড়ি—চিনতেন। আমরা দুজনেই গেল বার ওলাউঠায় মরলুম, মনে নেই? আপনার পাচন ফেল মারল।

নিশি কবরেজ আঁতকে উঠে বললেন, তোমরা? ওরে বাবা!

—আজ্ঞে ভয় খাবেন না। আমরা ভারি দুর্বল জিনিস।

নিশি কবরেজ কাঁপতে কাঁপতে বললেন, পাচনের দোষ নেই বাবা, সবই কপালের ফের। আমাকে তোমরা মাপ কর।

—আজ্ঞে সেজন্য আপনাকে আমি দুষতে আসিনি। ভয়ের কিছু নেই। কিন্তু সমস্যা একটা দেখা দিয়েছে। ভূত হওয়ার পর আমরা সব কেমন যেন ধোঁয়াটে মার্কা হয়ে গেলুম। শরীর-টরীর নেই, তবু কি করে যেন আছি।

তা. আমরা অর্থাৎ আমি আর ধনঞ্জয়— মানে আমি আর রামহরি— মানে কে যে কোন জন তা বলা মুশকিল— তা আমরা দুজন খুব মাখামাখি করি। খুব বন্ধুত্ব ছিল তো দুজনে। এ ওর শরীরে ঢুকে যাই, ও এর শরীরে মিশে যাই। কিন্তু এই মাখামাখি করতে গিয়েই কে যে কোন জন তা গুলিয়ে গেছে।

—বল কি?

—আজ্ঞে সেই কথাটাই বলতে আসা। দুজনে প্রায়ই ঝগড়া লেগে যাচ্ছে। কখনও আমি বলি যে, আমি রামহরি, ও ধনঞ্জয়। কখনও ও বলে যে, ও রামহরি আর আমি ধনঞ্জয়।

নিশি কবরেজ এই শীতেও ঘামছিলেন। হাতের হ্যারিকেন আর লাঠি দুই-ই ঠকঠক করে কাঁপছে। পেটের ভেতরে গুড়গুড় করছে। মাথা ঘুরছে। কিন্তু হঠাৎ তাঁর মনে পড়ে গেল, গাঁটে ব্যাথার পাচনটার জন্য আধ ছটাক ভূত লাগবে।

নিশি কবরেজ এক গাল হাসলেন। তাঁর হাত পায়ের কাঁপুনি বন্ধ হল। গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, এ আর বেশি কথা কি? তবে এখন তোমার যেমন বেগুন পোড়ার মত চেহারা হয়েছে তাতে তো কিছু বোঝবার উপায় নেই। একটু ধৌতি দরকার। বেশি কষ্ট হবে না। একটা পাচনের মধ্যে মিনিট দশেক সেদ্দ করে নেব তোমাকে, তাতেই আসল চেহারাটা বেরিয়ে আসবে।

বটে! বলে কালো জিনিসটা এগিয়ে এল।

নিশি কবরেজ আর দেরি করলেন না। নিশুত রাতেই পাচনটা উনুনে বসিয়ে কোমর বেঁধে লেগে গেলেন। ভূতটা সেদ্ধ হতে হতে মাঝেমাঝেই মাথা তুলে বলে, হল?

নিশি কবরেজ অমনি কাঠের হাতাটা দিয়ে সেটাকে ঠেসে দিয়ে বলেন, হচ্ছে হে হচ্ছে হে হচ্ছে। তাড়াহুড়ো করলে কি হয়? তোমার তো আর গায়ে ফোস্কা পড়ছে না হে!

পাচনটা ভোররাতে তৈরি হয়ে গেল। আর আশ্চর্যের বিষয় ভূতেরি ঝুলকালো রংটাও একটু ফ্যাকাসে মারল। নিশি কবরেজ খুব ভাল করে জিনিসটাকে নিরীক্ষণ করে বললেন, আরে, তুমি তো রামহরি!

ভূতটা একথায় ভারি খুশি হয়ে বলল আজ্ঞে বাঁচালেন, ধনঞ্জয়ের কাছে রামহরি গোটা তিনেক টাকা পেত কিনা। ভারি দুশ্চিন্তা ছিল আমার। পেন্নাম হই আজ্ঞে। বলে ভূতটা হাওয়ায় মিশে গেল।

নিশি কবরেজ পাচনটা বোতলে পুরে নিশ্চিন্ত মনে তামাক খেতে বসলেন, বড্ড ধকল গেছে। ❑

—— * ——

কুহেলি রাতের সহযাত্রী/ সুব্রত রাহা



দিনটা ছিল মেঘ আর কুয়াশায় ঢাকা। থেকে থেকে বৃষ্টি। হাওয়ায় হাড়কাঁপানো ঠাণ্ডা। উত্তরবঙ্গে কয়েকদিনের জন্যে বেড়াতে আসা। পাহাড়, নদী আর জঙ্গল একই সঙ্গে তিনটি প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের মিলন দেখতে শুভ্র, কাঞ্চন আর রঞ্জন ওরা তিন বন্ধু পরীক্ষার পর বেড়াতে বেরিয়েছে। শুক্‌না ফরেস্টের ডাক বাংলো-র বারান্দায় বসে আকাশের দিকে তাকিয়ে মাঝে মাঝে টুকরো কথা বলছিল, কখনও গুন গুন করে গান গাইছিল ওরা। রঞ্জনের গানের গলা ভাল। কাঞ্চন বলল, 'এবার একটা বর্ষার গান ধর।' রঞ্জন 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে' থামিয়ে বলে, 'ধ্যুৎ, এটা কি বর্ষাকাল। ভরা ফাল্গুন।' শুভ্র আকাশের দিকে চেয়ে বলে, 'তবে তাই হোক।'

রঞ্জন বলে, 'মাইরি কালকের লোকটার কথা আমি কিছুতে ভুলতে পারছি না।'

—'আমরাও না।' শুভ্র আর কাঞ্চন একসঙ্গে বলে।

—'দেখ আজ যাওয়ার আগে আবার লোকটা আসে কি না।' রঞ্জন বলল।

হঠাৎ কাল বিকেল বেলায় এক বৃদ্ধ পাগল এই জঙ্গলের ধারে তাদের তিন বন্ধুকে ধরেছিল। বহুদিনের পুরনো কোট প্যান্ট, মাথায় একটা ফৌজি টুপি, পায়ে ধূসর একজোড়া বুট। মুখে ছিল একটা আধপোড়া চুরুট। —'হ্যালো ইয়ংমেন, হোয়ার ইউ আর গোয়িং'—।

কাঞ্চন, শুভ্র আর রঞ্জনকে টেনে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে বলে, 'ধোস্ একটা পাগলার সঙ্গে কথা বলে বিকেলটা মাটি করিস না তো। চল ঐ ধারটা ঘুরে আসি। সন্ধে হয়ে আসছে।'

পাগল সাহেবও পিছন পিছন হাঁটতে থাকে। হঠাৎ কিছুদূর হাঁটার পর পেছনের লোকটা বলে, 'আরে ঐ দিকে যাবে না। জন্তু, জানোয়ার বেরুতে পারে, জায়গাটা মোটেই নিরাপদ নয়।'

'তা আপনি এখানে কি করেন?' —প্রায় তিনজনেই এক সঙ্গে জিজ্ঞেস করে।

'আমি, মানে, আই অ্যাম অর্থাৎ কি না নিরাপদ হালদার, নিরুদ্দেশ হয়ে নিজেকে খুঁজছি।' কিছুক্ষণ চুপ থেকে শেষে বলে, 'আচ্ছা মানুষ কেন নিরুদ্দেশ হয়। আর আমি বা কেন নিরুদ্দেশ হলাম? —নিরুদ্দেশ হয়েই বা আমার কি হল। এই এখনও আমি নিরাপদ হালদার নিরাপদ হালদারকে খুঁজছি। খুঁজেই মরছি।'

—'বদ্ধ পাগল, কেটে পড। ঘোর সন্ধে বেলায় এই জঙ্গলে পাগলের হাতে প্রাণ যাবে।' —রঞ্জন, কাঞ্চন আর শুভ্রর কানে কানে বলে। বিকেলের গোলাপ রোদ জঙ্গলের ভেতর টুকরো টুকরো পড়ে আছে। পাখির কিচিরমিচির জমাট বেঁধে যাচ্ছে। কত পাখি। একটাও কোন জন্তু-জানোয়ার নেই। কয়েকটা আদিবাসী ছেলেমেয়ে মাথায় কাঠের টুকরো নিয়ে জঙ্গলের ভেতর পাতা কুড়োচ্ছে। সন্ধে হয়ে আসছে। আর কিছুক্ষণ পরেই অন্ধকার হয়ে যাবে। ওরা তিন বন্ধু জোরে পা চালিয়ে হাঁটতে থাকে। মনে হয় লোকটাও ওদের পিছনে সমান জোরে হাঁটছে। লোকটার বয়স হয়ে গেছে অনেক। অন্তত ষাট কিংবা তারও বেশি। সমানে পিছনে বক বক করছে। গুণ্ডা বদমায়েশ নয় তো, এমন একটা সন্দেহের ছোঁয়া দেখা দেয় মনে। লোকটাকে ছেড়ে বেশ কিছুদূর এগিয়ে যায় ওরা।

—'স্টপ। সংরক্ষিত বন্যপ্রাণীর এলাকা আর এগিয়ো না।' শব্দের ভীষণ জোরে সমস্ত জঙ্গলের গাছপালাগুলো যেন থতমত খেয়ে গেল। ওরা তিন জন এমন বাজখাঁই আওয়াজে দাঁড়িয়ে পড়ে। পেছন দিকে তাকিয়ে দেখে একটা ছোট্ট টিলার মত জায়গায় লোকটা দাঁড়িয়ে মাথার টুপি নাড়ছে। আর তাদের দিকে তাকিয়ে হাসছে। পেছনের জঙ্গলের ভেতর পশ্চিম আকাশের সূর্যাস্ত আগুন ধরানো আলোতে সমস্ত জঙ্গল রাঙিয়ে দিয়েছে।

—'ইয়ং মেন ঐ দিকে যেও না। আমি নিরাপদ হালদার একবার ঐ অভয়ারণ্যে গিয়ে আর ফিরে আসতে পারিনি।' টিলার ওপর থেকে চিৎকার করে কথাগুলো বলে লোকটা। কিছুক্ষণ পরে ওরা ফেরার পথে আর লোকটাকে দেখতে পায় না।

ডাকবাংলোর বারান্দায় বসে ওরা তিন বন্ধু কালকের ঘটনার কথা ভাবতে থাকে। কাঞ্চন বলে,— 'স্ট্রেঞ্জ লোকটা মুহূর্তে জঙ্গলের মধ্যে গেল কোথায়।'

—'কেয়ারটেকার কিছু বলতে পারল না লোকটা কে?' শুভ্র বলল।

রঞ্জন বলে, 'কলকাতায় গিয়ে মেশোমশায়ের কাছে ব্যাপারটা বলতে হবে। —আমার মনে হয় লোকটা বোধহয় কাঠচোরদের পাণ্ডা।' রঞ্জনের মেশোমশায় এই বাংলো ঠিক করে দিয়েছেন। তিনি ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের বড়বাবু।

আজ দার্জিলিং মেলের টিকিট কাটা। কিছুক্ষণ পরেই টয়-ট্রেন ধরে নিউ জলপাইগুড়ি যেতে হবে। কালকের সেই অদ্ভুত পাগলটার জন্যে সকলেই মনে মনে প্রতীক্ষা করে আছে, আজ যদি একবার যাওয়ার আগে নিরাপদ হালদার এসে হাজির হয় তাহলে বেশ মজায় সময়টা কাটে। বিচিত্র পোশাক আর বিচিত্র কথাবার্তা। নিরাপদ হালদার নিরাপদ হালদারকে খুঁজছে। অভয়ারণ্য থেকে সে ফিরে আসতে পারেনি। অথচ সেই অভয়ারণ্যের বাইরে প্রহরীর মত সতর্ক করছে। এখনও সেই বাজখাঁই গলার 'স্টপ' শব্দটা যেন ঐ জঙ্গলের গাছপালাকে টঠস্থ করে দিয়ে প্রতিধ্বনির মত ফিরছে। কি ভয়াল ও ভীষণ শব্দ যা কোন মানুষের কণ্ঠস্বর হতে পারে না। এতবড় জঙ্গলের যত পাখি ছিল সব একসঙ্গে সেই শব্দে ডালপালায় হুটোপুটি করে উঠেছিল। আদিবাসী ছেলেমেয়েরা ভয়ে ছুটে পালিয়েছিল। লোকটা দিব্যি হাসছিল।

ওরা তিন বন্ধু শব্দ করে হেসে ওঠে, বলে,— 'নিরাপদ হালদার নিরাপদ হালদারকে খুঁজছে। কে তুমি বাবা? কোন দিব্যজ্ঞানী মহাপুরুষ!'

কাঞ্চন বলে, 'আমার মনে হয় কেয়ারটেকার লোকটা সব কিছু জানে। না জানার ভান করছে।'

—দাঁড়াও দেখাচ্ছি মজা।' রঞ্জন বলল।

শুভ্র শুধু বলে, 'আমার কেমন মনে হচ্ছে লোকটার সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হবে।'

॥ ২ ॥

শেষ পর্যন্ত মেঘ, বৃষ্টি আর কুয়াশা মাখা ট্রেনের কামরায় লোকটার সঙ্গে ওদের তিন বন্ধুর দেখা হল। প্রথম দেখে ওরা একটু আশ্চর্য হয়েছিল। কোথায় শুকনা ফরেস্ট আর কোথায় দার্জিলিং মেল-এর কামরা। এখন নিরাপদ হালদারকে একেবারে চেনাই যাচ্ছে না। একটা ওভারকোট পরা হঠাৎ দেখলে রেল-এর টিকিট চেকার বলে মনে হয়। টিকিট চেকারদের মত কোট। গলায় মাফলার মাথায় রেলের টুপি।

প্রথম চেনা নিরাপদ হালদার দিল। কাছে যেয়ে দাঁড়াতেই ওরা টিকিট বার করে নিয়েছিল।

'নো, নো, ইয়ংমেন আই অ্যাম নট এ চেকার। আই অ্যাম নিরাপদ হালদার।'

'আরি, আরি দাদা কেমন আছেন।' এক সঙ্গে তিনজন কথা বলে।

'নো, দাদা, নো দাদা, আই অ্যাম আংকেল।' নিরাপদ হালদার বলে।

দুর্যোগের মধ্যে ট্রেন ছুটে চলেছে। মাঝে মাঝে বৃষ্টির ঝাপটা আসে ট্রেনের জানলা দিয়ে। নিরাপদ হালদারের হাতে একটা কাগজের বাণ্ডিল। কামরার অল্প আলোতে কাগজগুলোকে বিবর্ণ দেখাচ্ছে। ট্রেনের ধ্বনিতে নিরাপদ হালদার টাল সামলে নিয়ে পরে তিন বন্ধুর সামনের সিটে বসল। 'আজ বোধহয় বৃষ্টি থামবে না। রাত বড় দুর্যোগের।' নিরাপদ হালদার কথা বলে চুপ করে কিছুক্ষণ কালি ঢালা অন্ধকারের দিকে চেয়ে থাকল।

রঞ্জন আস্তে আস্তে শুভ্রকে একটা চিমটি কেটে বলে, 'লোকটার চোখ দুটি দেখ।'

'ইস'। বলে শুভ্র মুখ নিচু করে। কাঞ্চন বলে, 'তা আপনি এখন কোথায় যাচ্ছেন?'

'কোথাও না।' গম্ভীরভাবে নিরাপদ হালদার উত্তর দেয়।

'মানে, গাড়িতে উঠেছেন। গাড়ি চলছে, আপনি চলছেন অথচ কোথাও যাচ্ছেন না।' কাঞ্চন জিজ্ঞেস করে।

'গাড়িতে উঠেছি ঠিকই, গাড়ি তো আর শেষ পর্যন্ত যাবে না। আমি যাব ধূমলগড়। সেই নামের কোন স্টেশন নেই জানি তবু আমি যাব। ঠিক এমন এক দুর্যোগের রাতে আমি ধূমলগড় থেকে নিখোঁজ হয়েছি।' একসঙ্গে অনেকগুলো কথা বলে জানলা থেকে চোখ ফিরিয়ে নিরাপদ হালদার তিন বন্ধুর দিকে তাকায়।

তিনজনই 'ইস' বলে চোখে হাত চাপা দেয়। বীভৎসভাবে চোখের মণি দুটো গলে গেছে। মুখটারও মাংস হিংস্র কোন জন্তুর থাবাতে ক্ষতবিক্ষত। যেন মাংসগুলো ঝুলছে।

'ভয় পেয়ো না। সেদিন আমাকে দেখে তোমরা ভয় পাওনি, তা আজ ভয় পাচ্ছে কেন।' নিরাপদ হালদার মুখে একটা অদ্ভুত হাসি এনে জানতে চায়।

'আপনার মুখটা এমন হল কি করে। কোন জন্তু-টন্তু আক্রমণ করেছিল।' শুভ্র জিজ্ঞেস করে।

'না, ট্রেন অ্যাকসিডেন্ট। এই ট্রেনটাও অ্যাকসিডেন্ট করবে যদি আমি আজ রাতে একে থামাতে না পারি।' নিরাপদ হালদার ঠাণ্ডা গলায় কথাগুলো বলল।

বাইরে বিদ্যুৎ চমকের এক ঝিলিক আলো এসে নিরাপদ হালদারের মুখে

পড়তেই ওরা তিনজন ভয়ে হিম হয়ে যায়। গলা চোখের মণিতে এক ভয়াল চাহুনি। কুহেলি রাতে এই ট্রেন না জানি কোথায় থামবে। লোকটা কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যুৎ চমক দিচ্ছে থেকে থেকে। লোকটার মনে যেন বিদ্যুৎ চমকের একটা গোপন যোগসূত্র আছে। সবটাই অদ্ভুতুড়ে আশ্চর্য ব্যাপার।

—'তোমরা কোথায় যাচ্ছ'। নিরাপদ হালদার ভীষণ গম্ভীর গলায় জিজ্ঞেস করে।

—'আমরা কলকাতায় যাব।' ভয়ে ভয়ে তিনজন বলে।

'কলকাতা সেটা আবার কোথায়?' কিছুক্ষণ থেকে 'ওহো সেই কলকাতা। নোনাপুকুর ট্রাম-ডিপোর কাছে কবরখানা আছে না?' নিরাপদ হালদার জিজ্ঞেস করে।

রাতের ট্রেন ছুটে চলেছে মেঘ, বৃষ্টি আর কুয়াশার ভেতর। ইঞ্জিন থেকে থেকে হুইসেল দিচ্ছে। বোধহয় কুয়াশায় রেল লাইন আবছা, অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ট্রেনের দুলুনিতে নিরাপদ হালদার মাঝে মাঝে ওদের তিনজনের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। একটা বীভৎস দুর্গন্ধ তার শরীর থেকে এসে গাড়ির হিমেল ঠাণ্ডা হাওয়াকে ভারী করে দিচ্ছে। ঠিক যেন লাশ পচার মত গন্ধ। নাকে রুমাল চাপা দেয় ওরা।

'তোমরা ভয় পাচ্ছ। তা আমাকে দেখে ভয় পেয়ে কি হবে। তোমরা আমার ছেলের বয়সী।' নিরাপদ হালদার উদাসীন সুরে বলে। কিছুক্ষণ পরে বলে, 'ছেলেটাই বা গেল কোথায় হদিশ পেলাম না। সেও কি নিরুদ্দেশ হল!'

ওরা তিনজন চুপচাপ বসে আছে। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। মনে হচ্ছে এই ট্রেন বোধহয় আর কোনদিন থামবে না। ট্রেনের হুইসেল এক মাত্র নীরবতাকে এফোঁড় ওফোঁড় করে চিরে দিচ্ছে। ট্রেন যেন একটা অন্ধকার টানেলের ভেতর দিয়ে যাচ্ছে মনে হয়।

'এই ট্রেনটা এখনই থামাতে হবে। সামনে অ্যাকসিডেন্ট।' নিরাপদ হালদার বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত উঠে দাঁড়িয়ে 'স্টপ' বলে সমস্ত শব্দকে বধির করে গাড়ির চেন টেনে দেয়। গাড়িটা প্রচণ্ড ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যায়। সেই ভয়ঙ্কর শব্দ 'স্টপ' নির্জন অন্ধকার প্রান্তরে প্রতিধ্বনিত হয়। নিরাপদ হালদার অন্ধকারে গাড়ি থেকে নেমে যায়। কুয়াশার মধ্যে লোকটা অদৃশ্য হয়ে গেল। ট্রেনের জানলায় চোখ রেখে শুভ্র, কাঞ্চন আর রঞ্জন কোন কিছু আর দেখতে পেল না।

ট্রেনটা থেমে যেতে ইঞ্জিনের শব্দ আর ঝিঁ ঝিঁ-র শব্দে নাম না জানা নির্জন প্রান্তর কিছুক্ষণের জন্য জেগে ওঠে। দূরে দূরে গ্রামের আলোর বিন্দু দেখা যায় অস্পষ্ট। কুয়াশার মধ্যে থেকে। সবাই 'কি হল' 'কি হল' চোখে

জানলায় মুখ রেখে বাইরে তাকায়। দূরে ডিসট্যান্ট সিগনালের লাল আলো দেখতে পাওয়া যায়। কোথাও নিরাপদ হালদারের ছায়াটুকু পর্যন্ত দেখা যায় না। শুভ্র, কাঞ্চন আর রঞ্জন হতভম্বের মত রেল কামরাতে বসে থাকে। শুধু ফোঁস ফোঁস ইঞ্জিনের শব্দটাই শোনা যাচ্ছে। কুয়াশার মধ্যে ইঞ্জিনটা দাঁড়িয়ে মাঝে মাঝে হুইসেল দিতে থাকে।

হঠাৎ একজন রেলের লোক এগিয়ে এসে কামরায় ওঠে। খোঁজ করে এই গাড়িতে কে চেন টেনেছে। ওরা বসে থাকে। ভয়ে গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। রেলের লোকটা ধমক দিতে ওরা বলে, 'একটা পাগল চেন টেনে নেমে পালিয়েছে।'

—'চোপ, পাগল চেন টেনে পালিয়েছে! না তোমরা টেনেছ।'

—'না স্যার। বিশ্বাস করুন লোকটা একটা বীভৎস চেহারার, গতকাল থেকে আমাদের পিছু নিয়েছে।' তিনজনে সমস্বরে বলে। রেল কামরাটা প্রায় ফাঁকা। প্রথম থেকে একটা লোক বাঙ্কে কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। শুধু এক কোনায় একটা বেঞ্চে কয়েকজন দেহাতী মানুষ বসে বসে ঝিমোচ্ছিল। তারা নিরাপদ হালদারকে দেখেছে চেন টেনে নেমে যাবার সময়। তারা সাক্ষী দিল, 'লোকটা একটা ভূতুড়ে পাগল স্যার।' এমন সময় রেলের আরও কয়েকজন লোক ছুটতে ছুটতে এসে এই কামরায় উঠে রেলবাবুকে বলে, 'স্যার অ্যাকসিডেন্ট, একটা লোক লাইনের ওপর পড়ে আছে। ঠিক চেন টানার সঙ্গে সঙ্গে লোকটার বডিটা লাইনের পরে এসে পড়েছে। আশ্চর্য ইঞ্জিনের চাকার সামনে পড়ে আছে স্যার, অথচ চাকাটুকু তাকে ছোঁয়নি।'

—'স্ট্রেঞ্জ, কেস। কোথা থেকে লোকটা এসে পড়ল। এই নিষুত রাতে ফাঁকা ধূ ধূ প্রান্তরে লোকটা কোথা থেকে এল।' কথাগুলো বলে রেলের লোকগুলো নেমে গেল। কৌতূহলে ওরাও তিনজনে রেলকামরা থেকে নেমে ইঞ্জিনের দিকে এগিয়ে যায় অনেক যাত্রী ট্রেন থেকে নেমে ওদের সঙ্গে এগোচ্ছে। ইঞ্জিনের তীব্র হেড লাইটের আলোয় লাইনের চকচকে ইস্পাতের ওপর নিরাপদ হালদারের দেহটা পড়ে আছে। সেই মুখের দিকে তাকিয়ে শুভ্র, কাঞ্চন আর রঞ্জন চিৎকার করে ওঠে।

॥ ৩ ॥

পরদিন সকালে তিনজনের ঘুম ভাঙে একটা নাম না জানা বড় রেলওয়ে হাসপাতালে। ডাক্তার, নার্স, ওয়ার্ড বয় ঘোরাঘুরি করছে। ওয়ার্ডে ওষুধের গন্ধ। একজন নার্স এসে তিন বন্ধুকে জিজ্ঞেস করছেন 'এখন কেমন লাগছে।' ওরা ক্ষীণ কণ্ঠে বলে, 'একটু ভাল।' নার্স আবার জিজ্ঞেস করেন, 'কাল রাতে কি হয়েছিল।'

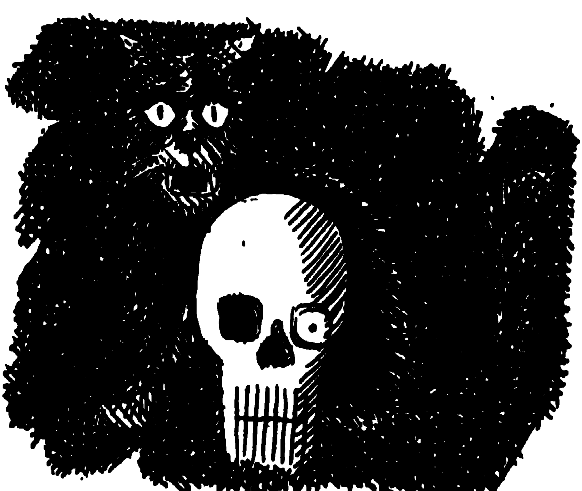
—'জানি না। কিস্যু মনে নেই।' রঞ্জন আস্তে আস্তে বলে। শুভ্র আর কাঞ্চন ফ্যালফ্যাল চোখে চেয়ে থাকে।

নার্স বলেন, 'কাল একটা মারাত্মক অ্যাকসিডেন্টের হাত থেকে এতগুলো যাত্রী বেঁচে গেছে তোমরা যদি চেন টেনে গাড়ি না থামাতে তা হলে কি যে হত।' একটু থেমে নার্স ভদ্রমহিলা গর্বের সঙ্গে বলেন, 'তোমরা আমাদের দেশের গর্ব, রেল তোমাদের পুরস্কার দেবে।'

রঞ্জন ক্ষীণস্বরে জিজ্ঞেস করে, 'আমরা।'

—'হ্যাঁ তোমরা। ডিসট্যান্ট সিগন্যালের একটু দূরেই লাইনের ফিস প্লেট খোলা ছিল। নার্স কথাগুলো বলে পাশের ওয়ার্ডে ইঞ্জেকশানের সিরিঞ্জ হাতে চলে যান। খুট খুট পায়ের শব্দটা আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায়।

ওরা তিন বন্ধু কিছুই স্মরণ করতে না পেরে চুপচাপ বসে থাকে। ❑



ঝরাপাতা/ গুরু বিশ্বাস



'চাকরির বাজার তো দেখছেন' কথাটা শুনতে শুনতে কানে যখন তাল লেগে যাবার জোগাড়, বয়স বেড়ে জীবনের অর্ধেক পরমায়ু ক্ষয় করে ফেলেছে তখন আর স্থির থাকতে পারল না দীপক। সাধারণ মানের বি.এ. ডিগ্রিটার ভরসা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল যা হোক কিছু একটা করবে। যাতে পয়সা পাওয়া যায় সেটাই করবে সে। যেসব কাজকে 'ছোট কাজ' বলে বাবু খেতাবের নিম্ন-মধ্যবিত্তরা বিশ্বাস করে সে কাজও দরকারে করবে সে, তবে পরিচিত পরিধিতে নয়, বাইরে। চেনা চোখের আড়ালে।

সেই ভেবেই আসা। আগে একদিন একটা ছোট বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কাজ খুঁজতে এসেছিল বলে মনের ওপর বহরমপুর শহরটা ছিল। এসে পড়ল। সাধারণত লোকে পরিচিত মানুষ খুঁজে তার সান্নিধ্যে যায় দীপক এল পরিচিত কেউ নেই বলে। এখানে সে নিশ্চিন্ত। কেউ দেখবে না, জানবে না, বলবে না সে কি করছে। দেশের কলকারখানা দিনে দিনে বন্ধ হয়ে গেছে, গুটিয়ে যাচ্ছে বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, এমতাবস্থায় চাকরি জুটবে কোত্থেকে! প্রথম প্রথম সরকারি চাকরির পেছনে ছুটেছিল কিন্তু সেখানে রাজশক্তি যাদের সেই দলের ছাপমারা যোগ্য অযোগ্য প্রার্থীদের একমাত্র প্রবেশাধিকার দেখে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছে।

এখানে এসেও দিন কতক ঘুরতে হয়েছে তারপর এই বিশাল মেহগনির নিচেটা ফাঁকা পেয়ে লটারির টিকিট নিয়ে বসে পড়েছে সস্তা কাঠের টেবিল

চেয়ারটা জোগাড় করে। সকাল থেকে বসে থাকতে হয়, সারাদিনে অসংখ্য ট্রাক বাস নানা রকম মোটর গাড়ি সবেগে দৌড়োদৌড়ি করে সামনে দিয়ে তার ধুলোয় টেবিল ঢেকে যায় ঝেড়ে নিতে হয় আধঘন্টা বাদে বাদেই। লটারির টিকিট তার কানামামা, অথবা খইভাজাও বলা চলে। অন্য কিছু না পাবার জন্যে এই নিয়ে বসে থাকা, আশা নয় নিরাশা কাটাতে। এখানটায় পথের দক্ষিণধারে সারি সারি মেহগনি, শিরিশ সুবিশাল দেহগুলো নিয়ে ছায়াতরু হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে, পেছনটা ঝোপ-জঙ্গল মত কোনদিন দৃষ্টি আকর্ষণ করেনি তাঁর, হয়ত কারও করে না। পতিত জমি পড়ে আছে তো আছে কার কি। কেবল পথের ধারে ধারে তারই মত দু-চারজন যে যা পারে নিয়ে বসে গেছে প্রাণ ধারণের রসদ সংগ্রহ করতে। এখানটাই যা ফাঁকা ছিল কেউ বসেনি। সে চেয়ার টেবিল জোগাড় করে বসার পর কদিন বাদেই হাত-পঁচিশ পূব দিকে বসে স্কুটার মেরামত করে যে নবিজান মিস্ত্রি আচমকাই বলল, ওখানটায় বসছেন বটে বড় বিরক্ত করবে।

কে? দীপক জানতে চাইলে কোন উত্তর দিল না।

কে যে বিরক্ত করতে পারে বুঝতে না পেরে দীপক তাতে গুরুত্ব দেয়নি। যে করে করুক, যা করে করুক তখন দেখা যাবে, উঠতে হয় উঠে যাবে। আপাতত কাজ তো চলুক। সেই ভাবনাতেই এখানে বসা।

বসে কোন অসুবিধেও অনুভব করল না। নবিজান মিস্ত্রি যে বলেছিল বিরক্ত করবে তাও যা হোক কেউ করল না। টিকিট বিক্রি হোক, আর না হোক বসার কোনই অসুবিধে হল না তার। সারাদিনে সামনে দিয়ে গাড়ি চলে অনেক মানুষও কম চলে না তবে সন্ধে হলেই কেমন নিঝুম হয়ে আসে। এলাকাটাই অমনি। নবিজানও সন্ধের পর থাকে না, তার কাজের শব্দ সন্ধে লাগতে না লাগতে বন্ধ হয়ে যায়। দীপক একাই বসে থাকে একটা কেরোসিনের কুপি জ্বালিয়ে। এসময়টা তার খুব যে একটা বিক্রি হবে এমন নয়, আর কোথাও যাবার বা কিছু করবার নেই বলেই বসে থাকা। যা হয় হল।

ইদানীং সারা দেশেই মাঝে-মাঝে বিদ্যুৎ বন্ধ হয়ে যায়। ঘাটতি পূরণের জন্যে যখন তখন আলো নিবিয়ে দেওয়া হয় ঝুপ করে অন্ধকার নেমে আসে, আকাশ জুড়ে থাকা অন্ধকার সমস্ত অস্তিত্ব জুড়েই নেমে আচ্ছন্ন করে দেয়। সেই সময় কেমন যেন একা একা লাগে। তীব্র বাতি জ্বালিয়ে সামনে দিয়ে গাড়িগুলো দৌড়ে গেলেও তাদের আর পার্থিব বলে মনে হয় না, যেন গ্রহান্তরের যান উল্কা বা ধুমকেতুর গোত্রজ সব।

রাস্তার ওপারেই বড় বড় দোকান, ইমারতি সামগ্রীর দোকান, সুকান্ত চৌধুরীদের রঙের দোকান, সাধুবাবুর লোহার দোকান — সবই আপন উজ্জ্বলতা

হারিয়ে মোমের আলোয় প্রাগৈতিহাসিক গুহারূপ ধরে থাকে। দীপক কতদিন ভেবেছে কি হবে অন্ধকারে বসে থেকে, উঠে যাই। পারেনি। উঠি উঠি করেও ওঠা হয়নি। হয়ে ওঠেনি। উঠে তো সেই সৈদাবাদের পুরানো জীর্ণ বাড়ির ঘরখানার মধ্যে গিয়ে চামচিকের বদলে ঢুকে থাকা একা একা। তার চেয়ে তো তবু গতির মধ্যে চলমানতার মধ্যে থাকা যায় এখানে থাকলে।

সেদিন শনিবার সন্ধের আগেই আলো নিবে গেল, নবিজান তার যন্ত্রপাতি গুটিয়ে দিল বোঝা গেল এমন সময় হঠাৎ একটা ছোট পাতার গোছা সামনে ভেঙে পড়ল তার আশ্রয়দাতা গাছ থেকে। হনুমান! তাদের চলাচলও তো বন্ধ হয়ে গেছে সন্ধের অন্ধকারে! চঞ্চলতা বাতাসেরও নেই! শুকনো ডাল হলে যদিও বা হত একেবারে উপডালের সবুজ পাতার গোছা ভেঙে পড়া! ব্যাপারটা দীপকের মাথার মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে রহস্য হয়ে গেল। মাথার ওপরে চেয়ে দেখল ডালপালা জুড়ে নিঝুম অন্ধকার, কোন চঞ্চলতা নেই। হঠাৎ এমন ছোট একটা ডাল ভেঙে পড়ার কোনই কারণ খুঁজে পেল না দীপক; তার শরীর কেমন ভার ভার লাগল। অল্পক্ষণ পরেই মনে হল কেউ একজন তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে। কে! পেছন ফিরে চেয়ে দেখল একই রকম অন্ধকার জমাট বাঁধা। আরও কিছুটা পেছনে ঝোপগুলো আরও অন্ধকার। দিনে যা থাকে রাতে তার সব লুপ্ত হয়ে যায়। রাতে কেমন বদলে যায় সমস্ত পৃথিবীটা। মাঝে মাঝে দীপকের গা ছমছম করতে থাকে। সমস্ত কেমন রহস্যময়তায় ঢাকা পড়ে যায়। অন্য কোন দিন তো এমন হয় না! বিদ্যুৎ বন্ধ তো আজকাল প্রায়ই হচ্ছে, আজই হঠাৎ এমনটা হল কেন? আবার মনে হচ্ছে কে যেন চলে বেড়াচ্ছে। চারপাশেই তাকাল দীপক; কই কেউ তো নেই!

স্যামুয়েল! খুব নিচু স্বরে ফিসফিসানির মত কে যেন উচ্চারণ করল নামটা। নাম ধরে ডাকল। কে! কে ডাকছে? কণ্ঠ যতই ক্ষীণ হোক ডাক স্পষ্ট। কোন এক স্যামুয়েলকে ডাকল কোন নারীকণ্ঠ। এই গহন অন্ধকারে যেখানে জোনাকিরাও যেন জ্বলতে ভয় পাচ্ছে, পতিতজমি আর আগাছার জঙ্গলের মধ্যে কোন মহিলা কোন স্যামুয়েলকে ডাকতে যাবে! নাঃ এ তার ভ্রান্তি। কেউ কোথাও নেই। ডাকছে না কেউ। ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যেই তো একটা নালা আছে, জল থাকে না ভরাট হতে থাকে দিনে দিনে, সেই নালার মধ্যেই বোধহয় চলাচল করছে কোন সাপ, তারই শব্দ। অথবা হতে পারে মেথর পাড়ার শুয়োরগুলো চরতে চরতে এদিকে এই জঙ্গলটায় চলে আসে তাদেরই কোনটা হয়ত ফিরতে পারেনি, রয়ে গেছে তার চলাচলের শব্দ।

দীপক পথের দিকে মন দিতে চেষ্টা করল। আজ কি কারণে কে জানে গাড়ি চলাচল কম। জাতীয় সড়ক ধরে অবিরাম যে ধাবমান ইঞ্জিনের শব্দ

সে অনেকটাই কম। আজ কি দোকান গুটিয়ে দেবে? ভাবল দীপক। কি হবে এই অন্ধকারে বসে থেকে। কে আর টিকিট কিনতে আসবে এমন অবেলাতে? সে ভাবছে এরই মধ্যে আবার সেই ডাক, আরও কাছে, আরও স্পষ্ট। মনে হচ্ছে একবারে কানের কাছেই, তার ঠিক পেছনটিতে দাঁড়িয়েই কে ডাকছে, যে আগের বার ডেকেছে সেই ডাকছে। সেই মহিলা, একই কণ্ঠস্বরে ফিসফিস করে ডাকছে, স্যামুয়েল!

এবার দীপকের সর্বাঙ্গে কাঁটা দিল। মনে হল শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। সে বুঝি বরফ হয়ে যাচ্ছে। সে কি জমে যাবে? ভয় হল। জীবনে কখনও ভয় পায়নি দীপক। অভাবে অনটনে, দাঙ্গায় দুর্বিপাকে কখনই নয়। ভয় এই প্রথম। এমনই ভয় যে তার তুলনা হয় না, পরিমাপও নয়। কিছুক্ষণ আগে মনে হচ্ছিল জমে যাচ্ছে তারপরই মনে হতে লাগল সে ঘামছে। অল্পক্ষণ বাদেই নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে শক্ত হল দীপক। মনকে মজবুত করবার চেষ্টা করল। নাঃ এসব ভুল। নিছকই ভ্রান্তি। পরমুহূর্তেই তার মনে হল কে যেন অন্ধকারের মধ্যেই হেঁটে বেড়াচ্ছে। ছায়া ছায়া অবয়ব তার। ঐ তো! ঐ আবার বাঁ দিকে, ঐ ডান দিকটায়। অতি দ্রুত কে যেন কি খুঁজে চলেছে। সঙ্গে সাপের হিস হিস শব্দের মত কানে আসছে দীপকের। সে উৎকর্ণ হয়ে রইল। আসলে শব্দটা সেই ডাক— স্যামুয়েল!

ক্রমে ডাকটা ও ছায়ামূর্তি দক্ষিণ দিকে মিলিয়ে গেল। যেন বনের মধ্যে ঢুকে গেল। অতঃপর সব শান্ত, ঝিঁঝি পোকার শব্দ অন্ধকার জুড়ে একটানা বাজতে লাগল কেবল।

দীপক আর বসে থাকার সাহস পেল না। তার গা ছম ছম করতে লাগল। কোনক্রমে টেবিল চেয়ার গুটিয়ে উঠে পড়ল জায়গা ছেড়ে। মনে হল সৈদাবাদ অনেকটাই দূর রিকশা করে যেতে হলেও অনেকটাই সময় লাগবে তার। রহস্য যাই হোক ভয় যেন তার সঙ্গ ছাড়তে চাইল না।

অন্ধকার সব কিছুকেই রহস্যময় করে তোলে আলোর কাজ সব প্রকাশ করা, রহস্যের আবরণ উন্মোচন করে সে। সৈদাবাদের শোবার ঘর পর্যন্ত সেই রহস্যজনক স্বর স্যামুয়েলকে ডাকতে যায়নি এই যা রক্ষে, আর সেইজন্যেই সকালের আলোর সঙ্গে তার নিজের সাহস ফিরে এল। রাতের সেই ছায়ামূর্তির স্মৃতি ফিরে এল তার চেতনায়। ব্যাপারটা কি সবই তার দৃশ্যগত ভ্রান্তি, না রহস্যময় কোন সত্য এ তাকে দেখতে হবে। সবটাই যদি বিভ্রম হয় তাও তাকে বুঝতে হবে আর এর পেছনে কারও রহস্যময় কাজকর্ম থাকে যা নবিজান মিস্ত্রির কথার ইঙ্গিতে ছিল— বিরক্ত করবে— তাহলে সেই মতলবের হোতাকেও খুঁজে বের করতে হবে। যদি সবই অন্ধকারে চোখের বিভ্রান্তি হয় তবে দিনের

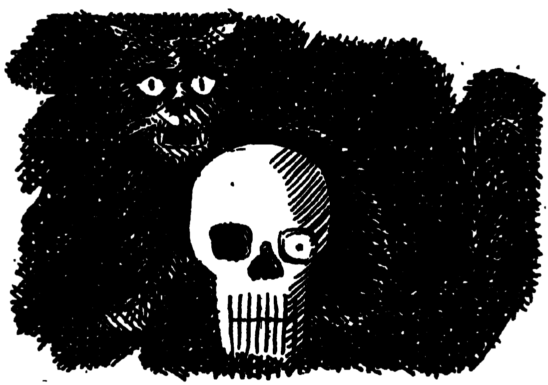
আলোয় তার কারণ নিশ্চয় বোঝা যাবে। কোন বস্তুটি তার বিভ্রান্তির কারণ অথবা বারংবার 'স্যামুয়েল' ডাকটির উৎপত্তিই বা কি সবই স্পষ্ট হওয়া প্রয়োজন।

এইসব চিন্তা করেই দীপক দিনের বেলা দোকান বসাবার আগেই সেই গাছ তলায় গিয়ে দাঁড়াল রাতের সেই ভাঙা ডাল পড়ে আছে কি না দেখতে। নাঃ কোথাও তো নেই। ডাল অবশ্য নয় একগুচ্ছ পাতা— যাকে পল্লব বলা যায়। কিন্তু তাও তো থাকবে? এমন তো ঝড় হয়নি কাল রাতে যে তা উড়ে যাবে। বরং পাতার নড়াচড়া কোথাও ছিল না। এপাশ-সেপাশ চোখে চোখেই খুঁজল দীপক, কোথাও নেই। এতই কি ভুল দেখল সে কাল রাতে! তাও এমন গভীর নয় সন্ধ্যারাতেই বলা যায়। এতটা ভুল হবে কি করে? তার চেয়ার ও টেবিল যেখানে পাতা হয় সেখান থেকে দক্ষিণ দিকে ঝোপ জঙ্গলের শুরু। মটমটি, কন্টিকারি, আরও দশ রকম বাজে গাছালির বন পেরিয়ে কয়েক পা যেতেই সরু নালা, তারই ধারে ঢোলকলমির দেখা। কোথাও কাল রাতের রহস্যের কিনারা পাবার লক্ষণ নেই। আরও একটু যেতেই দীপক অবাক হয়ে দেখল ঝোপ জঙ্গলের বুকের মধ্যে সারি সারি কবর। না ঠিক সারবন্দী নেই এলোমেলো হয়ে আছে। কোথাও কাঠের ক্রশ ক্ষয়ে ভেঙে আধখানা, কোথাও পাথরের ক্রশ কাত হয়ে পড়ে আছে, কোথাও বা পাথর রোদজল ক্রমাগত সহ্য করতে করতে কৌলীন্য হারিয়ে জীর্ণ হয়ে গেছে। এখানে এত সমাধি আছে জানত না দীপক, শোনেইনি। এতদিন দূর থেকে যেটা পরিত্যাক্ত ভূমি বলে জেনে এসেছে সে যে এমন স্মৃতিসদন কে জানত! একটা ফলকের ওপর একটি পাথরে খোদাই এখনও স্পষ্ট হয়ে আছে— সতেরশো পঞ্চাশ খ্রিস্টাব্দের স্মৃতি। মৃতের নাম ধাম লেখা নিশ্চয় ছিল কাল তাকে নিয়ে ঘষামাজা করলেও হরণ করেছে অন্য কেউ। যথাস্থানে নেই। কৌতূহলী বিচরণ তার মমতা জাগালো। একদিন কত যত্নে প্রিয়জনেদের স্মৃতি অক্ষয় করে রাখবার যে প্রয়াস সমাধিতে ছিল আজ এই সামান্য দুশো বছর বাদেই কতটুকু বা তার অবশিষ্ট আছে! যে প্রিয়জনেরা নির্মাণ করিয়েছিলেন তাঁরাও সব কোন না কোন পাথরের নিচে ভূমিলিপ্ত।

সমাধিস্তম্ভ ও স্মৃতিস্তম্ভ সবই জীর্ণ, অধিকাংশই পাঠোদ্ধার করা যাচ্ছে না, কিছু যাচ্ছে না ভাষার জন্যে, দীপকের দুর্বোধ্য ল্যাটিন ভাষায় মনের আকুতি নিবেদিত কিছু কিছু ফলকে। আকর্ষণ বোধ করল বলেই খুঁটিয়ে দেখতে লাগল দীপক। হঠাৎ একটা ফলকে চোখ আটকে গেল Departed soul of our beloved son Samnel Wood, আড়াইশো বছর আগেকার জন্ম ও মৃত্যুর তারিখ হিসেব করে দীপক দেখল মাত্র বাইশ বছর বয়সে মারা গেছে ছেলেটি। বাবা জন উড মা সিলভিয়া। বাড়ি নটিংহ্যামশায়ার, ইংলন্ড। কেনই বা স্বদেশ ছেড়ে এখানে এসে প্রাণ দিল ছেলেটি কে তার খবর জানে! যারা জানত কালের

কবলে সবাই এখন নিশ্চিহ্ন। বিষণ্ন হয়ে পড়ল দীপক। সে হঠাৎ ভাবল নিজে অনেক ক'বছর আগে বাইশ' পার হয়ে এসেছে। তার আরও ভাল· লাগল কবরের ফলকটা এখনও পড়বার মত আছে দেখে। পাথরে খোদাই এখনও পড়বার মত আছে। দীর্ঘশ্বাস পড়ল তার অজান্তেই। পাশেই আর একটা কবর, নাম পড়েই চমকে উঠল দীপক। তার পা যেন মাটিতে আটকে গেল। সিলভিয়া উড। অকস্মাৎ তার শরীর শির শির করে উঠল। মনে হল তার মেরুদন্ড বেয়ে নেমে যাচ্ছে কোন জলধারা বা সরীসৃপ জাতীয়· প্রাণী। ফলকেই লেখা আছে, ইংরিজিতে বলেই পড়তে পারল "একমাত্র ছেলেকে খুঁজতে এসে এখানেই রয়ে গেছেন জন উড-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁর আত্মা শান্তিতে থাকুক"— এই প্রার্থনা লিখে রেখে গেছেন হতভাগ্য জন উড সতেরশো ষাট শালে, একমাত্র পুত্রের মৃত্যুর চার বছর পর।

কোথা থেকে একটা ঝরা পাতা উড়ে এসে পড়ে আটকে গেল সিলভিয়া উড-এর সমাধি ভূমির ওপর। দীপক চমকে উঠল তার শব্দে। ❑



কোট / অশোককুমার মিত্র



এখন এই মধ্য বয়সেও স্বভাব বদলায়নি আমার। ছোটবেলা থেকেই আমি একটু একলাচোরা মানুষ। সবার সঙ্গে মিশতে পারি না, হৈ-হুল্লোড়ে সময় কাটাতে পারি না, সিনেমা-থিয়েটার বড় একটা দেখি না, দল বেঁধে বন-ভোজনে যাই না, বরং একা একাই থাকি, নির্বোধ সঙ্গীর চাইতে সঙ্গীহীন একা থাকি, বই পড়ি। আমার দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছে চোখে পুরু কাচের চশমা। মাঝে মাঝে একাই বেরিয়ে পড়ি দূর দেশে কি কাছে-পিঠে কোথাও। যেখানে মানুষের ভিড় সেই বড় শহর, সমুদ্র সৈকত কি শৈল নগরীতে সাধারণত আমি যাই না, খুঁজে নিই স্বল্প পরিচিত, অপরিচিত জায়গাই— যা আমায় বেশি টানে। যেমন এখন ঘুরছি নদীয়া জেলার চূর্ণীর তীর ঘেঁষে ঘেঁষে। এখানে ওখানে দূরে দূরে ছড়ানো ছিটানো দু'একটি গ্রাম। বিস্তীর্ণ ধান ক্ষেত। শনি-রবি ছুটি, সঙ্গে সোমবারটাও ছিল ছুটির দিন। আমি বেরিয়ে পড়েছিলাম নদীয়া পরিক্রমায়। দেড়খানা দিন কেটে গেছে। আমি আলপথে সাইকেলে যখন ধান ক্ষেত ভাঙছি, ঠিক তখনি আমার অফিস সহকর্মীদের অনেকেই গিয়েছে পুরীর সমুদ্র উপকূলে। অফিস রিক্রিয়েশন ক্লাব তাদের নিয়ে গেছে কদিন হৈ-চৈ করে কাটানোর উদ্দেশ্যে। তাদেরও অনুরোধ অগ্রাহ্য করে এই ক্ষেতের পথে ঘুরে বেড়ানো আমার স্বভাব। তাই, সহকর্মীরা যারা আমায় খ্যাপা বা পাগল বলে তা নিয়ে আমি কখনো অনুযোগ করি না। এই তো কদিনে জলে ভিজেছি, রোদে পুড়েছি, খাওয়া যে চমৎকার কিছু জুটেছে তাও বলতে পারছি না।

বরং আলপথ ছেড়ে এখন বনপথে ঢুকে পড়েছি। ধান ক্ষেতের শেষে দেখছি কিছু এলোমেলো হালকা গাছপালার জঙ্গল। এ জঙ্গল পেরুলে আবার এক শহর আছে। শুনেছি এই বনের ভিতর পুরনো আমলের এক পোড়ো মন্দির আছে। মন্দিরেও গাছে চমৎকার পোড়া মাটির কাজ। অবশ্যি, তার অনেকখানিই নষ্ট হয়ে গেছে। তবে কয়েকটি প্যানেলে রাম-সীতার বিয়ের কাহিনী এখনও টিকে রয়েছে।

কিছু পথ যেতে যেতে সাইকেলের টায়ার গেল ফেঁসে। পিঠে হ্যাভার-স্যাক নিয়ে দু'হাতে অচল সাইকেল ঠেলছি। ঠিক তখনি প্রচন্ড ঝড় শুরু হল, সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি। প্রবল বৃষ্টিতে দুহাত দূরের পথ দেখা যায় না। জন-প্রাণীর সাড়া নেই। লোকবসতির চিহ্ন দেখতে পাচ্ছি না। হাঁটতে হাঁটতে ঘন্টা ফুরিয়েছে—বৃষ্টির বেগও কিছুটা কমেছে। হঠাৎ এক বাঁকের মুখে এক মস্তবড় বাড়ির আভাস নজরে এল। ক্রমে সে বাড়ির সামনে এসে হাজির হলাম। ক্লান্ত শরীরটা আর বইছিল না। একটু খাদ্য, একটু আশ্রয়ের জন্যে তখন মনটা অস্থির হয়েছিল। কিন্তু বাড়ির সামনে এসে হতাশই হলাম। মস্ত বড় পাঁচিলে ঘেরা দোতলা বাড়ি, তবু সবটাই যেন ভেঙে পড়েছে। ফটকের পাশে দারোয়ানের ঘর ছিল, তার ছাদ ভেঙেছে; ফটকে লোহার গেটটা এক পাশে কাত হয়ে ঝুলছে। চারিদিকে বুনো আগাছা। লক্ষ্য করলে বোঝা যায় বাড়িটা বহুদিন থেকে পরিত্যক্ত।

তা, এ দুর্যোগে আর এমন দুরবস্থায় এই আশ্রয়টুকু ছাড়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে বলে মনে হল না। আর কিছু না হোক, এ ছাদের নিচে দু'দন্ড থাকতে তো পারি, ভিজে পোশাক তো বদলে নিতে পারি। পারি আমার খোঁড়া বাহনটাকে মেরামত করে নিতে।

তাই আর মাথা না ঘামিয়ে সাইকেল ঠেলে ফটক পেরিয়ে ভিতরে ঢুকে পড়লাম। দেখে মনে হল পুরনো দিনের বাংলো গোছের বাড়ি। হতে পারে কোনও নীলকুঠি। এককালে নদীয়ার এ অঞ্চলে নীল চাষ হত। পাথরে খোদাই একটা ফলক ছিল ফটকের বাইরে। তবে তার খোদাই লেখা এখন আর পড়া যায় না।

বাড়ির অধিকাংশ জানালা খুলে পড়েছে। ক'পা এগুতে আমার পায়ের শব্দে কটা চামচিকে উড়ে গেল। মনে হল বহুকাল এ বাড়িতে কোন মানুষের পায়ের ছাপ পড়েনি। ভেতরে ঢুকবার জন্যে আমি দরজায় ধাক্কা দিলাম—দরজা খুলে গেল। তারপরে ক্যাঁচকোঁচ আওয়াজ তুলে ভাঙা কব্জার উপরে একটা পাল্লা ঝুলতে লাগল। সেই স্যাঁতসেতে অন্ধকার ঘরে ঢুকবার সঙ্গে সঙ্গে একটা বিশ্রী বোঁটকা গন্ধ আমার নাকে এল। পচা কাঠের গুঁড়ির, ইঁদুরে তোলা ঝুরো নরম মাটির, নাকি অন্য কিছুর? আমি ঠিক বুঝতে পারলাম না—কয়েক মিনিট থমকে দাঁড়ালাম। একটা ভূতুড়ে অনুভূতি আমার শিরদাঁড়া বেয়ে

দ্রুত নিচে নেমে গেল। নির্জন পরিত্যক্ত এমন বাড়িতে হঠাৎ ঢুকলে সম্ভবত এমন শিহরণ হয়ে থাকে। আমার সামনে চওড়া সিঁড়ি। প্রকাণ্ড কাচের জানালা, ধুলো আর মাকড়সার জালে নোংরা হয়ে আছে। সিঁড়ি বেয়ে আমি উপরে উঠে গেলাম, তারপরে প্রথম ঘরটির দরজা খুলে ফেললাম। দেখি, ঘরটি নানা আসবাবে সুন্দরভাবে সাজানো ছিল এক সময়ে। চমৎকার কারুকাজ করা সিলিং। এখন সোফার হাতল গেছে ভেঙে, সিলিং-এর পলেস্তারা পড়ছে খসে। ইঁদুরে মাটি তুলে মেঝেয় জড় করেছে। পর্দা ঝালর ছিন্নভিন্ন অবস্থায় ঝুলছে। পার্সিয়ান গালচেটার আধখানা কিসে যে ছিঁড়ে নিয়ে গেছে! দরজার উল্টোদিকে একটা ফায়ার প্লেস। সেদিকেই দুর্গন্ধটা খুব বেশি। কোনও লেবু পচেছে কিনা কে জানে!

ফায়ার প্লেস দেখে আমার মাথায় একটা বুদ্ধি খেলে গেল। যদি ফায়ার প্লেসটা জ্বালাতে পারি তবে ঘরে কিছুটা আলো হবে, ঠান্ডায় জমে যাওয়া হাত-পাগুলো সেঁকে নেওয়া যাবে, চাই কি ভিজে জামা-কাপড়গুলোও অনেকটা শুকিয়ে নিতে পারব। তাছাড়া, চাই কি গরম কফিও তৈরি করে নিতে পারি। ঘরের বাইরে খোঁজ করতে অনেকগুলো লম্বা কাঠের টুকরো দেখতে পেলাম। সেগুলো কুড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে ঐ ঘরে ফিরে এলাম। ঘরের চৌকাঠে পৌঁছে কেন জানি থমকে গেলাম। পা জোড়া যেন আর এগোতেই চায় না— মনের ভেতরে কে যেন ফিস ফিস করে বলে উঠল— পালাও— আর এখানে থেক না। এখুনি পালাও।

কাঠের টুকরোগুলো মেঝেয় নামিয়ে আমি কয়েক মুহূর্ত ভাবলাম। চারদিকের পরিবেশের মধ্যেই যেন ভয়ঙ্কর অমঙ্গলের আঁচ পাচ্ছিলাম। যদিও বাইরের থেকে পরিবেশটা অপরিবর্তিত ছিল, তবু মনে হচ্ছিল আমার ক্ষণিকের অনুপস্থিতিতে অশুভ কিছু বুঝি ঘরে ঢুকে বেরিয়ে গেছে।

আমি দুর্বল নই, ভূত-প্রেতে আমার কোন বিশ্বাসও নেই। তবু চেতনা ফিরে পেয়ে দেখি আমি ত্বরিত পায়ে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে চলেছি। যদিও ভয় পাবার মত কিছুই আমার নজরে আসেনি, তবু এক ধরনের অসোয়াস্তি আমায় পীড়া দিতে লাগল। কে যেন আমায় সতর্ক করে দিল; দরজার কাছাকাছি থাকাটাই নিরাপদ। ঠিক করলাম— আগুন জ্বালতে হলে নিচের তলায় জ্বালি, যদিও জানি এটা এক ধরনের বোকামি, তবু... তবু যদি ভূতের সত্যি সত্যিই কোন অস্তিত্ব থাকে সে যাত্রায় আমি...

ভাবতে ভাবতে যখন আমি দ্বিতীয়বারের মত নিচে নেমে আসছি, সামনের দরজা দিয়ে আলো আসছে— হঠাৎ কে যেন আমায় ঠেলে তুলে দিল। ছুটে সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে লক্ষ্য করলাম সিঁড়িতে জমে থাকা পুরু ধুলোর উপর কোন খালি বস্তা বা ঐ জাতীয় কিছু টেনে নিয়ে যাওয়ার স্পষ্ট দাগ।

সেই দাগ অনুসরণ করে দেখলাম যে বড় ঘরটায় যেখানে পোকায় কাটা একটা বিবর্ণ কোট ঝুলছে সেখানে এসে দাগটা থমকে দাঁড়িয়েছে, তারপরে এলোমেলোভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে গিয়েছে, কোনটা এদিকে দরজার কাছে শেষ হয়েছে, কোনটা গেছে সিঁড়ি বরাবর, কোনটা বা অন্দরমহলের দিকে চলে গিয়েছে। আর, সব চাইতে আশ্চর্যের ব্যাপার আমার নিজের ছাড়া আর কারো কোন পদচিহ্ন সারা বাড়িতে নেই। এক ধরনের অস্বস্তি, কিছুটা বা ভয় আমার উপর চেপে বসল, যদিও মনে হচ্ছিল এ বাড়িতে দ্বিতীয় কোন জনপ্রাণী নেই, তবুও অন্য কিছুর উপস্থিতি আমি স্পষ্ট বুঝতে পারছি। আরও আশ্চর্য ব্যাপার, একটু লক্ষ্য করলেই বোঝা যাচ্ছে, অস্বাভাবিক দাগগুলো সবই হয় শুরু হয়েছে নয়তো ঘুরে ফিরে গিয়েছে কোটটার কাছে। ভাবলাম, এটা হয়তো কোন বাচ্চা মেয়ের কাজ, তার ঝালরের টানে টানে পায়ের ছাপ মুছে গেছে।

এবারে ভাল করে কোটটার দিকে তাকালাম, পুরনো আমলের সেনাবাহিনীতে এমন কোট ব্যবহৃত হত। দুটো বিবর্ণ রুপোর বোতাম এখনও কোটে লাগান রয়েছে। কোটটা উল্টে দিতেই দেখা গেল তার বাঁ কাঁধের নিচে পেনি আকারের একটা ফুটো। দেখে মনে হয় খুব কাছ থেকে ছোঁড়া কোনো গুলিতেই এই ফুটো হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায় যে কোটের মালিক একদিন কোট পরা অবস্থাতেই নিহত হয়েছিলেন।

এ দৃশ্য দেখে আমি কেমন যেন দুর্বল হয়ে পড়লাম। কেবলই মনে হতে লাগল এ ঘরে আরও অনেক কিছু ঘটে গেছে। নাকে পচা মাংসের গন্ধ পেলাম। মৃদু, হালকা অথচ নিশ্চিত। আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলে দিল এ ঘরে অস্বাভাবিক ভয়ঙ্কর কিছু ঘটবে, আর এখনি ঘটবে।

সব জড়তা কাটিয়ে আমার সম্বিত ফিরে এল। নিজেকে শক্ত করলাম— আমার আবার ভয় কি? কোন বদলোক কি গুণ্ডাশ্রেণীর মানুষ আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আমার পকেটে ছোট কিন্তু অব্যর্থ কার্যকর স্বয়ংক্রিয় রিভলবার রয়েছে। আর ভৌতিক ব্যাপার— যা আমি বিশ্বাস করি না— তাও যদি হয় তবে তারা তো এই দিনের বেলায় আসবে না। যাই হোক, এ জায়গায় কি রকম একটা গা ছমছম ভাব আছে। আমি এখানে কিছুতেই রাত কাটাব না। তবে এই বৃষ্টির দিনে এককাপ গরম কফি না খেয়ে আর খোঁড়া সাইকেলটা মেরামত না করে যাই কি করে?

সামনের ঘরটায় এবারে আমি ঢুকে পড়লাম, মনে হল আগে এটা কারো পড়ার ঘর ছিল। ফায়ার প্লেস দরজার উল্টোদিকে দেওয়ালে। সেখানে এখনো ছাই ও পোড়াকাঠের অবশিষ্টাংশ রয়েছে। পাশেই পড়ে আছে হাতলওয়ালা প্রকাণ্ড একটা লোহার ডাণ্ডা। আমি ছাই পরিষ্কার করে নতুন ভাবে কাঠ সাজিয়ে নিলাম, তবে সেগুলো ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে গেছে। আমার নতুন দেশলাইয়ের

আধখানা খতম হয়ে গেল তবু কাঠে আগুন ধরল না। বরং চিমনির হাওয়ায় উল্টো চাপে সারা ঘর ধোঁয়ায় ভরে গেল, নিচু হয়ে ফুঁ দিয়ে আমি কাঠ ধরাতে চেষ্টা করলাম। যখন এ কাজে ব্যস্ত আছি তখন হঠাৎ মনে হল পাশের ঘরে কে যেন চলাফেরা করছে। তারপরই ধপ্ করে মৃদু শব্দ হল। কেউ যেন তার জামাটা ছুঁড়ে ফেলে দিল। আমি কান খাড়া করে থাকলাম। তারপর অনেকক্ষণ কোনও শব্দ নেই। রিভলবার হাতে পা টিপে টিপে আমি হলঘরে ঢুকলাম। সেখানে কিচ্ছু নেই। একটানা বর্ষণে বাইরের কোন শব্দ শোনারও কোন সম্ভাবনা নেই। দেখলাম, শুধু কোটটার নিচে কিছু মাটি ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠেছে, অবশ্য একটু পরেই তা ভেঙে ছড়িয়ে পড়ল।

ধুৎ! এসব ইঁদুরের কারবার। আমি আবার নিজের কাজে ফিরে গেলাম। চলল আবার সেই ফুঁ দেওয়া, কাঠ খোঁচানো, দেশলাইয়ের কাঠি ঘসা...। এর মাঝে ফের পাশের ঘরে আগের মত শব্দ শুনতে পেলাম। না, খুব জোরে নয়, তবে বেশ স্পষ্ট।

ব্যাপারটা কি? আবার ছুটে হল ঘরে ঢুকলাম, কিন্তু কিছুই নজরে এল না। শুধু দেখি, সেই কোটটার তলায় আর একটা মাটির ঢিবি তৈরি হচ্ছে। তবু একটা অজানা আশঙ্কা আমায় পেয়ে বসল। কেবলই মনে হতে লাগল— এই শূন্য হল ঘরে শুধু আমি নই, আরো কেউ আছে। বাতাসে সেই অশরীরীর উপস্থিতি টের পাচ্ছি।

না, আর নয়। এবারে এ বাড়ি ছেড়ে যেতেই হবে, আমায় লোকে ভীতুই ভাবুক, আর যাই ভাবুক, আমি এখানে আর একমুহূর্তও থাকছি নে।

আমার ঘরে ফিরে এসে দ্রুত হাতে জিনিসপত্র গুছিয়ে আমি হ্যাভারস্যাক বাঁধতে শুরু করলাম। যখন শেষ বাঁধনটা আটকাচ্ছি ঠিক তখনই হল ঘর থেকে একটা চাপা হাসির শব্দ কানে এল, কারো চুপি চুপি হেঁটে আসার পায়ের শব্দ শুনতে পেলাম। তাড়াতাড়ি দরজার দিকে মুখ ঘুরিয়ে রিভলবার হাতে তৈরি হয়ে রইলাম। মুহূর্তে আমার সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল— দরজার ফাঁক দিয়ে দেখলাম একটা ছায়া যেন দ্রুত চলে গেল। তারপর একটু একটু করে দরজাটা খুলতে লাগল, দেখি সেই কোট-হ্যাঙ্গার থেকে নেমে আমার দরজার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। তার দিকে চেয়ে আমি পাথরের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। যেন সম্মোহিত হয়ে গেছি। আমার সমস্ত শরীর অসাড় হয়ে গেছে, শিথিল মুঠো থেকে রিভলবার খসে পড়ল। এ অবস্থাতেও আমি কিন্তু বুদ্ধি হারাইনি। যদিও ভয়ে আমার সমস্ত শরীর ঘুলিয়ে উঠেছিল। নিশ্চিত বুঝতে পারছিলাম শেষের সময় ঘনিয়ে আসছে।

'কোট' ধীরে ধীরে ঘরের ভিতর ঢুকল, কতকটা যেন হেঁচড়ে হেঁচড়ে হাঁটছে। ফাঁকা হাতা দুটো হাওয়ায় দুলছে, ধুলোয় লুটোচ্ছে। ক্রমে সেটা পায়ে

পায়ে এগিয়ে এল আমার দিকে। ভয়ে আমার চোখ দুটো ঠিকরে বেরিয়ে এল। আমি পিছু হঠছি। সে যত এগোয়, আমি তত পিছোই। পিছোতে পিছোতে ফায়ার প্লেসের দেওয়ালে আমার পিঠ ঠেকে গেল, আর পিছোবার পথ রইল না। 'কোট' তখনও ভয়ঙ্কর ভঙ্গিতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে ধীরে ধীরে। তার হাতা দুটো সে ঝেড়ে নিল। তারপর সাঁড়াশীর মত সে দুটো আমার দিকে এগিয়ে দিল। বুঝতে পারলাম যে মুহূর্তে সে আমায় স্পর্শ করবে সেই মুহূর্তে আমি জ্ঞান হারাব।... আশ্চর্য! এই শেষ মুহূর্তে বিদ্যুতের ঝলকের মত আমার মনে পড়ল এসব অশুভ শক্তির পিছনে ঈশ্বরের নাম, চিহ্ন খুব কার্যকরী হয়। তাড়াতাড়ি অশক্ত হাতে আমার বুকে ক্রুশ চিহ্ন এঁকে নিলাম। আরেক হাতে সেই হাতলওলা লোহার ডাণ্ডাটা ধরতে পারলাম। ঠাণ্ডা লোহাটা ধরতেই যেন আমার হারানো শক্তি ফিরে এল। সমস্ত শক্তি সংগ্রহ করে লোহার ডাণ্ডাটা তুলে আমার সামনের ভয়ঙ্কর দুঃস্বপ্নটার দিকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করলাম। মুহূর্তে কি যেন হল, 'কোটটা' আমার পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল, ডিঙিয়ে কোট পেরিয়ে আমি বাইরে চলে এলাম। ফিরে দেখলাম সেটা আবার আগের চেহারা ফিরে পাচ্ছে, হয়ত ফের আমার পিছনে ধাওয়া করবে।

ভয়ে আমি দিগ্বিদিক হারিয়ে ছুটতে শুরু করলাম। ছুটতে ছুটতে জঙ্গল পেরিয়ে ওপারের ছোট শহরে পৌঁছে একটা দোকানের সামনে জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লাম। মনে পড়ছে জ্ঞান হারাবার আগে 'একটু জল' কথা কটি উচ্চরণ করতে পেরেছিলাম।

যখন জ্ঞান ফিরে পেলাম তখন আমায় ঘিরে ছোটখাট একটা ভিড় জমে গেছে। কারা এক পেয়ালা গরম দুধ নিয়ে এল। এক চুমুকে তা শেষ করে কিছুটা চাঙ্গা হলাম। ওদের কাছে জঙ্গলের বাড়ির কথা বললাম। শুনে ওরা বলল, করেছেন কি মশাই? ওখানে গেলে কি কেউ জীবিত ফিরতে পারে! যাক, আরেক পাত্তর দুধ খান। লোকগুলোকে আমার বড় ভাল লাগল, তারা আমায় ধরে নিয়ে সামনের দোকানে নিয়ে একটা চেয়ারে বসাল।

তারপরে আমায় অনেক পুরনো এক কাহিনী শোনাল। হ্যাঁ, ওটা পরিত্যক্ত একটা নীলকুঠি। দেড়শো বছর আগে ছিল জমজমাট। মালিক ছিল বড় বদ মেজাজি। তার মত পাজি মানুষ বড় একটা দেখা যায় না। লোকটা তার বৌকেও একদিন মেরে ফেলে। কুঠির মানুষদের ওপরে ভয়ঙ্কর অত্যাচার করত সে। তখন নীলের চাষ বন্ধ করার জন্য আন্দোলন চলছিল। সেই সুযোগে তার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেতে তারই বন্দুক দিয়ে কেউ ওকে গুলি করে মারে। একেবারে কানের কাছে দাঁড়িয়ে গুলি ছোঁড়ে।

তারপর থেকে কুঠিও উঠে যায়। নীলের চাষ বন্ধ হয়। ও বাড়িতে আর কেউ থাকে না। ও বাড়ি থেকে জ্যান্ত কেউ আজও ফিরে আসেনি।

লাখ টাকা দিলেও আপনি এ শহরের কাউকে ঐ বাড়িতে রাত কাটাবার জন্যে পাঠাতে পারবেন না।

আমি প্রাণে বেঁচে ফিরে এসেছি। আমার বেড়াবার সরঞ্জাম আর নতুন কেনা সাইকেলটা ঐ আস্তানায় হয়তো এখনো পড়ে আছি। ওগুলো সবই আমার খুব পছন্দের জিনিস। তবু কেউ যদি ওগুলো ওখান থেকে নিয়ে নেয় আমি বলছি, কোন স্বত্ব দাবি করব না। ☐

কান্না/ অমিতাভ বসু



কতশত স্মৃতি বিজড়িত এই বাড়ি কে জানে। বহু বছরের নিষ্কলুষ আভিজাত্য, গম্ভীর উদ্ধত প্রতাপের ভঙ্গি এবং সীমাহীন প্রাকৃতির নিস্তব্ধতার বালাপোষ মুড়ি দিয়ে বাড়িটির গোটা সীমানাটা যেন নিদ্রায় মগ্ন হয়ে আছে। এই বাড়ির গায়ে একটি ঝোলানো বিজ্ঞাপন 'বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে অথবা বিক্রি হবে।'

মিসেস মীনা চাকলাদার কথার ফুল ছড়ানো বাড়ির মালিকের সঙ্গে কথা বলছিলেন। বাড়িটি মিসেস চাকলাদারের পছন্দ হওয়ায় বাড়িওয়ালার আনন্দের যেন সীমা ছিল না। তাহলে শেষ পর্যন্ত ১৯নং বাড়ির একটা গতি হল।

হঠাৎ করে এবারে মিসেস চাকলাদার প্রশ্ন করলেন— আচ্ছা কতদিন বাড়িটা খালি পড়ে আছে? প্রশ্নের আকস্মিকতায় বাড়িওয়ালা প্রথমে সামান্য থমকে গিয়ে বলল মানে, ইয়ে, এই সামান্য কিছুদিন আর কী। মিসেস চাকলাদার বললেন— ওঃ তাই বুঝি! বাড়িওয়ালা আবার মাথ নেড়ে সেকথায় সম্মতি জানালো।

বাড়ির ভিতরে এলেন মিসেস। বাড়িওয়ালা সঙ্গে আছেন। বাড়ির অভ্যন্তরে হলঘরের অস্পষ্ট আলোতে কেমন যেন একটা থমথমে ভাব। কল্পনাবিলাসী কোন নারী হয়তো বা আতঙ্কে কেঁপে উঠবে। কিন্তু মিসেস চাকলাদার খুব বাস্তববাদী মহিলা। তার পুষ্ট স্বাস্থ্যোজ্জ্বল দেহবল্লরী, ঘন বাদামী কেশরাশি এবং গভীর দুটি চোখে আছে বিরাট প্রত্যয় এবং বাস্তবের প্রতিচ্ছায়া। কল্পনা বা ভাবালুতার কোন স্থান যেন কোথাও নেই।

গোটা বাড়িটা তিনি বিভিন্ন মন্তব্যের মাধ্যমে ঘুরে ঘুরে দেখলেন। আর শেষ পর্যন্ত বাড়ির এমন একটা স্থানে এসে দাঁড়ালেন— যেখান থেকে বাড়ির চারধারের সবকিছু দৃষ্টিতে আসে। হঠাৎ বাড়িওয়ালাকে তিনি প্রশ্ন করেন— আচ্ছা বাড়ির ব্যাপারটা কি ভেঙে বলুন তো? বাড়িওয়ালা খুব সংযত হয়েই বলল বোধহয় অনেকদিন খালি পড়ে থাকবার জন্যে একটু পোড়ো বাড়ির মত লাগছে। মিসেস এবারে একটু চড়া কণ্ঠে বললেন— সব বাজে কথা। এতবড় একটা বাড়ি অথচ ভাড়া কত কম। নিশ্চয়ই এর পেছনে অন্য কোন কারণ আছে। হয়তো বা ভূতুড়ে বাড়িও হতে পারে। বাড়িওয়ালা রেড্ডি চুপচাপ। একবার কেবল ঠোঁট জোড়া নীরবে চুষে নিল। মিসেস বলে চললেন— অবশ্য ভূতপ্রেতে আমার কোন বিশ্বাস নেই। বাড়ি ভাড়া নেওয়ার জন্যে সেটা কোন ব্যাপারই নয়। তবে আমার চাকর-বাকরগুলো বড় সন্দেহ বাতিকগ্রস্থ। একটুতেই ভয়ে মরে। আপনি দয়া করে বলুন তো— সত্যিই কেন এমন বাড়িটার এই দুরবস্থা।

—এ সম্পর্কে আমি তো কিছু জানি না। আপনি কি বলছেন?

—দেখুন বাড়িওয়ালা মশয়, আর ন্যাকা সাজবার চেষ্টা করবেন না। আপনি সবই জানেন। বলবেন তো বলুন, হয়তো আমার পক্ষে এ বাড়ি নেওয়া সম্ভব নাও হতে পারে। কি হয়েছিল এ বাড়িতে? খুন?

এমন প্রাসাদোপম বাড়ির মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হওয়ার ভয়ে বাড়িওয়ালা রেড্ডি প্রায় আর্তনাদের সুরে বলে ওঠে— না, না।

—হ্যাঁ হ্যাঁ, একটি শিশু—।

—শিশু?

—হ্যাঁ শিশু। শিশু।

বাড়িওয়ালা ভেঙে পড়বার ভঙ্গিমায় বলে— আমি বিশদ বিবরণ জানি না। তবে নানা জনে নানান কথা বলে। আমি এ বাড়িটা নেওয়ার আগে যতটুকু জেনেছি— প্রায় বছর তিরিশেক আগে মহেন্দ্র নামে এক ভদ্রলোক এ বাড়িতে থাকত। একটু অদ্ভুত চরিত্রের লোক ছিলেন। তার বাড়িতে কোন চাকর-বাকর ছিল না। ওর নিজের কোন বন্ধুবান্ধব ছিল না। দিনের বেলায় সে কখনও বাড়ির বাইরেও বেরুত না। তার একটি শিশুপুত্র ছিল। মাস দুয়েক এ বাড়িতে থাকবার পরে এই লোকটি একদিন লণ্ডনে পালিয়ে গেল। শিশুটি এ বাড়িতেই পড়ে থাকল। পরে জানা যায় কোন অপরাধমূলক কাজের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্যে পুলিস একে খুঁজে বেড়াচ্ছে। হয়তো সেই কারণেই ওর এই সরে পড়া। আর ওই সেই শিশুটি অভিভাবকহীন হয়ে এ বাড়িতে থেকে থেকে একদিন অনাহারে অযত্নে মারা গেল এবং মাঝে মাঝে তখন এ বাড়ির মধ্যে গভীর রাত্রে প্রতিবেশীরা শিশুটির কান্না শুনতে পেত।

মিসেস চাকলাদার বললেন— তাহলে সেই শিশুটির প্রেতাত্মাই কি এ বাড়িতে ঘুরে বেড়ায়?

বাড়িওয়ালা প্রশ্নটার সোজা উত্তর এড়িয়ে গিয়ে বলে— জানেন মিসেস, এ বাড়িতে ভয়ের কোন কিছু আজ পর্যন্ত দেখা যায়নি। তবে অনেক গুজব শুনবেন, এ বাড়িতে রাত্রে কান্নার শব্দ শোনা যায়।

পাহাড়ী অঞ্চল। জায়গাটা এমনিতেই নির্জন।

মিসেস চাকলাদার বললেন— এ বাড়ি আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তাছাড়া এই সামান্য ভাড়ায় এমন বাড়ি আশাই করা যায় না। তবুও আমি সামান্য আর একটু চিন্তা করে আপনাকে জানাব মি: রেড্ডি।

এবং মিসেস বাড়িটি নিলেন শেষ পর্যন্ত। গোটা বাড়ি পরিষ্কার করে তিনি সাজিয়ে ফেললেন।

—আচ্ছা বাবা, এখন বাড়িটা কেমন দেখাচ্ছে?

বৃদ্ধ, মুহ্যমান, স্বপ্নময় চোখ নিয়ে রোগা ভদ্রলোক বললেন— সত্যিই চমৎকার দেখাচ্ছে মা। এখন আর কেউ এ বাড়িকে ভূতুড়ে বলবে না।

—বাবা তুমি কি সব আবার বাজে কথা কইছ।

ঠিক আছে, ঠিক আছে স্বীকার করছি ভূত বলে কিছু নেই।

—বাবা তুমি আবার এসব কথা দীপের কাছে কখনও বোল না। কারণ দীপ বড় কল্পনাপ্রবণ। আমার ছেলেটাকে নিয়ে বড় ভাবনা হয়।

মিসেস চাকলাদারের বাবা ও ছোট ছেলে দীপকে নিয়ে ছোট সংসার। বাইরে তখন টিপ্ টিপ্ করে বৃষ্টি পড়ছিল। বাড়ির বন্ধ জানালার কাচের সার্শিতে বৃষ্টির ফোঁটা। মিসেস চাকলাদারকে মি: নাহা বললেন, শোন বৃষ্টির শব্দ শুনে মনে হচ্ছে এ যেন কোন শিশুর পায়ের শব্দ। নয় কি?

—বৃষ্টি। বৃষ্টিই। সে আবার শিশুর পায়ের শব্দের মত হবে কেন?

এই মুহূর্তে মি: নাহা কোন বিশেষ শব্দ শোনবার ভঙ্গিতে সম্মুখে ঝুঁকে পড়ে বললেন— ওই শোন, সেই পায়ের শব্দ।

মিসেস হেসে উঠে বলেন— আরে বাবা ও পায়ের শব্দ দীপের। সে নিচে নামছে! মি: নাহা না হেসে পারলেন না, হলঘরে বসে চা পান করতে করতে ওদের কথা হচ্ছিল। মি: নাহা এতক্ষণ সিঁড়ির দিকে পেছন করে বসে ছিলেন। এবারে চেয়ারটা ঘুড়িয়ে সিঁড়ির দিকে মুখ করে বসলেন। সত্যিই দীপ বিষন্ন মুখে ধীরে ধীরে নিচে নামছিল সেই সিঁড়ি দিয়ে। চোখে-মুখে তার ক্লান্তির ছায়া। কার্পেটহীন, ন্যাড়া শালকাঠের সিঁড়িগুলি ভেঙে সে তার মার সামনে এসে দাঁড়ালো। ওর দাদু বলতে লাগলেন— আমি নিশ্চিত করে বলতে পারি পায়ের শব্দের সঙ্গে মিলিয়ে অন্য কোন অনুসরণকারী ওর পেছনে পা টেনে টেনে আসছিল। সে চলার শব্দ ছিল বড় বেদনাদায়ক।

দীপ তখন টেবিলে সাজানো কেকগুলো দেখছিল। মা একটা কেক তার হাতে দিয়ে বলেন— এ বাড়ি তোমার কেমন লাগছে সোনামণি। সে এক গাল হেসে বলে— চমৎকার। মুখে কেক পুরে দিয়ে বলে— মা, এ বাড়িতে চিলেকোঠা আছে? আমি দেখব।

মিসেস বললেন— আমরা কাল চিলেকোঠা দেখব বাবা। এখন তুমি খেলা করগে যাও। দীপ মহা আনন্দে সেখান থেকে বেড়িয়ে এল। মি: নাহা তখনও কান পেতে বৃষ্টির শব্দ শুনছিলেন। বললেন— বোধহয় আমি বৃষ্টির শব্দই শুনছিলাম। কিন্তু কি আশ্চর্য— ঠিক যেন পায়ের শব্দের মত। এবং সেরাত্রে তিনি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলেন। একটা বড় শহরের মধ্য দিয়ে তিনি হেঁটে চলেছেন। এযেন এক শিশু রাজ্য। হাজার হাজার শিশুর কলকাকলিতে যেন আকাশে, বাতাসে, নবকিশলয়ে মাতন জেগেছে। আর মি: নাহাকে দেখে তারা যেন ভিড় করে এসে বলছে তারা কোথায়? তাদের জন্য কি এনেছেন? তিনি তাদের কথা বুঝতে পেরে যেন হতাশায় মাথা নাড়ছেন। আর মলিন মুখ শিশুরা আকুলভাবে সব কেঁদে উঠল।

ঘুম ভেঙে গিয়েছিল সেই মুহূর্তে মি: নাহার। স্বপ্নও তখন মিলিয়ে গেছে। মিলিয়ে গিয়েছে সেই শিশুরাজ্য। কিন্তু সেই শিশুদের বিষণ্ণ কান্নার রেশটা তখনও যেন তার কানে লেগে আছে। জেগে উঠে তখন যেন তার মনে হল দীপ তখনও যেন নিচের ঘরে ঘুমুচ্ছে। তাহলে দীপও কি এ কান্নার শব্দ শুনতে পেয়েছে। রাত তখন অনেক বাকি। মি: নাহা বিছানায় উঠে বসে ম্যাচের কাঠিতে আগুন জ্বেলে সিগারেট ধরাতে যাবেন। আলোর ঝলকের সঙ্গে সঙ্গে কোথায় যেন সেই কান্না মিলিয়ে গেল।

মি: নাহা তার মেয়ে মিসেস চাকলাদারকে কিছুই এ সম্পর্কে বললেন না। তার দৃঢ় প্রত্যয় জন্মেছিল এ কান্না মোটেই কোনো উদ্ভট কল্পনা নয়। বাজে ধারণা নয়। কারণ একদিন দিনের বেলায়ও সে এই একই কান্না শুনেছে— তীব্র বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ সেই বৈশাখের গাছের ডালে ডালে ধাক্কা খেয়ে একটি শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি করছিল এই বাড়িটাকে ঘিরে। বেদনামথিত সে কান্না— কি করুণ। অথচ ছিল কত নির্মম। আর সেই কান্না তার মত এ বাড়িতে আরো অনেক দাসদাসী শুনেছে। বাড়ির চাকরবাকরদের একদিন তিনি এ ঘটনা নিয়ে আলোচনা করতে পর্যন্ত শুনেছেন।

সকালে চায়ের টেবিলে দীপকে প্রফুল্লই লাগছিল। মি: নাহা বুঝলেন যে কান্নার শব্দ সেই রাত্রে তিনি শুনেছেন তার সঙ্গে দীপের কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না। তিনি দীপকে প্রশ্ন করেন— কাল ঘুম হয়েছিল দাদু। মিসেস চাকলাদারই উত্তরটা ছেলের হয়ে তার বাবাকে দিয়েছিল— খুব ভাল ঘুমিয়েছে দীপ কালকে। মি: নাহা বুঝলেন, তবে সে কান্না ছিল কোন অশরীরী

শিশুর। কেবল মিসেস চাকলাদার এসব শব্দ শুনতে পান না। অতীন্দ্রিয় লোকের কোনো শব্দ অনুভবের শক্তি তাঁর ছিল না। তবুও তিনি একদিন মনে খুব আঘাত পেলেন যেদিন একমাত্র ছেলে দীপ বলল— মা, আমি ঐ ছেলেটির সঙ্গে খেলব।

—কোন ছেলেটির সঙ্গে তুমি খেলতে চাও?

—আমি তার নাম জানি না। তুমি দেখনি, সেই আমাদের চিলেকোঠার মেঝেতে বসে কাঁদছিল যে ছেলেটা।

কিন্তু আমাকে দেখেই সে পালিয়ে গিয়েছিল। আমি তারপর নিজের মনে খেলছিলাম। হঠাৎ একবার চেয়ে দেখি সে দূরে বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি তাকে কত ডাকলাম— কিন্তু সে এল না। আমি আরতিকে বলেছিলাম— আমি ওর সঙ্গে খেলব। ওকে ডেকে দে। তাতে আরতি আমাকে ধমক দিয়ে বলে— কেন, পাড়ায় অন্য কোনো ছেলে নেই।

—আরতি ঠিকই তো বলেছে। এ পাড়ার অন্য আর ছেলে নেই নাকি।

—কিন্তু মা, আমার যে ওকে খুব ভাল লাগে। আমি যদি ওর সঙ্গে খেলা করতে পারতাম তাহলে খুব খুশি হতাম।

মিসেস চাকলাদার এরপর ছেলেকে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু পিতার ইঙ্গিতে থেমে গেলেন। মি: নাহা নাতিকে বলল— বেশ তো দীপ তুমি তার সঙ্গে খেলবে। কিন্তু আমাকে বল তো তাকে তুমি কি করে দেখতে পাও? আমরা তো দেখি না।

—কেন আমি যে খুব বড় হয়ে গেছি দাদুভাই। মাথা উঁচু করেই তাকে দেখতে পাই। এই বলে দীপ চলে গেল। মিসেস চাকলাদার করুণ দৃষ্টিতে তার বাবার দিকে দেখলেন। বললেন— বাবা, এ বড় অদ্ভুত। বাড়ির চাকর-বাকরের কথায় তুমি দীপকে বিশ্বাস করতে বল।

মি: নাহা বললেন— কোন চাকরবাকরই ওকে কিছু বলেনি মা। আমি যার কান্না শুনতে পাই ও সেই তাকেই দেখেছে। বোধহয় দীপের মত বয়স থাকলে, সেই সরল মন থাকলে আমিও তাকে দেখতে পেতাম।

মিসেস চাকলাদার তার বাবার কথার প্রতিবাদ করে বললেন— এসব যেমন বাজে তেমনি আজগুবি— তা না হলে আমি দেখতে বা শুনতে পেতাম না। মি: নাহা কিন্তু নিরুত্তর। যেন কোনো উত্তেজনা নেই। মেয়ে বলে চলেন, কেন যে তুমি বাবা দীপকে বললে যে সে ঐ ছেলেটার সঙ্গে খেলতে পারে, আমি কিন্তু এর কোনো মানে খুঁজে পাই না।

—কেন?

—কেন নয়? অন্ধবিশ্বাসে তোমার আস্থা আছে। তা না হলে এর তাৎপর্য তুমি উপলব্ধি করতে পারতে।

—আমি যদি বলি মীনা অন্যান্য শিশুর মত দীপেরও অন্ধবিশ্বাস আছে। কেবল আমরা যখন বড় হই তখনই এই বিশ্বাসের আলো আমাদের মন থেকে সরে যায়।

কিন্তু বার্দ্ধক্যে উপস্থিত হলে অন্ধ বিশ্বাসের যে অস্পষ্ট অনুভূতি আমাদের মনে ক্ষীণ আলোকসম্পাত করে শৈশবে এরই উজ্জ্বল আলোর দীপ্তি সারাটা মনকে রাঙিয়ে রাখে। তাই আমি মনে করি দীপই— কেবল এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

মিসেস চাকলাদার বললেন— আমি এর মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারি না।

—আমিও পারি না মীনা। তবে এটুকু বেশ বুঝতে পারছি শিশুটা যেন কোনো দুঃসহ বেদনা আর কষ্ট থেকে মুক্তি চাইছে। আর সেটা কি করে সম্ভব আমি বলতে পারব না। কিন্তু একটা শিশুর বুকভাঙা কান্নার কথা আমি কিছুতেই ভাবতে পারছি না। আর এই আলোচনার মাসখানেকের মধ্যে দীপ খুব অসুস্থ হয়ে পড়ল। ডাক্তাররা বললেন — অসুখটা নাকি খুব কমপ্লিকেটেড। মি: নাহাকে হাউজ ফিজিসিয়ান ডাঃ এস.জি. মুনশি পরিষ্কার বললেন, দীপের বাঁচার বিশেষ কোনো আশা নেই। কারণ ওর ফুসফুসটা দীর্ঘদিন যাবৎ ভুগে ভুগে বড় হয়ে গেছে।

দীপ সারাদিন শুয়ে থাকে। মাঝে মাঝে তার প্রতিবেশী আঙ্কেল মি: এস.এম. মেটা তাকে দেখতে আসেন। মি: মেটা একটা বড় ওষুধ কোম্পানি এস.পি.এল-এর মার্কেটিং ডাইরেক্টর। তিনি দীপের দাদু মি: গণেশ নাহার সঙ্গে অনেক আলোচনা করে আরো অনেক ডাক্তারের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু সব ডাক্তারের এক কথা— এ খুব কঠিন রোগ। বাঁচা মুশকিল।

এর মধ্যে একদিন আর এক ঘটনা ঘটল। মিসেস চাকলাদার যখন দীপের মাথার কাছে বসে একদিন, তখন যেন সেই ঘরে অন্য একটি শিশুর উপস্থিতি অনুভব করলেন। সেই ঘরের শন্‌শনে বাতাসে শিশুটির কান্না যেন মিশেছিল। ক্রমেই সেই কান্নার করুণ শব্দ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হতে থাকে। মিসেস চাকলাদার সে কান্না শুনে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

দীপের অসুস্থতা ক্রমশ বেড়ে গেল। সে প্রলাপের ঘোরে মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে— মা, ঐ তো সেই ছেলেটা। আমাকে ডাকছে। আমি ওর সঙ্গে খেলব। আর এই প্রলাপের সঙ্গে সঙ্গে সে যেন ক্রমশ ঝিমিয়ে পড়তে লাগল। প্রায় নিঃসাড় নিস্পন্দ দেহ। শ্বাস-প্রশ্বাস বইছে কিনা বোঝা কঠিন। যেন কোন বিস্মৃতির অতলে সে তলিয়ে যাচ্ছে।

তারপর এল নীরব, নিথর রাত— নিরালা প্রশান্তিতে সেই রাতভরা। হঠাৎ আবার দীপের দেহে যেন উত্তাপের উত্তেজনা এল। সে চোখ মেলে

চাইল। তার সেই দৃষ্টি অদূরে উন্মুক্ত দ্বারপথে আবদ্ধ। কি যেন বলবার চেষ্টা করল দীপ। তার মা সেকথা শোনবার আশায় সামনে ঝুঁকে পড়লেন। দীপ কেবল অস্পষ্ট করে কটি কথা বলল— "আসছি। আসছি!" তারপর ওর মাথাটা একধারে কাত হয়ে পড়ে গেল।

মিসেস চাকলাদার ভয়চকিত ও বিমূঢ়ভাবে তাঁর বাবার কাছে ছুটে গেলেন। মনে হল তার পাশে একটি অশরীরী শিশু প্রাণ খুলে হাসছে। উজ্জ্বল ঝরনার মত সেই হাসি বায়ুস্তরে তরঙ্গায়িত হয়ে উঠল।

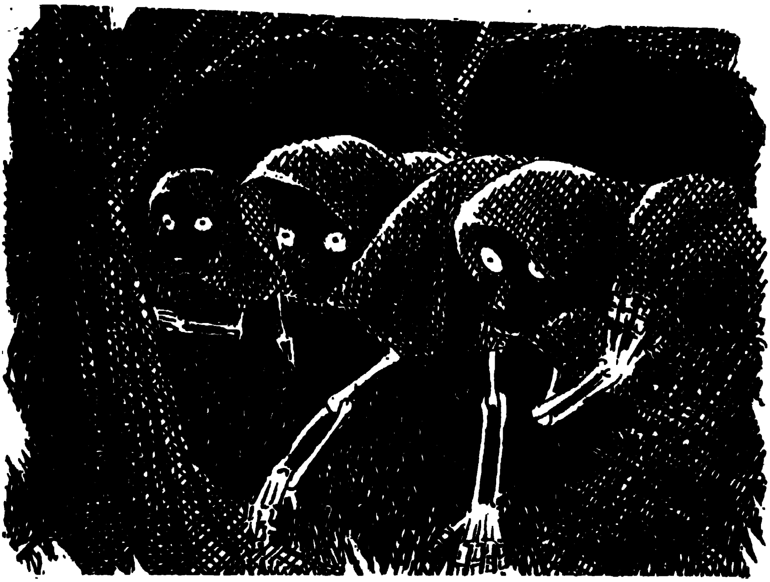
—আমার সব শেষ হয়ে গেল বাবা। আমার বড় ভয় করছে। কান্নায় ভেঙে পড়লেন মিসেস। মি: নাহা মেয়েকে সান্ত্বনা দিতে থাকেন। ঠিক সেই সময় একটা দমকা হাওয়া তাঁদের সচকিত করে শূন্যে মিলিয়ে গেল। সে হাসি অবশ্য আর নেই। তবে বায়ুস্তরে জেগেছিল কতগুলো স্পন্দন। ওরা শুনতে পেল কতকগুলো পায়ের শব্দ। আর সে শব্দ যেন খুব দ্রুত সরে যাচ্ছে।

ওরা দৌড়ে দরজার কাছে এলেন। আবার সেই শব্দ। সেগুলো যেন সিঁড়ি বেয়ে তরতর করে নেমে আসছে। মিসেস চাকলাদার উন্মাদিনীর মত মুখ তুলে চাইলেন। তিনি দেখলেন বিলীয়মান দুটি শিশুর চারটি পা। মিসেস চাকলাদার ভয়ে পাংশুবর্ণ ধারণ করলেন। তিনি থরথর করে সেই সঙ্গে কাঁপছিলেন। ওঁর বাবা ওঁকে জড়িয়ে ধরলেন। আঙুলের নির্দেশে ওকে দেখতে বললেন,— ঐ যে।

জন্মজন্মান্তরের চেনা দুটি শিশুর পদশব্দ বায়ুস্তরে মৃদু কম্পন সৃষ্টি করে কোন অমৃতলোকে মিলিয়ে গেল। তারপর? কেবল জেগে রইল সীমাহীন এক অখণ্ড নীরবতা— যাকে বারবার খান খান করে ভেঙে দিচ্ছিল একটি কান্না,— মিসেস চাকলাদারের কান্না। সে কি কান্না...। ❑



মজার ভূত/ শেখর বসু



জন্মদিনে অনেক উপহার পেয়েছে রুমনি। উপহারের মধ্যে আছে ছবির বই, চকোলেটের বাক্স, স্টিকার, ছবিওয়ালা রুলার, নাচিয়ে পুতুল আর এই রকম অনেক কিছু। কিন্তু ওর সব চাইতে ভাল লেগেছে বাবাইয়ের উপহার। বাবাই ওকে দিয়েছে মস্ত এক বাক্স রঙিন পেনসিল আর লম্বা-চওড়া একটা ড্রয়িং-খাতা।

কেক, ঘুগনি আর আইসক্রিম খেয়ে এক-এক করে সবাই চলে যাওয়ার পরেই রঙিন পেনসিল দিয়ে নতুন খাতায় ছবি আঁকতে বসে গিয়েছিল রুমনি। এক-এক 'টানে' এক-একটা ছবি। কোনোটা নাকি বাঘ, কোনোটা নাকি পাখি, কোনোটা নাকি খরগোশ।

রুমনির বাবা অফিস থেকে বাড়ি ফিরে এসে ছবির খাতাটা টেনে নিয়ে বসল, "আরে! এ তো দেখছি সব ভূতের ছবি, তুই তো দারুণ ভূতের ছবি আঁকতে পারিস!"

রুমনির বলতে ইচ্ছে করছিল, কে বলল এগুলো ভূতের? কিন্তু বলতে গিয়েও বলল না। বাবার প্রশংসা শুনে ও খুব খুশি হয়ে উঠল। তারপরেই ভূত সম্পর্কে ওর আগ্রহ বেড়ে গেল ভীষণ। মাকে, বলে, ভূতের গল্প বলো। বাবাকে বলে, ভূতের গল্প বলো। ভূতের গল্প শুনিয়ে-শুনিয়ে হাঁপিয়ে গেল বাবা-মা। কিন্তু রুমনির বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই।

দিনরাত ও ভূতের গল্প শোনে আর ভূতের ছবি আঁকে। ভূতের ছবিগুলো

এখন সত্যি-সত্যিই ভূতের মতো। রোগা টিংটিংয়ে শরীর, প্রকাণ্ড মাথা, গোল-গোল চোখ, আর হাত-পাগুলো ইয়া লম্বা-লম্বা।

ভূতের ছবি এঁকে-এঁকে বাবাইয়ের দেওয়া সেই ড্রয়িং-খাতা শেষ হয়ে গেছে কবে। কিন্তু তা বলে ভূতের ছবি আঁকার বিরাম নেই। যেখানেই কাগজ আছে সেখানেই ও ভূতের ছবি এঁকে ফেলেছে। শেষে ঘরের দেয়াল-থেকেও বাদ গেল না, সব জায়গায় অদ্ভুত-অদ্ভুত সব ভূতের ছবি। তারপরেই ঘটল সেই ঘটনাটা। রুমনি হঠাৎ একদিন আঁ-আঁ করে চেঁচিয়ে উঠল।

ওর চিৎকার শুনে পাশের ঘর থেকে মা ছুটে এসে দেখে, রুমনি মেঝের ওপর বসে কাঁপছে। কী ব্যাপার? মাকে দেখে গায়ের কাঁপুনি কমল রুমনির। মা ওকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বলল, "কি হয়েছে রুমনি? কাঁদছ কেন তুমি?"

অনেক কষ্টে কান্না থামিয়ে রুমনি বলল, "ভূত।"

"ভূত! কোথায় ভূত?"

রুমনি ভয়ে-ভয়ে আঙুল তুলে ভূতটাকে দেখাল।

ভূত দেখে মা'র সে কী হাসি! হাসি আর থামেই না। শেষে কোনোমতে হাসি থামিয়ে বলল, "বোকা মেয়ে কোথাকার! ভূত কোথায়, ও তো ভূতের ছবি। আর ভূতের ওই ছবিটা তো তুমিই এঁকেছ, তাই না?"

মা'র হাসি শুনে রুমনির ভয় অনেকটা কমে গিয়েছিল। ও আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে বলল, "হ্যাঁ"।

জবাব শুনে আর একবার গলা ছেড়ে হেসে উঠল মা। "নিজের আঁকা ছবি দেখে কেউ ভয় পায় বুঝি!"

এবার বোধহয় একটু লজ্জা পেল রুমনি। "কিন্তু ও তো ভূত।"

মা আর একবার হেসে ওকে সাহস দিয়ে নিজের কাজ সারতে চলে গেল।

তবে রুমনির ভয় পাওয়া থামল না, আর থামল না ভূতের ছবি আঁকা।

ভূতের ছবি ও আঁকবেই, আর আঁকার পরে সেই ছবি দেখে ভয় ও পাবেই।

ওর বাবা-মা খুব দুশ্চিন্তায় পড়ল। এই নিয়ে অদ্ভুত ব্যাপার! ভয় পেলে ভূতের ছবি আঁকার দরকার কি?

মা বলল, "তুমি আর ভূতের ছবি একদম আঁকবে না। আঁকতে ইচ্ছে করলে বাঘের ছবি, শেয়ালের ছবি, হরিণের ছবি— এই সব শুধু আঁকবে, কেমন?"

ওর বাবা রুমনির জন্যে অনেকগুলো রঙিন ছবির বই কিনে দিয়ে বলল, "দেখ ছবিগুলো কী সুন্দর দেখতে! তুমি এইরকম ছবি আঁকতে পারবে? যদি পারো তোমাকে আমি অনেক ক্যাডবেরি এনে দেব।"

রুমনি লক্ষ্মী মেয়ের মতো বাবা-মার কথা শুনে খাতা পেনসিল বগলে নিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল। বাবা-মা ভাবল, তার বিপদ কাটল এবার। কিন্তু কোথায় বিপদ কাটা! একটু বাদেই রুমনির ভয়-পাওয়া চিৎকার ভেসে এল এ ঘরে। পড়িমরি করে বাবা-মা ছুটে গিয়ে দেখে, রুমনি আবার ভূতের ছবি এঁকে সেই ভূতটা দেখে আঁ-আঁ করছে।

সেদিন সন্ধেবেলায় ছোটদাদু এসেছিল ওদের বাড়িতে। সব শুনে দাদু বলল, "দিদিভাই, তুমি ভয় পাও কেন? তুমি তো মজার-মজার ভূতের ছবি আঁকো। মজার চেহারায় ভূতেরা খুব মজার হয়, তুমি ওদের সঙ্গে ভাব করে ফেলবে এবার। ভাব করলে ওরা তোমার সঙ্গে খেলবে, গল্প করবে, কত মজা হবে তখন।"

ছোটদাদুর কথা রুমনি খুব মন দিয়ে শুনল। তারপর ছোটদাদু চলে যেতেই আবার রঙিন পেনসিল আর খাতা নিয়ে আঁকতে বসে গেল ভূতের ছবি। রুমনি কখন ভয় পাবে ভেবে ওর বাবা-মা আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছিল, কিন্তু অবাক কাণ্ড, বেশ কয়েকটা বিদ্‌ঘুটে ভূতের ছবি আঁকার পরেও রুমনি ভয় পেল না।

শুধু সেদিন বলেই নয়, ভূতের ছবি এঁকে রুমনি আর কখনোই ভয় পায়নি। বরং ভূতের ছবি আঁকার পরে ওকে বেশ খুশি-খুশি দেখায়।

একদিন ওর মা আড়াল থেকে শুনল, ঘরের মধ্যে রুমনি বকবক করে যাচ্ছে। কে এসেছে দেখার জন্যে ঘরে ঢুকে মা দেখে কেউ নেই। মেঝেয় পা ছড়িয়ে বসে ছবি আঁকতে আঁকতে সমানে বকবক করে যাচ্ছে রুমনি। অবাক হয়ে মা বলল, "কী বলছ তুমি তখন থেকে?"

একটু হেসে উত্তর দিল রুমনি, "গল্প করছি।"

"কার সঙ্গে?"

"এর সঙ্গে।" সবে আঁকা একটা ভূতের ছবির দিকে আঙুল তুলে জবাব দিল রুমনি। অমনি রুমনির ছোটদাদুর কথাটা মনে পড়ে গেল রুমনির মা'র। দারুণ কাজ হয়েছে তো কথাটায়। ভয়ের ভূত রাতারাতি হয়ে গেছে মজার ভূত! মজার ভূতের সঙ্গে আবার ভাব হয়েছে।

রুমনির মা হাসতে হাসতে বলল, "তা, কী গল্প হচ্ছিল তোমার ভূত-বন্ধুর সঙ্গে?" রুমনি একটুখানি চটে উঠল। "তুমি এখন যাও তো, তুমি থাকলে ও আমার সঙ্গে গল্প করবে না।"

রুমনির আঁকা ভূতের লম্বা-লম্বা হাত, লম্বা-লম্বা ঠ্যাঙ, মাথাটা পেল্লায়, মুখটা হাসি-হাসি। সেদিকে তাকিয়ে মা বলল, "তোমার ভূত-বন্ধু খুব লাজুক না?"

"আহ্! তুমি যাও তো।"

মা আর কী করবে? গল্পের সময় বিরক্ত করা ঠিক নয় ভেবে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। একটু বাদেই রুমনি আবার গল্প জুড়ে দিল ওর ভূত বন্ধুর সঙ্গে। ❑

*

কে পিছনে? / সৌরেন মিত্র



আমার কথা

৬ নভেম্বর '৮৫

ছোট্ট বাড়িটি। চারধারে শাল-মহুয়ার জঙ্গল। বাড়ির সামনেই একটা টিলা। আশপাশে বিশেষ বাড়ি নেই। গতকাল আমি এখানে এসেছি কিছুদিন থাকব বলে। শুধু থাকা আর বই পড়া। আসলে আমি এখানে এসেছি অবসরের আনন্দকে পেয়ালায় ভরে তারিয়ে তারিয়ে পান করব বলে। তাই আসার সময় কাউকে সঙ্গে নিইনি। একাই এসেছি এই পাহাড়পুরে। গত কয়েকমাস শরীরের ওপর দিয়ে ধকল গেছে প্রচণ্ড। এখনও শরীরের প্রতিটি কোষে জমাট বেঁধে আছে অবসাদ।

আমি একটা মাসিক পত্রিকার সম্পাদক। শারদীয় সংখ্যা বাজারে বেরবার পর কিছুদিন ছুটি পেয়েছি। আমি যে কাগজটির সম্পাদনা করি সেটি বড়দের নয়, ছোটদের। বেশ ভালই বিক্রি হয়। এবার মনে মনে এঁচে রেখেছি খুব শিগ্গির ভূতের গল্প নিয়ে একটা বিশেষ সংখ্যা বার করব। কিন্তু মনোমত গল্প জোগাড় করে উঠতে পারিনি। দু-একটা গল্প অবশ্য পেয়েছি যা আমি সঙ্গে করে এনেছি অবসর মত সম্পাদনা করব। কিন্তু একটা কথা, সুবীর মল্লিককে আমি খুঁজে পেলাম না। ভদ্রলোকের লেখার হাতটি বড় সুন্দর ছিল। উনি ছোটদের জন্যেই লিখতেন। বেশ নামও করেছিলেন কিন্তু এখানে আসার আগে কলকাতায় অনেক অনুসন্ধান করেও ওঁর পাত্তা পেলাম না। শুনলাম উনি

কি একটা মানসিক রোগে ভুগছিলেন। কিছুদিন হল উনি নাকি নিরুদ্দেশ। নিরুদ্দেশের আগের দিন একটি সেলুনে ওঁকে নিয়ে নাকি কি একটা গোলমাল হয়। গোলমালটা যে কি সেটা অবশ্য আমি জানি না, আর জানার চেষ্টাও করিনি। এই জায়গাটা সুবীর মল্লিকেরও খুব প্রিয়।

৮ নভেম্বর '৮৫

এই পাখিডাকা বিকেলে ঘরে থাকতে ইচ্ছে করছে না। আমার বাড়ির পাশেই একটা পাহাড়ী নালা। নালার ওপরে একটা সাঁকো। আমি সাঁকোর ওপরে এসে দাঁড়ালাম। চারধার নিস্তব্ধ। এখানে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ পাখির ডাক শুনে ঠিক করলাম স্টেশনে যাই একটু বেড়িয়ে আসি।

নির্জন ফাঁকা রাস্তা ধরে হাঁটছি। দু-চারজন আদিবাসী নিজেদের ভাষায় কথা বলতে বলতে যাচ্ছে।

পাহাড়পুর স্টেশন একেবারেই ছোট্ট। সারাদিন দু-খানা মাত্র প্যাসেঞ্জার ট্রেন যাওয়া-আসা করে। আমি যে বাড়িটা ভাড়া নিয়ে আছি সে বাড়ির মালিকের কাছে শুনেছি মাঝে মাঝে রাতবিরেতে স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে হাতির পাল বেড়াতে আসে। সে দৃশ্য দেখারও একটা লোভ আমার মনের মধ্যে আছে। অবশ্য আগেও একথা আমি জেনেছি ঐ কিশোর সাহিত্যিক লেখক সুবীর মল্লিকের একটা ফিচার পড়ে। উনি এখানে খুব আসতেন। এখানকার পটভূমিতে ওনার অনেক গল্প আছে। আর পটভূমির বর্ণনার ছটায় আমি এমনই মুগ্ধ হতাম যে, মনে মনে পণ করেছিলাম জায়গাটায় একদিন যাবই। কলকাতা থেকে আসার সময় যখন শুনলাম সুবীরবাবু নিরুদ্দেশ হয়েছেন তখন ভেবেছিলাম উনি তো হুটহাট এই পাহাড়পুরের জঙ্গলে চলে আসেন, হয়ত এখানেও ওনাকে পেয়ে যেতে পারি। কিন্তু গত তিনদিন ওনাকে খোঁজাখুঁজি করেও পেলাম না।

৯ নভেম্বর '৮৫

আজকেও সন্ধের দিকে পাহাড়পুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসেছি। স্টেশনের কোল থেকে একটা পাহাড় উঠে গেছে। তার গা-ভর্তি শালগাছ। বাতাসে শালগাছের বেশ মিষ্টি গন্ধ। একটু পরেই আস্ত একখানা চাঁদ পাহাড়টার মাথায় উঠে দাঁড়াবে। ভাবছিলাম পাহাড়ী জ্যোৎস্না দেখে বাড়ি ফিরব। আর এর মধ্যে যদি উপরি পাওনা হিসেবে হাতির পাল এসে পড়ে তো কথাই নেই।

কিন্তু একটু দূরে একটা লোককে দেখে আমি থমকে দাঁড়ালাম। সুবীর মল্লিক দাঁড়িয়ে। আনন্দে আমার প্রাণটা নেচে উঠল। যাক আমার স্পেকুলেশন ঠিক হয়েছে, সুবীর মল্লিক তাহলে কলকাতা থেকে নিরুদ্দেশ হয়ে এখানেই এসেছেন।

কাছে গিয়ে নমস্কার করলাম— কী মশাই চিনতে পারছেন?

সুবীর মল্লিক আমার দিকে তাকিয়ে হাসলেন। বললেন, সম্পাদককে কোন লেখক চিনবে না বলুন। কিন্তু এখানেও কি লেখা চাইবেন নাকি?

আমি একথায় হাসলাম। মনে মনে ভাবলাম লোকটার কথাবার্তা বরাবরই কাটা কাটা। যেন লেখা দিয়ে আমাদের উদ্ধার করে। আরে বাবা একটা ভাল লেখা প্রকাশ হলে নামটা তো তোমারই হবে। কিন্তু মনের ক্ষোভ চেপে রেখে বললাম, সত্যিই আমি আপনার একটা লেখা চাই। চাই একটা ভূতের গল্প। এজন্যে কলকাতায় আপনার খোঁজ করলাম অনেক, কিন্তু পেলাম না।

আমার কথা শেষ হবার আগেই সুবীর মল্লিক গলা ফাটিয়ে হাসলেন। বললেন, কলকাতায় আমায় কোথায় পাবেন আমি তো এখানে।

আমরা কথা বলতে বলতে বাড়ির দিকে হাঁটছিলাম। সুবীরবাবু বললেন, ঠিক ভূতের গল্প হবে কিনা জানি না, কারণ ও ভূতটুতে আমার বিশ্বাস নেই। আপনারা বলতেন, লিখতাম এই পর্যন্ত। তবে একটা স্যাড ব্যাপার নিয়ে আমি একটা গল্প লিখতে চাই। বিষয়বস্তুটা এতই অভিনব যে, ছাপার পর আপনাদের ওই ভৌতিক-রহস্য গল্পের মোড়ই ঘুরে যেতে পারে।

—তাই নাকি? এ তো অতি উত্তম কথা। কিন্তু আপনাকে আমি আর চোখের আড়াল করছি না, যা খামখেয়ালী লোক আপনি! হয়তো কাল সকালেই শুনব আপনি এদেশ থেকে হাওয়া। তার চেয়ে আমার বাড়িতে চলুন গল্পটা ওখানেই বসে লিখে দেবেন তারপর রাত্তিরে খেয়েদেয়ে বাড়ি যাবেন।

আমার কথায় সুবীর মল্লিক হাসলেন। বললেন, আপনি নিশ্চয় আমার লিখতে বসার বাতিকগুলোর সঙ্গে পরিচিত, যতদূর মনে পড়ছে সে কথা একদিন আপনাকে আমি বলেছিলাম।

—জানি মশাই জানি, ভুলিনি। আপনি ঘরের দরজা জানলা বন্ধ করে লিখতে বসেন। সো হোয়াট! আমার ঘরেও তাই করবেন। আমি আপনাকে ঘরে বসিয়ে বাইরের দরজায় তালা দিয়ে আর একবার স্টেশনে চলে আসব বেড়াতে। তারপর রাত নটা নাগাদ হোটেল থেকে খাবার নিয়ে আপনার সঙ্গে দেখা করব।

সুবীর মল্লিক আমার এ প্রস্তাবে হঠাৎ রাজি হয়ে গেলেন। ভাবিনি এত সহজে রাজি হবেন। ওনাকে ঘরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। কাগজ-কলম সব সাজিয়ে-গুছিয়ে দিলাম। মনে হল ভদ্রলোক কাগজ-কলমের দিকে তাকিয়ে একটু যেন বিষাদে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েছেন। আসার সময় বললাম, সুবীরবাবু আমি তাহলে বেরচ্ছি আর বাইরে থেকে চাবি দিয়ে যাচ্ছি যাতে কেউ আপনাকে ডিসটার্ব না করে, অবশ্য এখানে ডিসটার্ব করার কেউ নেইও। সুবীরবাবু কোন কথা বললেন না, আমি ঘরে চাবি দিয়ে বেরিয়ে এলাম।

নির্জন রাস্তায় কিছুক্ষণ এদিক-ওদিক ঘোরাঘুরি করে স্টেশনেই ফিরে এলাম। এখানে বসেই ঘন্টা তিনেক সময় কাটিয়ে দেব।

ঘন্টাখানেক পরে জঙ্গলের ওপার থেকে একরাশ জ্যোৎস্না বুকে নিয়ে চাঁদখানা উঠে দাঁড়াল। সত্যিই জঙ্গলের জ্যোৎস্না এক অপূর্ব জিনিস। কী অপূর্ব রহস্যময়তা। হঠাৎ মনে হল কে যেন আমার পেছনে এসে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে আছে। আমি চমকে উঠে পেছন ফিরলাম— কে আপনি ?

লোকটি আমার কথার কোন উত্তর না দিয়ে প্রশ্ন করল, আপনি কে ? কী করছেন এখানে ?

—কেন বসে আছি ?

—অন্য কোন মতলব নেই তো ? এই আত্মহত্যা-টাত্মহত্যার ?

—তার মানে ?

—আমি এখানকার স্টেশন মাস্টার। আমার নাম হরিপদ চট্টোপাধ্যায়। দিন সাতেক আগে এখানে একটি লোক চলন্ত মালগাড়ির সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করে। আপনি যে জায়গায় এখন বসে আছেন, সেই ভদ্রলোক সেদিন বিকেল থেকে এই জায়গাতেই বসেছিল।

—ভদ্রলোকের পরিচয় জানতে পারেননি ?

—পুলিশ লাশ নিয়ে যাবার পরদিন তার নামটা ওদের কাছেই জেনেছিলাম। তার পকেটে একটা চিঠি পাওয়া যায়। সেই চিঠি পড়ে বোঝা যায় ভদ্রলোক ছিলেন একজন লেখক। নাম সুবীর মল্লিক।

কথাটা শুনে আমার বুকের ভেতর বরফের ধস নামল। আমি উঠে দাঁড়ালাম। হরিপদবাবু বললেন, ভদ্রলোকের মাথার পেছন দিকে... না, না... কী ভয়ঙ্কর উফ্! আমি কাটা মুণ্ডুটা দেখতে গিয়েছিলাম। দেখেছিলাম হ্যাঁ সত্যি...।

কথাগুলো তাঁর অত্যন্ত অসংলগ্ন। হরিপদবাবু থর থর করে কাঁপতে লাগলেন। তারপর যেন টলতে টলতে প্ল্যাটফর্ম পার হয়ে তাঁর ঘরে ঢুকে গেলেন। উনি কী যে বলতে চাইলেন কিছুই বুঝলাম না।

আমি বাড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। একেবারেই নির্জন রাস্তা। একটা লোকও নেই। এমনিতেই এখানে লোকজন দোকানপাট কম। আমি দ্রুত হাঁটতে লাগলাম। আমার বুকের মধ্যে যেন হাতুড়ির ঘা পড়ছে। বাড়িতে আমি কাকে চাবি দিয়ে রেখে এসেছি, গিয়ে কি দেখব!

বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। ঘরে যে আলো জ্বেলে রেখে গিয়েছিলাম দেখলাম জ্বলছে। দরজায় তালাটা ঝুলছে। আমি আর নিমেষ অপেক্ষা না করে চাবি বার করে তালাটা খুলে ফেললাম। দরজাটা ধাক্কা দিতেই খুলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে আমার শরীর হিম হয়ে গেল। সুবীর মল্লিক ঘরে নেই। তালা দেওয়া ঘর থেকে কীভাবে

লোকটা উধাও হল! আর সারা ঘরে আমার দিয়ে যাওয়া কাগজগুলো উড়ছে। ঘরের মেঝে থেকে কড়িকাঠ পর্যন্ত যেন একটা ঘূর্ণি হাওয়ায় কাগজগুলো পাক খাচ্ছে। জানলার শার্সিগুলো বন্ধ ছিল। আর হাওয়ার চরিত্রটাও বড় অদ্ভুত, ক্রমাগত ঘরেই পাক খাচ্ছে। এবার আমি মরিয়া হয়ে কাগজগুলোকে একটা একটা করে ধরলাম। কাগজগুলো একসঙ্গে করে আমি তো অবাক। মোট এগারটা পাতা, আর সেগুলো সুবীর মল্লিকের হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি। কিন্তু তালাবন্ধ করা ঘর থেকে সুবীর মল্লিক উধাও হল কি করে! স্টেশন মাস্টারের কথাটা কি তবে সত্যি। সে ভদ্রলোক সুবীর মল্লিকের মৃতদেহ কি দেখেছিল? অমন কাঁপছিলই বা কেন? আমি পাতাগুলোকে নম্বর অনুযায়ী পর পর সাজিয়ে নিয়ে চেয়ারে বসে পড়তে শুরু করলাম। তার আগে ভেতর থেকে দরজাটা ভেজিয়ে দিলাম। লেখাটা শুরু হয়েছে এইভাবে:

সুবীর মল্লিকের কথা

প্রিয় সম্পাদক,

অনেক চেষ্টা করেও আপনার ভূতের গল্প লিখতে পারলাম না। গল্প লেখার কারুকৃতি সব ভুলে গেছি। তাই আপনাকে একটা চিঠি লিখছি। এটাকে ইচ্ছে করলে গল্প হিসেবে চালাতে পারেন। দেখুন, আমার জীবনে একটা স্যাড ব্যাপার ঘটে গেছে। ব্যাপারটি বড়ই অবিশ্বাস্য, কিন্তু সত্যি।

গত একবছর ধরে আমি কোন নির্জন রাস্তায় চলতে গেলে মনে হত আমার পেছনে পেছনে কে যেন আসছে। স্পষ্ট পায়ের শব্দ শুনতে পেতাম। সঙ্গে সঙ্গে থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকাতাম, দেখতাম কেউ কোথাও নেই। আবার চলা যেই শুরু করতাম তক্ষুনি শুনতে পেতাম সেই পায়ের শব্দ।

পেছনে পায়ের শব্দ শুনে ভীষণ বিচলিত হতাম। কার পায়ের শব্দ। কে আসছে আমার পেছনে পেছনে? কিন্তু কে দেবে আমার প্রশ্নের উত্তর। তখন আমার কষ্ট হত মানুষ পেছন দিকটা দেখতে পায় না বলে। মনে হত যদি আমার পেছনে একটা চোখ থাকত তাহলে দেখতে পেতাম। মনে হত পেছনে যে আসছে সেকি আমার কোন প্রিয়জন? আমার মা কিংবা বাবা, যাঁরা এখন ইহলোকে নেই। উহু, সত্যি যদি আমার পেছনে একটা চোখ থাকত! অনেক চেষ্টা করলাম পায়ের শব্দটাকে এড়িয়ে চলতে কিন্তু না, সে ক্রমশ বাড়তে লাগল। আর প্রতি মুহূর্তে আমি পেছন দিকে দেখতে না পাওয়ার অসহায়তা অনুভব করতে লাগলাম। খেয়ে শান্তি নেই, ঘুমিয়ে শান্তি নেই, একথা কাউকে বলতে না পারার অশান্তি। অথচ প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে সেই অদৃশ্য পদধ্বনি ক্রূর সাপের মত পাকে পাকে আমাকে জড়াতে লাগল। আমার

মনে হতে লাগল এবার আমি পাগল হয়ে যাবে পেছনে কে আসছে একবারটি দেখতে না পেলে। কিন্তু পেছনে আমি দেখব কি করে। এরকম পাগল করা চিন্তা আমার সব কাজ করার ক্ষমতা কেড়ে নিল। দিনের পর দিন এরকম চলতে চলতে আমার মাথার পেছন দিকটা ভারী হতে শুরু করল। পটলের মত একটা জায়গা ফুলে উঠল। সেখানে হাত দিয়ে অনুভব করলাম টাটানি ব্যথা। মাথায় আমার বরাবরই বড় চুল। পেছনের চুল খুব ঘন। ঠিক করলাম ডাক্তারের কাছে যাব টিউমারটা দেখাতে। ভয় হল যদি ওটা ক্যান্সার টিউমার হয়। ডাক্তারের কাছে যাবার আগে মাথার পেছনের চুল ছোট করে কেটে নেব, চিকিৎসার সুবিধার জন্যে— এই ভেবে একটা সেলুনে ঢুকলাম। সেলুনের মালিক আমার খুব চেনা। আমি লেখক বলে আমায় খুব খাতিরও করে। চেয়ারে বসেছি, সে চুল কাটাতে শুরু করেছে। খানিক চুল কাটার পর অনাথ অর্থাৎ নাপিতটি হঠাৎ কেঁপে উঠল। তার হাত থেকে কাঁচি আর চিরুনি পড়ে গেল। সে থরথর করে কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে পড়ে অজ্ঞান হয়ে গেল। পড়ার আগে সে প্রচণ্ড চিৎকার করে উঠল।

অনাথের চিৎকার শুনে অনেকেই ছুটে এল। আমি তো হতভম্ব। কী হল, অনাথের। আমি ওর দিকে ঝুঁকে পড়ে সেই কথাই জিজ্ঞেস করতে গেলাম, ঠিক সেই মুহূর্তে আমার পেছন থেকে আর একজন চিৎকার করে উঠল— ই... ই... ই... ও দাদা আপনার মাথার পেছনে ওটা কি?

সঙ্গে সঙ্গে চার পাঁচজন আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠল এবং অনাথকে ঐ ভাবে ফেলে রেখেই সবাই সেলুন ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এবার আমি সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালাম সেলুনের আরশির সামনে। সেলুনে সামনের আরশির মুখোমুখি যে আরশিটা থাকে সেটা দিয়ে নিজের মাথার পেছনটা দেখলাম। সঙ্গে সঙ্গে আমার সমস্ত শরীর ঠাণ্ডা হয়ে গেল। একটা চোখ। হ্যাঁ, একটা চোখ চুলের ফাঁক দিয়ে ড্যাবড্যাব করে চেয়ে আছে। কিন্তু তবু আমি পেছন দিকে দেখতে পাচ্ছিলাম না, বোধহয় সে চোখটার দৃষ্টি শক্তি নেই। চোখটা স্থির, কোন পাতা পড়ছে না। পেছনে দেখার জন্যে যে চোখের কামনা এতদিন করছিলাম সেটা যেন রূপ পেয়েছে।

আমি আর সেলুনে দাঁড়ালাম না, কোনরকমে বাড়ি এলাম। সেলুন থেকে বেরুবার সময় দেখলাম অনেক জোড়া চোখ আমার দিকে কৌতূহলী দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছে। শুধু তাই নয়, দেখতে পেলাম অনেকের দৃষ্টিতে কৌতূহলের বদলে আতঙ্ক। কিন্তু বাড়ি এসে আমার সমস্যা হল এখন আমি কী করি। একটা ঘরে আমি একাই থাকি। অতএব বাড়ি থেকে না বেরলে আমি নিশ্চিন্ত। কিন্তু কতদিন ঘরে বসে থাকব।

আমি আর একবার মাথার পেছন দিকটা দেখার চেষ্টা করলাম, সামনে

পেছনে আরশি দিয়ে। দেখলাম, স্থির একটা চোখ। যেন প্রাণহীন মৃত মানুষের। চোখটা আমি একবার ছুঁলাম। না, চোখে হাত লাগলে যেরকম অনুভূতি হয় আমার সেই চোখটায় তা হল না। মানুষের কামনা সার্থক হওয়াও যে কি বিড়ম্বনা তা হাড়ে হাড়ে বুঝতে পারলাম। জীবতত্ত্বে একটা কথা আছে—ইনহেরিটেনস অব অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেকটার, কিন্তু সেটা তো বিবর্তনের ব্যাপার। কোন জীব কোন প্রত্যঙ্গ অর্জন করতে বা প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পরিবর্তন হতে লক্ষ লক্ষ বছর কেটে যায়। যে কারণে জিরাফের গলা লম্বা হল, হাতির শুঁড় হল। তবে কি মানুষ ঐকান্তিক চিন্তায় যা চায় তাই পায়।

এমন সময় হঠাৎ আমার ঘরের দরজায় ধাক্কা পড়ল। ভয়ে আমি কেঁচো হয়ে গেলাম। কে এল? দরজা খুললাম, দেখি বাড়িওয়ালার ছেলে। কিচ্ছু বলল না, শুধু মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইল। বললাম, কিছু বলবে? তখন সে বলল আপনার কী একটা ব্যাপার শুনলাম বাজারে। আমি সঙ্গে সঙ্গে তার মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দিলাম। বুঝলাম জানাজানি হতে শুরু করেছে, কলকাতায় আর না। সেই দিনই মাথায় একটা ফেট্টি বেঁধে রাতের গাড়িতে চলে এলাম আমার প্রিয় জায়গা এই পাহাড়পুরে। তারপর কয়েকদিন মনের সঙ্গে যুদ্ধ করে অবশেষে নিজেকে ফেলে দিলাম চলন্ত মালগাড়ির মুখে। এখন সমস্ত পদশব্দ থেমে গেছে। আমার কাহিনী এখানেই শেষ।

আমার কথা

চিঠিটি শেষ করলাম। সঙ্গে সঙ্গে আচমকা একটা হাওয়ায় ঘরের দরজাটা খুলে গেল। দরজার পাল্লাটা দুলছে। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়েছি আর সেই সময় অবাক হয়ে দেখলাম আর একটা দমকা হাওয়ায় টেবিলে রাখা সুবীর মল্লিকের পাণ্ডুলিপির পাতাগুলি উড়তে উড়তে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে। আমি ধরবার চেষ্টা করলাম না, শুধু তাকিয়ে থাকলাম। চাঁদের আলোয় কাগজগুলো কী সুন্দর উড়ছে। কিন্তু হঠাৎ ঘরের বাইরে আসতে গিয়ে টের পেলাম আমার পেছনে কার পায়ের শব্দ! এবার আমি দ্রুত হাঁটতে শুরু করলাম সাঁকোটার দিকে। আশ্চর্য স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি কার পায়ের শব্দ আমাকে অনুসরণ করছে। থামলাম, পেছনে তাকালাম, না কেউ কোথাও নেই। সেই মুহূর্তে মনে হল যদি আমার পেছনে একটা চোখ থাকত তাহলে দেখতে পেতাম কে আমার পেছন পেছন আসছে। আর কথাটা মনে হতেই বুকের মধ্যে যেন বরফের ধস নামল। ❑

*

ভূত বলে কিছু নেই/ অশোককুবার সেনগুপ্ত



সনাতন গুপ্ত ভূত, প্রেত, ডাইনি, ওঝা, ঝাড়ফুঁক, কবচ-তাবিজ এসবে মোটেই বিশ্বাস করে না। মানুষকে ঠকানর জন্য কিছু ধান্দাবাজ লোকের এসব আমদানি। যার অস্তিত্বই নেই তাকে নিয়ে কাজ-কারবার করে কিছু মন্দ লোক কিছু বোকা লোককে স্রেফ ঠকিয়ে যায়। তো ভূতের মত একটা অতি তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে ছেলেবেলার বন্ধু ভগীরথ চাটুজ্জের সঙ্গে জোর বিতর্ক হয়ে গেল। দীর্ঘ বিশ-পঁচিশ কী আরও বেশি বছরের পর বন্ধুত্বটা ফিরে এসেছিল। সেটা ভূতের ব্যাপারে নষ্ট হতে বসেছে ভেবে সনাতনের বড়ই মন খারাপ।

সনাতনের গ্রাম বীরভূমের গণেশপুর। ভগীরথের ওটা মামার বাড়ি। মা মারা যেতে ভগীরথ ওখানে পড়াশুনা করত। ভবানীপুর শম্ভুনাথ হাই স্কুলেও পড়েছিল। তবে ক্লাশ এইটে পর পর দু'বার ফেল করেই ওখানকার বিদ্যাসংগ্রহ শেষ।

ভগীরথের গাঁট্টা-গোট্টা গুন্ডা গোছের চেহারা, পুরু ঠোঁট, কোঁকড়ান চুল, চাপা নাক, গায়ের রঙ কালো। গাঁয়ে ছেলেবেলার সব দস্যিপনাতে লোক জ্বালাতনে সে ছিল এক নম্বরে। ক্লাশে ফেল করে তার চেয়ে ছোট সহপাঠীদের উপর দাদাগিরি করত। ভাল ফুটবল খেলত। ভয়-ডর ছিল না। ওর দাপটে সনাতন তটস্থ হয়ে থাকত। কেন যে তার পিছনে লেগে থাকত কে জানে। তাকে বলত, গিলটি। সনাতন নাম হলেও সোনা হয় না। যেন সনাতন শব্দের অর্থ সোনা। গিলটি নামটাতে সনাতন তখন অপমান বোধ করত। রাগ হত

তার। তার ফলেই রাগানর জন্যে ওই নামে ডাকত আরও কেউ কেউ। হেঁটে যাচ্ছে, ওমনি ডাক, গিলটি। ভগীরথ শুধু অমন একটা বিশ্রি নাম দে নয়, তার টিফিন কেড়ে খেয়ে নিত, খাতা নিয়ে ফেরত দিত না, চেপে পকেটের পয়সা বের করে নিত। বহু ভাবে সে এড়াতে চাইলেও ভগী ঠিক তার পিছনে থাকত। তবে এর মধ্যে একটা মধুর ব্যাপারও ছিল। ছুট গিয়ে পড়ে পাথরে মাথা ঠুকে রক্তপাত হতে ভগীরথ তাকে কোলে ক বাড়ি নিয়ে এসেছিল। জ্বর হলে বিছানার পাশে বসে থাকত। তার জ অন্য ছেলের সঙ্গে মারামারিও করত। গণেশপুর ছেড়ে ওর কাকার সঙ্গে পামুরি চলে যায় যেদিন, তার আগের সন্ধেবেলায় কেঁদে ফেলেছিল। বলেছিল, গিলটি তোর জন্যে আমার বড্ড মন খারাপ করবে। বন্ধুদের মধ্যে তোকেই অ সব চেয়ে বেশি ভালবাসি।

সেই ভগীরথের সঙ্গে যৌবন পৌঢ়ত্ব পার হয়ে দেখা হয়ে গেল আসানসো স্টেশনে। এতকাল কোন খোঁজ-খবরই ছিল না। সনাতন করণজাবুনি প্রাথমি শিক্ষকতা করত। মেয়ের বিয়ে হয়েছে। ছেলে আসানসোলে রেলওয়ে কোয়ার্টা থাকে। অবসর নিয়ে সনাতনও তার কাছে মধ্যে মধ্যে গাঁয়ে যায়। তা ভগীরথ সে চিনতে পারেনি। ভগীরথই তার সামনে এসে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আপ কি সনাতন গুপ্ত? বীরভূমের গণেশপুরের?'

'হ্যাঁ। কিন্তু আপনি?'

'আপনি কিরে গিলটি— তুই। আমি ভগীরথ!' জড়িয়ে ধরেছিল প্যান্ উপর শার্টপরা স্বাস্থ্যবহুল, টেকোমাথার শ্যামলা বয়স্ক পুরুষটি।

'অ্যাঁ, তুই! এখানে!'

'আমি তো বার্নপুরে থাকি। বাড়ি করেছি।'

'বলিস কী!'

তারপর পরস্পরের খবরাখবর নেওয়া। ভগীরথ বার্ন কোম্পানির চাক থেকে অবসর নিয়েছে। ছোট মেয়ের বিয়ে এখনও হয়নি। বড় ছেলে ব্যব করে জামা-কাপড়ের। ছোট ছেলে চাকরি করে বার্নে।

সনাতন গুপ্তের নাতির উপনয়ন। তাতে তখনই নেমতন্ন করে বস উপনয়নে নেমতন্ন খেতে আসা শুধু নয়, ভগীরথ এরপর প্রায়ই এসে হাজি হতে থাকল। নানান গল্প ছেলেবেলার, তার সঙ্গে বর্তমানের। এরকমই একদি নানা গল্পের ফাঁকে একজনকে ভূতে ধরার কথা এবং ওঝা দিয়ে ভূত ছাড়ান তার সুস্থ হয়ে ওঠাটা ভগীরথ গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে সনাতনকে বলতে সনা বলে উঠল, 'বুজরুকি। এই ভূত-টুত ছাড়ান। ভূত বলে কিছু নেই।'

'বলিস কী রে গিলটি! ভূত নেই। তুই এসবে বিশ্বাস করিস না!'

সনাতন জোরালো মাথা নাড়া দিয়ে বলল, 'না করি না।'

'আমি করি। আর জানি ভূত আছে।'

'তুই নিজে ভূত দেখেছিস!'

'দেখেছি বইকি!'

'তাহলে তোর মুখে গল্প শুনি। ভূত না থাকলেও ভূতের গল্প শুনতে দোষ কী!'

ভগীরথ বলল, 'শুনলে ঠাট্টা করতে পারবি না। হাওড়ার ইছাপুরে আমার শ্বশুরবাড়ি। বছর বিশেক আগেকার কথা। শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছি। ট্রেন অসম্ভব লেট। আটটার ট্রেন হাওড়া স্টেশন এল রাত্রি পৌনে চারটায়। গাড়ি সব বন্ধ। সময়টা আবার শীতকাল। যাদের নিজেদের গাড়ি ছিল তারা তো বেরিয়ে গেল। দু'একটা ট্যাক্সি ছিল কী না জানি না। আমি হয়ত পেতাম। যাই হোক অনেকেই স্টেশনে রাত্রিবাসের সিদ্ধান্ত নিল। আমি কী করব না করব ভাবছি। হেঁটে ইছাপুর চলে গেলে কেমন হয়! এ সব ভেবেই স্টেশনের বাইরে পা রাখতেই চাদরমুড়ি দিয়ে মানুষে টানা একটা রিকশা সামনে থামল। কী মনে হতে, হাওড়ার ইছাপুর যাবে বলে আমি চড়ে পড়লাম। তারপর ইছাপুর কোনদিকে জান বলতেই একটা হ্যাঁ গোছের শব্দ শুনলাম। নির্জন রাস্তা। জোর শীত পড়েছে। আমারও দ্রুত ছোটা রিকশায় হাওয়ার ঝাপটে শীত লাগছে। মনে হচ্ছে মানুষে টানা নয় দ্রুতগামী জোড়া ঘোড়ায় ছুটিয়ে নিয়ে যাচ্ছে রিকশা। ইছাপুরে শ্বশুরবাড়ির দরজায় নামিয়ে দিয়ে রিকশাটা ঘুরিয়ে নিতেই বললাম, কত দিতে হবে? রিকশাওয়ালা বললেন, 'ধনুয়া এনেছে।' তারপরই উধাও। ঘরে বলতে কী শুনলাম জান!'

সনাতন বলল, 'আবার কী! ধনুয়া ভূত।'

ভগীরথ ঠাট্টাটা গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না। বলল, 'তুই ঠিকই ধরেছিস ধনুয়া রিকশাওয়ালা আমার শ্বশুরবাড়ির গাড়ি বারান্দায় থাকত। দেশ থেকে এসেছিল মাত্র একবছর। তবে খুব ভাল লোক। আমার শ্বশুরবাড়ি সাহায্য করত বলে কৃতজ্ঞ ছিল। আমি কিন্তু ধনুয়ার ব্যাপারটা জানতাম না। শ্বশুরবাড়ি সেবার যাচ্ছিলামও চার বছর পর।'

সনাতন বলল, 'ভূতের অমন পৌঁছে দেওয়ার বহু গল্প আমি পড়েছি আর শুনেছি।'

'তুই বিশ্বাস করলি না গিলটি!' ভগীরথ বড়ই হতাশ হয়। বলে, 'আরও শোন বার্নপুরে প্রথমে যে বাড়িতে আমি ভাড়া থাকতাম, সে বাড়ির মালিক তারকবাবু মারা যাওয়ার সাতদিনের ভেতর এক চোব চুরি করতে এসে ধরা পড়ে। মৃত তারকবাবু দেওয়ালের ফটোর ফ্রেমে ঢুকে যান। চোর ভির্মি খেয়ে পড়ে। তারপর জ্ঞান ফিরতে সে ঘটনাটা বলে। আমি নিজের কানে শুনেছি।'

সনাতনের ঠাট্টার ভঙ্গিটা বদলায় না। বলে, 'না, এটার আমি স্বীকার করছি অভিনবত্ব আছে। এরকম গল্প শুনিনি।'

'একেও তুই গল্প বলবি। আমি প্রত্যক্ষদর্শী তবুও—।'

'তুই তো ফ্রেম থেকে বেরিয়ে আসতে দেখিসনি।'

ভগীরথ বলল, 'তা দেখিনি। তবে বার্নপুরের রিভার সাইড রোড থেকে হেঁটে আমবাগানের দিকে যাবার পথে সন্ধের আঁধারে একটা কালো লোককে দেখেছি। হ্যাঁ, সে ভূত। দামোদর পেরুনর জন্য নৌকার অপেক্ষা করল না। জলের উপর দিয়ে হেঁটে গেল। ভয়ে আমি কাঠ। নৌকার মাঝির কাছে বলতে সে কানে হাত ঠেকিয়ে বলল, তেনাদের তো দেখা যায়ই। কত দেখি।'

সনাতন দুঃখভরা গলায় বলল, 'আমিই খালি দেখি না।'

ভগীরথ এবার রেগে ওঠে, 'নিজে দেখিসনি বলে বিশ্বাস করবি না। তাহলে আমেরিকা দেশটা দেখিসনি বলে বলবি আমেরিকা বলে দেশ নেই। তোর ঠাকুরদাকে দেখিসনি বলে বলবি ঠাকুরদা নেই। হ্যাঁ, শ্যাম নন্দী থাকলে—কী করা যাবে শ্যামদা নেই, নইলে—।'

'শ্যামদা ভূত ধরে আনলেও আমি বিশ্বাস করব না।'

ভগীরথ বলল, 'আমি চলি।'

'আহা রাগ করছিস কেন? বস। ঠিক আছে বাবা ভূত আছে।' সনাতন বলেছিল, 'এই তো তুই একটা ভূত। সামান্য ব্যাপারে রেগে গেলি।'

'না, আজ চলি। রাত হয়ে যাবে।'

'বাসে তো যাবি। বাসে ভূত ধরবে না।'

ভগীরথ ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

তারপর থেকে ভগীরথ আসছে না। আটদিন হয়ে গেল। সে রাগিয়ে দিয়েছিল, সুতরাং তারই যাওয়া উচিত ছিল। আজ আসে, কাল আসে করে অপেক্ষাতে দিনগুলো পেরিয়ে যাচ্ছে। না, কাল সনাতন যাবে। বাইরের ঘরে সে একা বসে আছে। সকাল থেকে মেঘলা। হেমন্তের গায়ে শীত বেশ খানিকটা নিজের আমেজ ঢেলে দিয়েছে। তার পর হঠাৎ ঝড়ের সঙ্গে বৃষ্টি নেমে পড়ল। অকালবর্ষণ। দরজা জানলা বন্ধ করে সে বাতাস আর বৃষ্টির শব্দ শুনছে। এমন সময় দরজায় করাঘাত। খুলে দিতেই এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। ফরসা রঙ, রোগাটে চেহারা, মাথায় কাঁচাপাকা চুল, সামান্য টাক, বয়স তারই মত। ধুতির উপর ফুল শার্ট। ঢুকেই বললেন, 'আকাশের কান্ড দেখেছেন।'

সনাতন বিস্ময়ের সঙ্গে অপরিচিত মানুষটাকে দেখছিল। বলল, 'আপনাকে ঠিক—।'

'চিনতে পারলেন না তো!' মুখে হাসির আভাস রেখে আগন্তুক বললেন, আমি শ্যাম নন্দী। বাড়ি এই জি টি রোডের কাছেই ওই যে বাসস্ট্যান্ড। নন্দুর চায়ের দোকানে খোঁজ করলেই জানতে পারবেন। যদি অবশ্য কোনদিন যান। বাসস্ট্যান্ডে নন্দুকে সবাই চেনে। আর নন্দুকে শ্যাম নন্দী বললেই—।'

'শ্যাম নন্দী। নামটা চেনা চেনা লাগছে। বসুন ওই চেয়ারটায়।'

'হ্যাঁ বসি। ভগীরথের কাছে আমার নাম শুনেছেন।'

সনাতন বলল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ। ভগীরথ আসছে না। ভাল আছে তো? সেদিন ভূত নিয়ে—।'

চেয়ারে বসে শ্যাম নন্দী বললেন, 'ভূত নিয়ে আবার কী হল! নিশ্চয়ই তর্ক। আপনি বলেছেন, ভূত বলে কিছু নেই। আর ও বলেছে—।'

সনাতন বলল, 'তাহলে সবই শুনেছেন।'

শ্যাম নন্দী সে কথার উত্তর না দিয়ে বললেন, 'আমারও বিশ্বাস ছিল না। কিন্তু কার্তিকের শেষে এমনই এক অকালবর্ষণের সন্ধ্যায় একটা ঘটনা ঘটেছিল। চণ্ডীর ঘরে আমি সুবোধ বসে গল্প করছিলাম। সুবোধ একটা বাড়ি সস্তায় ভাড়া পাচ্ছে কিন্তু বাড়িটার ভূতুড়ে বদনাম এই নিয়ে ভূত আছে কী নেই কথা হচ্ছে। আমরা তিনজনেই বার্নের চাকুরে। একই ডিপার্টমেন্ট। যাক সে কথা। আমাদের কথার মধ্যে বন্ধ দরজায় করাঘাতের শব্দ। খুলে দিতেই একটা লোক ঢুকে পড়ল। মনে করুন আমার মতই সেই লোকটার চেহারা, পোশাক-পরিচ্ছদ। এসে ঢুকেই বলল, ঠিক আমরই মত, 'আকাশের কান্ড দেখেছেন।' তারপর চেয়ারে বসে ভূতের গল্পে যোগ দিল। তবে হ্যাঁ লোকটা জলের হাত থেকে বাঁচতে আশ্রয় নিয়েছিল। আমাদের কথার মধ্যে সে বোঝাতে চাইছিল ভূত বলে কিছু নেই। তারপর একসময় বলল, কাগজ দিন আমি ভূত বলে কিছু নেই, লিখে দিচ্ছি। টেবিলের উপর থেকে কাগজ কলম নিয়ে লিখে ফেলল। তারপর ঘাড় ঘুরিয়েছে ওমনি আলো চলে গেল। মানে লোডশেডিং। মাত্র দু'চার সেকেন্ড কী তারও কম। আলো এল। কী আশ্চর্য! লোকটা নেই। অথচ দরজা বন্ধ। বাইরে প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। এ বৃষ্টিতে বেরুনর কথা নয়। বলব কী মশাই ভয়ে আমাদের হাত পা হিম। কাগজটার অক্ষরগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকি, এ কী মানুষের লেখা। গোটা গোটা অক্ষর। ভূত বলে কিছু নেই। আপনি কী সেই হাতের লেখাটা দেখবেন?'

সনাতন কৌতূহলী হয়, 'ভূতের হাতের লেখা আছে আপনার কাছে।'

'উহুঁ। দিন কাগজ। এই তো কলম-কাগজ রয়েছে টেবিলে। বুঝলেন হুবহুটি আমি লিখে দেব। মনে হবে একেবারে জেরক্স করা।' শ্যাম নন্দী এগিয়ে গিয়ে খসখস করে লিখতে থাকল। শেষ করে ঘাড় ফেরাতেই—।

লোডশেডিং। দুই কী তিন সেকেন্ড। কিংবা তার চেয়েও কম। গেল আর আলো চলে এল। সনাতন টেবিলের দিকে তাকাতে শ্যাম নন্দীকে দেখতে পেল না। দরজা বন্ধ। কখন গেল। উঠে টেবিলে উপর কাগজে লেখা, ভূত বলে কিছু নেই। গোটা গোটা অক্ষর।

সনাতনের মনে হল একটা অতি শীতল বাতাস মেরু থেকে কেউ যেন

মুঠো করে এনে তার শরীরে ছুঁড়ে দিল। হাড় পর্যন্ত কেঁপে উঠল সেই হিমে। বাইরে প্রবল বৃষ্টির শব্দ এবং বাতাসের গোঙানি। এ অবস্থায় কেউ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যায়। সনাতনের ভয়ের অবস্থাটা কাটাতে সময় লাগল। গলা শুকিয়ে গিয়েছে। হৃদ্‌পিন্ডের তীব্র দাপানি ক্রমে ঠাণ্ডা স্বাভাবিক হয়ে আসছে। না, ছেলেকে কোন কথা বলল না। বাড়িতেও কথা না। ভাবল, কালই ভগীরথের কাছে যাবে। শ্যাম নন্দীর ব্যাপারটা জানা দরকার।

পরদিন সকালে মনে হল, আরে বাসস্ট্যান্ডে নন্দুর চায়ের দোকানে গেলেই তো হয়। শ্যাম নন্দী যদি লিখে পালিয়ে গিয়ে থাকে ভয় দেখাতে কিংবা ভূত বিশ্বাস করাতে। নন্দুর দোকান অল্প খোঁজাখুঁজিতেই বেরিয়ে পড়ল। নন্দু বলল, 'কী ব্যাপার বলুন তো। উনি তো গতবছর মারা গিয়েছেন। হ্যাঁ, আমার দোকানে আসতেন। হিসাবপত্র লিখে দিতেন।'

'তাই নাকি। কিন্তু—।'

'আবার কিন্তু কিসের? ওর ছেলের সঙ্গে দেখা করবেন? শ্যামল।'

সনাতন বলল, 'না। দেখা করার দরকার নেই।'

নন্দু বলল, 'চা খাবেন!'

'না থাক। আচ্ছা এই হাতের লেখাটা।' সনাতন কাগজ বাড়িয়ে দিল।

নন্দু পড়ল, 'ভূত বলে কিছু নেই। হ্যাঁ, কোথায় পেলেন?'

'এটা কী শ্যাম নন্দীর হাতের লেখা?'

'হ্যাঁ। হ্যাঁ। ওঁরই। আমি ওর হাতের লেখা খুব ভাল করে চিনি। আমার হিসেব-নিকেশ শুধু নয়, চিঠি-পত্রও উনি লিখে দিতেন। কিন্তু এ কাগজটা পেলেন কোথায়?'

সনাতন বলল, 'আমার কাছে ছিল।'

ভূত নিজে হাতে লিখে দিয়ে গিয়েছে, ভূত বলে কিছু নেই তবু ভূত অবিশ্বাসী সনাতন গুপ্ত ব্যাপারটাকে কিন্তু এখন মেনে নিতে পারছেন না। ❑



কালোর গল্প/ বলরাম বসাক



ক ছিল কালো! কালো কি বলতো? কালো কাক? -নাহ্। কালো হাতি? হ্। কালো বেড়াল? -উঁহু। কালো জাম? তাও না। তা হলে?

কালো হচ্ছে ভূত। ভূতের নাম কালো। ভূতটা দেখতেও কালো। তার খ কালো। তার ঠোঁট কালো। তার চোখ কালো। তার চোখের ডিম কালো। ার লম্বা লম্বা হাত কালো। লম্বা লম্বা ঠ্যাং দুটিও কালো। তার লিক্‌লিকে ক-পেটও কালো। তার লম্বা গলাটাও কালো। শুধু তার দাঁতগুলো ঝকঝকে াদা। রোজ টুথপেস্ট দিয়ে দাঁত মাজে তো সন্ধেবেলা ঘুম থেকে উঠে। আর ার চুলগুলো ছোট ছোট খাড়া খাড়া ও কালো। কিন্তু কালো চুলে কায়দা রে একটা গোলাপ ফুল আটকান।

ভূতটা সারাদিন ঘুমোয়। সন্ধে হলে 'আও-হাও' করে হাই তোলে। চোখ চলে উঠে বসে। উঠে বসেও চোখ কচলায়। যদি দেখে আকাশে কাঁসার ালার মত গোল চাঁদ - তক্ষুণি "ধ্যাৎ, এখনো সুয্যি ডোবেনি" বলে ধপাস রে শুয়ে পড়ে। "ঘাউৎ-ঘাউৎ" করে নাক ডাকিয়ে ঘুম লাগায়।

আর যদি কোন সরু চাঁদ বা বাঁকা চাঁদ কিংবা আধভাঙা চাঁদ আকাশে ঠে অথবা চাঁদ যদি নাই ওঠে, তাহলে ঘুমটা ভাঙতেই হয়। কালো ভূতকে ঠে বসতেই হয়। তারপর উঠে দাঁড়াতেই হয়। একটু হাত পা উঠিয়ে নামিয়ে খনও কোমরে হাত রেখে উঠে বসে ব্যায়াম করতেই হয়। তারপর গলা াড়িয়ে বৌকে ডেকে, 'ঔ-ঔ চায়ে দৌ।' বলতেই হয়।

ভূতটা থাকে কোথায়? বল তো কোথায় থাকে?

শ্যাওড়া গাছে? -নাহ্। তালগাছের মাথায়? -নাহ্। রাজুদের বাড়ির পাঁচ তলার ছাদে? -নাহ্। মনুমেন্টের মাথায়? -তাও না। তহলে কোথায় থাকে?

গুন্টিবাবুর কয়লার দোকানে যেখানে তাল তাল কয়লা পড়ে থাকে। ওর মধ্যে কালো ভূত যখন ঘুমায় তখন মনে হয় যেন একটা বড় সড় কয়লার চাঁই। আর বৌ কালো ভূতী, বাচ্চা-কাচ্চা, ছানাপোনারা যখন ঘুমোয় তখন মনে হয় মাঝারি আর ছোট ছোট কয়লার চাঁই। খুব সাবধান কয়লার মধ্যে নেই - সেই বড়-মাঝারি আর ছোট ছোট চাঁইগুলো কয়লা নয়। ভূত।

তারপর যখন খিদে পায় কালো ভূত তখন আঙুলের নখ খুঁটে খায়। আর বলে, "চৌ, নৌ"। মানে চমৎকার নোনতা। মাঝে মাঝে পেন আর ডটপেনও চোষে। রাবারও চিবোয়। শার্টের বোতাম চুষে খায়। ভীষণ নাকি ভাল লাগে এই সব খেতে।

তারপর ভূতটা কি করে?

কী আর করে, রাততিরে ঘুটঘুটে অন্ধকারে রাস্তা দিয়ে হাঁটে। গরুর পিঠে চিমটি কাটে। ঘুমন্ত কুকুরের কানের ফুটোয় খড় ঢুকিয়ে সুড়সুড়ি দেয়। তাই মাঝ রাততিরে কুকুরগুলো ধড়মড়িয়ে উঠে ঘেউ ঘেউ করে।

আর কি করে? -চঞ্চল বাবুদের মোটর গাড়ির মাথায় চাটি মারে। বেড়ালের কানে 'কু' করে ডেকে ওঠে। কখনও মন্টুবাবুদের চারতলার ছাদে লাফ দিয়ে উঠে বসে পা দোলায়, আর গান গায়, "কালো আমার কালো ওঁগো কালোয় ভুবন ভরা। এই তো সেদিন কালোভূত চাঁদের আলো পেয়ে হি-হি করে হাসল। তখন সাদা সাদা কতগুলো- ?

-জানি, জানি, তখন সাদা সাদা কতগুলো পাখি উড়ে গেল। -মোটেই না।

-তাহলে সাদা সাদা কতগুলো খরগোশ পালিয়ে গেল। -তাও না। -তাহলে সাদা সাদা কতগুলো জোনাকি পোকা ফুট ফুট করে জ্বলল আর নিবল। -উহুঁ। সাদা সাদা ফুল ফুটল গাছে গাছে। -সাদা সাদা ঘোড়াগুলো তেপান্তরের মাঠ পেরিয়ে গেল। -সাদা সাদা পাখা মেলে পরীরা পালিয়ে গেল ভয়ে তাই না?

নাহ্ কোনটাই সত্যি নয়। ভূতটা চাঁদের আলো পেয়ে হি হি করে হাসল। তখন সাদা সাদা কতগুলো খোঁচা খোঁচা দাঁত কালো মুখে বেরিয়ে পড়ল। তাইতে ওর কালো মুখে হাসিটা বাঁকা চাঁদের মত হয়ে গেল। আকাশের বাঁকা চাঁদ আর ভূতের হাসির বাঁকা চাঁদ এক রকম দেখতে হয়ে গেল।

এমন সুন্দর কালো ভূত হঠাৎ হারিয়ে গেল। বলা নেই কওয়া নেই কোথায় যে হারিয়ে গেল। কেউ জানে না। প্রত্যেক রাতে সরু চাঁদ বা বাঁকা চাঁদ বা আধভাঙা চাঁদ উঠছে। কিন্তু কালো ভূতের দেখা নেই। এখন কেউ

আর গরুর পিঠে চিমটি কাটে না। এখন কেউ আর ঘুমন্ত কুকুরের কানে খড় ঢুকিয়ে দেয় না। তবু কুকুরগুলো অভ্যেসবশত ধড়মড়িয়ে উঠে ঘেউ ঘেউ করে। এখন কেউ আর বেড়ালের কানে 'কু' করে ডেকে ওঠে না।

কি করে হারাল?

কালো ভূত বুঝি কলকাতার রাস্তা দিয়ে আপন মনে হাঁটতে হাঁটতে রাস্তা হারিয়ে ফেলল। —হতে পারে।

তাহলে কি ইচ্ছে করেই, "ধৌ-ছৌ-ভৌ-নৌ" (ধুত্তরি ছাই ভালো লাগে না) বলে বিবাগী হয়ে চলে গেল।" —হতে পারে।

কেউ কি কালো ভূতকে গুম করে ফেলেছে? —তাও হতে পারে। তবে একদিন গুন্টিবাবু দিনের বেলা সবচে বড় কয়লার চাঁইটা অন্যসব কয়লার সঙ্গে বেচে ফেলল। বড় কয়লার চাঁইটা বস্তায় করে গাড়িতে উঠল। সেই গাড়ি থেকে রেলগাড়িতে উঠল। তারপর সেই রেলগাড়ি চড়ে চলে গেল বর্ধমান, বেনারস, লক্ষ্ণৌ, দিল্লি, চণ্ডীগড় কু-ঝিক-ঝিক্-ঝিক্-ঝিকঝিক। আর মাঝারি ও ছোট ছোট কয়লার চাঁইগুলো?

সেগুলো সন্ধের পর জেগে উঠে, ভূতের বৌ আর বাচ্চাকাচ্চা ছানাপোনা হয়ে অঁ অঁ করে অনেক দিন কাঁদল।

তারপর?

তারপর সেখানে যত হাঁড়ি পেল পুঁই মাচায়, লাউ ডগার মাচাঁয়, বেগুন খেতে, সবজির বাগানে, সব কটা হাঁড়ির ওপর কালো ভূতের মুখের ছবি এঁকে দিল। তার তলায় লিখে দিল, "কালো ভূত হারিয়ে গেছে। সন্ধান জানাবার ঠিকানা গুন্টিবাবুর কয়লার দোকান।"

এমন কি এখনও। এখনও কালো ভূতের বংশধররা হাঁড়ির ওপর কালো ভূতের মুখের ছবি এঁকে যাচ্ছে। শুধু "কালো ভূত হারিয়ে গেছে, সন্ধান জানাবার ঠিকানা: ইত্যাদি আর লিখে দিচ্ছে না। কারণ গুন্টিবাবুর কয়লার দোকান তো উঠে গেছে। এখন গ্যাসের যুগ। ❑



ভয়/ অনীশ দেব



বার্ডিংটা দেখে দুলির একটুও পছন্দ হল না। কিন্তু উপায় নেই। বাবা নিজে ।সে ভর্তি করে দিয়ে গেছেন। বার বার বলেছেন, "কলকাতায় থাকলে তোমার ।কটুও লেখাপড়া হবে না। তাছাড়া, আমারও বদলির চাকরি; আর সেন্ট মরিস বোর্ডিং স্কুলের যথেষ্টই নাম আছে। অংশুকাকুর মেয়েও তো ওখানে থকেই পড়ে। কী দারুণ রেজাল্ট করে প্রত্যেকবার।" ...ব্যস্, এরপর আর থা চলে না। দুলি মুখ গোঁজ করে দাঁড়িয়ে থেকেছে। খালি ভেবেছে, যে । ওকে এত ভালবাসে, সেই মা-ও অমন চুপ করে রয়েছে কেন? বলবে তা, আদরের মেয়েকে আমি এক মুহূর্তও কাছ-ছাড়া করতে পারব না। কিন্তু থাই আশা। সুতরাং মা-বাবার সঙ্গে গাড়ি করে দুলিকে রওনা হয়ে পড়তে য়েছে। লক্ষ্য সেন্ট মেরিস কনভেন্ট। কলকাতা থেকে গাড়িতে মাত্র ঘণ্টা য়েকের পথ, সবুজ গাছপালাময় শহরতলি এলাকা।

বোর্ডিংয়ে পৌঁছে বাবা দুলিকে নিয়ে গেলেন প্রিন্সিপাল মিসেস হুবার্ডের রে। কথাবার্তা আগে থেকে বলাই ছিল। অতএব দুলি ভর্তি হয়ে গেল ক্লাস নভেনে। মিসেস হুবার্ড আশ্বাস দিলেন, তাঁর স্কুলে দোলনচাঁপা দাশগুপ্তের ানো অসুবিধেই হবে না; সুতরাং ওর বাবা-মায়ের কোনো চিন্তা নেই। থাবার্তা শেষ করে বিদায় নিয়ে মা, বাবা দুজনেই চলে গেলেন। কান্না চেপে তি কষ্টে নিজেকে সামলে নিল দোলনচাঁপা। যাবার সময় মা বললেন, "ক-দিন

দেই আমরা তোকে আবার দেখতে আসব। কাঁদিস না।" এতে দুলির আরো ান্না পেয়ে গেল। ও ছুটে পালিয়ে গেল ঘর থেকে।

বোর্ডিংয়ে দু-চারটে দিন মানিয়ে নিতে না-নিতেই দুলি "দুঃসাহসী সঙ্ঘ"র বর পেল। "দুঃসাহসী সঙ্ঘ" সত্যিকারের দুঃসাহসী মেয়েদের নিয়েই। এর ত্রী সুচরিতা। ক্লাস নাইনে পড়ে। ইস্কুলের শেষে সন্ধেবেলা দুঃসাহসী সঙ্ঘের য়েরা সুচরিতার ঘরে জমায়েত হয়। নিজেরা আলোচনা করে ঠিক করে ওদের রবর্তী দুঃসাহসিক কাজ কি হবে। যেমন, ইংলিশের টীচার মিস গোমসকে কছুটা শায়েস্তা করা যায় কি না; অথবা, ক্লাস নাইনে যে ইদানীং বই-খাতা রির হিড়িক লেগেছে সেই চোরকে কীভাবে ধরা যায়— এইসব। সুচরিতার রের এই মিটিংয়ে শুধুমাত্র মেম্বাররাই উপস্থিত থাকে। কারণ বাইরের কাউকে কতে দেওয়া হয় না। এসব ঘটনা দুলি প্রথম শুনতে পায় ওরই ক্লাসের মিতার কাছে। শমিতা দুঃসাহসী সংঘের সভ্য, সুতরাং দুলি ওকে জিজ্ঞেস রে, "আমাকে তোদের ক্লাবের মেম্বার করে নে না—"

উত্তরে শমিতা ঠোঁট ফুলিয়ে বলেছে, "অত সহজ নয়; আগে তোকে একটা সাঙ্ঘাতিক সাহসের কাজ করতে হবে, তাহলে—"

দোলনচাঁপা অবাক হয়ে শমিতার দিকে তাকিয়ে থেকেছে। তখন শমিতা বলল, "আমাদের ক্লাবে ঢুকতে গেলে কোনো টাকা-পয়সা লাগে না। শুধু ভীষণ সাহসের কোনো কাজ করে দেখাতে হয়।" একটু থেমে ও আবার বলেছে, "জানিস, আমি রাত্তিরবেলায় ইস্কুল গ্রাউন্ডের পেছনে যে পুকুরটা আছে সেটা সাঁতরে পার হয়েছি, তারপর সুচরিতাদি আমাকে মেম্বার করেছে—"

শুনে দুলি এতটুকু দমেনি। একে তো হোস্টেলে এসে মন খারাপ ছিল, তার ওপর বাবা-মায়ের প্রতি অভিমানবশে ও ঠিকই করে ফেলল, যা হয় হবে। যে-কোনো দুঃসাহসের পরীক্ষা দিতে ও রাজি আছে। দুঃসাহসী সঙ্ঘের দলে ও যেমন করে হোক নাম লেখাবেই। শমিতা উৎসাহ নিয়ে বলল, "ঠিক আছে, আমি তাহলে আজ সুচরিতাদিকে বলে রাখব—"

সেই রাতের মিটিংয়েই সব ঠিক হয়ে গেল।

শমিতার কাছে দোলনচাঁপার ইচ্ছের কথা জানতে পেরে সুচরিতাদি ওকে ডেকে পাঠিয়েছে ওদের মিটিংয়ে। গোটা হোস্টেলের মধ্যে মাত্র পাঁচজন এ পর্যন্ত দুঃসাহসী সঙ্ঘের মেম্বার হতে পেরেছে। দুলি হাতে চলেছে ছ নম্বর। বিরাট সম্মান। ফলে ওর বুকটা একটু ঢিপ-ঢিপ করবে সে আর আশ্চর্য কী! সবাই মিলে আলোচনা করে ঠিক হল, মোটামুটি সহজ কাজই করতে বলা হবে দুলিকে। ইস্কুল-এলাকার পশ্চিম দিকে খানিকটা হালকা জঙ্গল মতো আছে। তারই কাছাকাছি রয়েছে ইস্কুলের ছোট্ট সুন্দর সুইমিং পুল। শোনা যায়, বছর দশেক আগে ঐ অশত্থ-দেবদারু-পাম গাছের সমারোহের মধ্যে একজন বুড়ি

আয়ি গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছিল। তার পর থেকেই ওই দিকে কাউকে যেতে দেওয়া হয় না— বিশেষ করে সন্ধের পর। আয়ি আত্মহত্যা করেছিল একটা অশত্থ গাছের ডালে ফাঁস দিয়ে। সুতরাং আজ রাত এগারোটায় দুলিকে যেতে হবে ঐ অভিশপ্ত অশত্থ গাছের কাছে, এবং গাছের গায়ে নিজের নাম খোদাই করে আসতে হবে। কাল সকালে সুচরিতাদিসমেত সব্বাই গিয়ে সেই প্রমাণ দেখে আসবে। তারপর দোলনচাঁপা দাশগুপ্ত হবে দুঃসাহসী সঙ্ঘের সভ্যা।

সুচরিতাদির মুখে কথাগুলো শুনতে শুনতে দুলির বুকটা যে দু-একবার ছ্যাঁত করে ওঠেনি তা নয়। কিন্তু সহজে পরাজয় মেনে নেবার পাত্রী ও নয়। সুতরাং বুক ফুলিয়ে তেজীয়ান সুরে ও বলে উঠেছে, "আমি ঠিক পারব, সুচরিতাদি। আমি ওখানে গিয়ে চুলের কাঁটা দিয়ে গাছের গায়ে ডি-অক্ষরটা লিখে দিয়ে আসব, তুমি দেখ।"

"তাহলে তক্ষুনি তোমাকে আমরা মেম্বার করে নেব", সুচরিতাদি বললেন।

শমিতা চাপা গলায় ওকে সাহস দিল, তারপর ওরা বেরিয়ে এল মিটিং ছেড়ে।

কিন্তু দুলির সামনে এখন দুটো সমস্যা। এক, রাত এগারোটায় নিজের ঘর ছেড়ে বের হওয়া; দুই, মিসেস হুবার্ডকে ফাঁকি দেওয়া। কারণ, রাত দশটা নাগাদ তিনি প্রত্যেকের ঘরের দরজা ফাঁক করে উঁকি মেরে গুড নাইট জানিয়ে যান, এবং স্বচক্ষে দেখে যান, সকলে যার-যার ঘরে শুয়ে আছে কি না। নিয়মশৃঙ্খলার এতটুকু এদিক-ওদিক তিনি একেবারে বরদাস্ত করেন না।

প্রথম সমস্যার সমাধান করল শমিতা। সেই দুলিকে শিখিয়ে দিল কীভাবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়ে বাইরে বেরোতে হবে। আর দ্বিতীয় সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করল দুলি নিজেই।

ঠিক রাত দশটায় দুলির ঘরের দরজা সামান্য ফাঁক হল এবং মিসেস হুবার্ডের ছায়া-ছায়া মুখটা দেখা গেল। বিছানায় শোয়া ছোট্ট শরীরটাকে লক্ষ করে চাপা স্বরে উনি বললেন, "গুড নাইট, দোলনচাঁপা।" দরজা আবার বন্ধ হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ঘরের এক অন্ধকার কোণ থেকে দুলি বেরিয়ে এল। বিছানার কাছে এসে চাদর-ঢাকা জিনিসটার ওপর আদুরে হাত বোলাল। খুব জোর বোকা বানানো গেছে মিসেস হুবার্ডকে। অন্ধকার ঘরে জানালা দিয়ে বিছানার ওপর এসে পড়েছে এক ফালি চাঁদের আলো। সেই আলোছায়ায় চাদর-ঢাকা শোয়ানো পাশ-বালিশটাকে দুলি বলে ভুল করেছেন মিসেস হুবার্ড। দুলির আর তর সইল না। একটা চুলের কাঁটা কোমরে গুঁজে তৈরি হয়ে বেরিয়ে পড়ল ও। এই লোহার কাঁটাটা ওকে ভূতের ভয় থেকে বাঁচাবে।

একটু আগেই ঝমঝম করে এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, কিন্তু এখন আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার, দেখা যাচ্ছে গোল থালার মতো চাঁদ। ঘাসে ছাওয়া ভিজে মাটির ওপরে ছোট্ট ছোট্ট পা ফেলে ছুট লাগাল দুলি। অশত্থ গাছটা এখান থেকে দূর কম নয়। সুতরাং একটু গা ছম-ছম করলেও ওর সঙ্গে তাল মিলিয়ে দৌড়ে চলা নিজের লম্বা ছায়াটাকে দেখে অনেকটা ভরসা পেল দুলি। ওর চারপাশে শুধু ভিজে মাটি, ঠান্ডা বাতাস ও অন্ধকার রাত।

এক সময় দুলির চোখে পড়ল ঝুপসি অশত্থ্ গাছটা। চোখ কান বুজে চুলের কাঁটা বাগিয়ে ধরে গাছের গোড়ায় এগিয়ে গেল দুলি। একবার ওপরে তাকাল। কোন্ ডালটায় গলায় দড়ি বেঁধে দিয়ে ঝুলেছিল আয়ি? হঠাৎই ও শুনতে পেল রাত-জাগা একটা পাখির কর্কশ চিৎকার। ভয়ে ওর বুকটা যেন ঠান্ডা হয়ে গেল। তাড়াহুড়ো করে গাছের গুঁড়িতে কোনোরকমে ডি অক্ষরটা লিখে দুলি ছুটে চলল বোর্ডিংয়ের দিকে। চুলের কাঁটাটা কোথায় যে পড়ে গেল ওর আর খেয়াল রইল না। জল-কাদা ডিঙিয়ে ছুটে চলল দুলি। এত ব্যস্ত না হলে হয়ত ওর নজরে পড়ত, ভরসা দেবার জন্যে ওর লম্বা ছায়াটা এখন আর ওর সঙ্গে নেই। কোথায় চলে গেছে কে জানে!

নিজের ঘরে ফিরে টিপটিপে বুকে আস্তে করে দরজা ফাঁক করল দুলি। নাঃ, সব কিছু একইরকম আছে। চাঁদের সাদা আলো, চাদর-ঢাকা পাশবালিশ— সব। দুলি যে এতক্ষণ ঘব-ছাড়া ছিল সেটা কেউ তাহলে টের পায়নি! ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করল ও। তারপব বিছানার কাছে গিযে দাঁড়াল। শোবাব জন্যে পাশবালিশের ওপব থেকে চাদরটা সবাতে গেল। কিন্তু সেই মুহূর্তে চাদরের তলা থেকে বেরিয়ে এল শীর্ণ, জিবজিরে একটা হাত। হাতটা জলে ভেজা, সপসপ করছে। আর ঠিক তখনই জানলা দিয়ে ছুটে এল এক ঝলক হিমেল বাতাস, দুলির বুক কাঁপিয়ে দিল। ❑



ভূতের কাছারি/ রূপক চট্টরাজ



সেদিন ছিল শনিবার। দুপুর দুটোয় অফিস ছুটি। ছুটির পর সব্যসাচীবাবুর স বইমেলায় যাচ্ছিলাম। ধর্মতলা আসতেই দেখা হয়ে গেল বারিদবাবুর সঙ্গে। অপে করছিলেন দেখে জিজ্ঞেস করলাম— কি ব্যাপার দাঁড়িয়ে কেন এখানে?

উত্তরে বললেন, বইমেলায় যাব, কিন্তু রাস্তায় যা মিছিল। দেখুন, ট্রাম-বা সব ঘুরে ঘুরে যাচ্ছে। কি করে যাই বলুন তো?

সব্যসাচীবাবু বলে উঠলেন, আরে আমরাও তো ওখানেই যাচ্ছি। চলু হেঁটেই যাওয়া যাক। তিনজনে আছি, কতক্ষণ আর সময় লাগবে। মাইল দেড়েকে পথ হবে। গল্প করতে করতেই পৌঁছে যাব।

বেশ তাই হোক, বলে তিনজনে হাঁটতে শুরু করলাম।

শীতের শেষে রোদটা বেশ আরাম লাগছে। সামনের ধুধু মাঠ। দূ বইমেলার টিনের চালাগুলো আবছা ভেসে উঠছে। একটু এগিয়ে যেতে সব্যসাচীব বললেন, একটা ভূতের গল্প বলছি শুনুন। যদিও এটা ভূতের গল্পের পরিবে নয়, সময়টা কাটানোর জন্যই বলছি। এটা বেশ জমাটি গল্প। অবশ্য এ গল্প বাবার মুখে শোনা—

বেশ কিছুদিন আগের কথা। তখন আনুমানিক ১৯৪৬ সাল হবে। বা উল্টোডাঙার একটা বেসরকারি সংস্থার স্টোরস ইনচার্জ। অপিসের এক বন্ধু পর পর তিনদিন অনুপস্থিতিতে ওঁর বাড়ি গেলেন খবর নিতে। গিয়ে শুনলে

ওঁর ছেলের ভীষণ অসুখ। থেকে থেকে শুধু মুখ দিয়ে রক্তবমি উঠছে। কোথাও কোন আঘাত লাগেনি। ওর স্বাস্থ্যটাও বেশ ভাল অথচ হঠাৎ কেন এমন হল জানি না। ডাক্তাররাও হিমশিম খাচ্ছেন রোগ ধরতে।

বাধ্য হয়ে গতকাল হাসপাতালে পাঠাতে হল ছেলেকে। কিন্তু কোন সুরাহা হল না। এখানে রোগ ধরা পড়েনি। ছেলের একই অবস্থা।

বাবা একটু চিন্তা করে বন্ধুকে বললেন, আপনি কি তুকতাক বা ঝাড়ফুঁক বিশ্বাস করেন? যদি করেন তবে আপনাকে একজনের কাছে নিয়ে যেতে পারি। উনি পেশায় ওঝা। এসব ব্যাপারে ওঁর বেশ নামডাক আছে।

বন্ধুটি বাবার কথায় রাজি হয়ে সেই ওঝার কাছে গেলেন। ওঝা সব শুনে বললেন, এটা এমন কিছু নয়। তাড়াতাড়ি সেরে যবে। এখনই জপ করে দিচ্ছি। হাসপাতালে গিয়ে দেখুন সব ভাল হয়ে গেছে।

ঠিক তাই হল। বাবা আর বন্ধুটি একসঙ্গে হাসপাতালে এলেন, তারপর খবর নিয়ে জানলেন রক্তবমি বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু কি হয়েছিল সেটা ডাক্তার এখনও বুঝে উঠতে পারেননি। তাই ছেলেকে অবজারভেশনে রেখেছেন।

বন্ধুটি ও বাবা বাড়ি ফিরলেন। পরদিন সকালে ফের বন্ধুটি বাবাকে সঙ্গে নিয়ে সেই ওঝার কাছে গেলেন ছেলের সুস্থ সংবাদ জানাতে এব কিছু দক্ষিণা দিয়ে আসতে।

ওঝা হাসতে হাসতে বললেন, এসব আবার কেন? যদি কিছু দিতে ইচ্ছে করে তবে মাদারিপুরের জঙ্গলে গিয়ে দিয়ে আসুন। আপনাকে কিন্তু একা যেতে হবে। ক্যানিং রেল স্টেশনের থেকে তিন-চার মাইল দক্ষিণে একটা গাঁ আছে। ওটার নাম মাদারিপুর। গাঁ পেরিয়ে আরো দক্ষিণে গেলে একটা জঙ্গল দেখতে পাবেন। মাইল দুয়েক জঙ্গলের ভিতর যাবেন। দেখবেন একটা ফাঁকা চালাঘর আছে। ওখানে গেলেই দেখতে পাবেন একটা মস্ত পুকুর। আর তার বাঁ দিকে একটা সরু পথ পূর্ব দিক বরাবর চলে গেছে। ঐ পথ ধরে তিরিশ পা মতন এগোলেই দেখতে পাবেন বুড়ো গাব গাছ। গাছটার তলায় একটা গর্ত আছে। ওখানে গিয়ে একটা জ্যান্ত শোলমাছ আর একছড়া পাকা কলা ঐ গর্তে রেখে দিয়ে আসুন। যদি ফিরতে সন্ধে হয়ে আসে তবে জঙ্গল ছেড়ে আসবেন না। ঐ ফাঁকা চালাঘরে রাতে বিশ্রাম নেবেন। নইলে পথে বিপদ হবে। সকালের আলো ফুটলেই বাড়ি ফিরে আসবেন।

ওঝার কথামত সব কিছু গুছিয়ে নিয়ে বন্ধুটি পরদিন ভোরে রওনা হলেন। রাত কাটাবার মত খাবার-দাবার পুঁটলি বেঁধে সঙ্গে নিয়েও গেলেন তখন ওই পথে যাতায়াতের এতটা সুযোগ ছিল না। অনেকটা পথ হেঁটে নদী পেরিয়ে গিয়ে হাজির হলেন সেই জঙ্গলে।

কিছু দূর যাওয়ার পর সেই চালাঘরটা দেখতে পেলেন। দেখে একা

ধাতস্ত হলেন। তখন বেলা গড়িয়ে এসেছে। পোঁটলা-পুঁটলি ঐ চালাঘরে রেখে পুকুরে হাতমুখ ধুয়ে ওঝার কথামত তিরিশ পা দূরে বুঁড়ো গাব গাছের তলার গর্তে জ্যান্ত শোলমাছ আর কলা পুঁতে দিয়ে এলেন। চালাঘরে ফিরে এলেন তারপরে।

বাড়ি ফিরতে রাত হয়ে যাবে ভেবে বন্ধুটি সেই রাতটা ঐ চালাঘরে বিশ্রাম নিলেন আহারাদি সেরে। সারাদিনের ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুমিয়ে পড়লেন।

মাঝরাতে বন্ধুটির ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলে দেখলেন সামনেই ফাঁকা মাঠে একজন চেয়ারে বসে আছেন। বিশাল চেহারা। পিছনে ধুধু মাঠ। চারিদিকে আলো ঝলমল করছে। কোন গাছপালার চিহ্ন সেখানে নেই। একটা অস্ফুট স্বর কানে ভেসে এল। দেখলেন চেয়ারে বসা লোকটির সামনে এসে কে একজন আবছা অশরীরী চেঁচিয়ে অপর একজনের নাম ধরে ডাকল। চেয়ারে বসা লোকটি আদেশ জারি করল। পরক্ষণেই আরেকটি লোক অন্য একজনকে ধরে নিয়ে এল।

চেয়ারে বসা লোকটি জিজ্ঞাসাবাদ করার পর তাকে শাস্তি দিল। দোষ স্বীকার করার পর ওর মুক্তি হল।

এই ভাবে পাঁচ-ছয়জনকে মুক্তি দিল চেয়ারে বসা লোকটি। এবার বন্ধুটির ডাক এল। বন্ধুটি শুয়ে শুয়েই দেখলেন যে ঠিক তার মত চেহারার একজন লোক ঐ নামে এসে হাজির হল চেয়ারে বসা লোকটির সামনে। অত আলোতেও লোকটিকে ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না। শুধু মনে হচ্ছিল যেন নিজে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। এক নাম, এত মিল যেন ভাবাই যায় না।

চেয়ারে বসা লোকটি তাকে বলল, একবার যাচ্ছিলাম তোমার বাড়ির পাশ দিয়ে। যখন যাচ্ছিলাম তখন তোমার ছেলে আমার গায়ে থুতু ফেলেছে। তাই অভিশাপ দিয়েছি যে ওর থেকে থেকেই রক্তবমি উঠবে। তুমি তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছ, আর আমার প্রিয় শোলমাছ ও কলা আহারের জন্য দিয়েছ, তাই তোমার ছেলে এখন থেকে মুক্তি পেল। ওর আর রক্তবমি হবে না। যাও, তুমি এখন বাড়ি যাও।

চমকে উঠলেন বন্ধুটি। ঘুম ভেঙে গেল। ভাবলেন একি! এতক্ষণ তিনি নিজেকেই দেখছেন শুয়ে শুয়ে। কোন ভূত-টুত নয়তো।

এদিকে সকাল হয়ে এসেছে। চোখ রগড়াতে রগড়াতে আরো ভাবলেন, নিশ্চয় স্বপ্ন দেখছিলেন। এখন তিনি একা জঙ্গলের মধ্যেই পড়ে আছেন। তাড়াতাড়ি উঠে বাড়ির দিকে রওনা হলেন।

বাড়ি ফিরে এসে পরদিন ফের সেই ওঝার কাঝে গেলেন। সব ঘটনাটা খুলে বললেন। ওঝা চেয়ারে বসা লোকটির চেহারার বর্ণনা শুনে বললেন,

ঠিক আছে, আপনার আর ভয়ের কিছু কারণ নেই। আপনার ছেলে আরো সুস্থ হয়ে উঠবে। আপনি যে কাল রাতে ভূতের কাছারিতে গিয়েছিলেন। ওদের বিচার দেখে এসেছেন নিজের চোখে। চেয়ারে বসা লোকটি ওদের বিচারক। আর আপনার কোন ভয়-ভাবনা নেই। যান, এখন বাড়ি ফিরে যান।

গল্পটা শুনে বারিদবাবু ও আমি অবাক হয়ে গেলাম। গল্পের টানে আমরা বইমেলার গেটের কাছে চলে এসেছি। টিকিট কেটে ভিতরে ঢুকতে কিছু বিজ্ঞাপন চোখে পড়ল— কোথাও লেখা 'সব ভূতুড়ে', কোথাও বা 'ভূতেরা চাউমিন ভালবাসে।' আরো এক জায়গায় লেখা 'ভূতগুলো সব গেল কোথায়', এবং তার পাশেই 'সব ভূত এইখানে'... ইত্যাদি। ❑



অদ্ভুতুড়ে/ কার্তিক ঘোষ



আঁকার খাতা নিয়ে বসলেই ইতার দারুণ মজা হয়। মন থেকে কত কি যে আঁকে তার ঠিক নেই। বাঘটা যেন বাঘ নায়। বেড়াল। ইতার দিকে চোখ পড়লেই মিট মিট করে হাসে।

একটা পাখি। কার মতন দেখতে? ধুস। ইতা পাখিটাকে চেনেই না। আঁকতে গিয়ে কি সুন্দর রঙ চঙে হয়ে গেছে। ঠোঁটটা নীল। ডানা দুটো প্রজাপতির মতন দেখতে। ল্যাজটা যেমন লম্বা তেমনি ঝলমলে। রঙ পেনসিলের সবকটা রঙ দিয়ে আঁকা হয়েছে পাখিটা।

ইতা ওর নাম দিয়েছে বাহারি।

কিন্তু ভর দুপুরে সেদিন কি যে হল কে জানে। ড্রইং খাতার শেষ পাতায় কালো রঙের তুলিটা পড়ে গেল। ইস! মনটা দারুণ বিগড়ে গেল ইতার। সাদা পাতায় কালো রঙের ছাপ পড়ে এমনই ছিরি হল বলার নয়।

ইতা বললে, তবে রে। দাঁড়া। মজা দেখাচ্ছি। বলতে বলতে কালো রঙের গোল্লাটায় দুটো গোল গোল ফোঁটা দিয়ে বললে, এই হল চোখ।

তারপর লম্বা লম্বা দুটো হাত আর পা এঁকে বললে, এর কান নেই, নাক নেই। কিন্তু দাঁত থাকবে।

বলতে বলতেই এক মুখ দাঁত এঁকে দিলে। অমনি ছবিটা কেমন খিক খিক করে হেসে উঠল।

স উঠতেই ড্রইং খাতা ফেলে ইতা ছুটল মায়ের কাছে।

—ওমা ভূত।

ভর দুপুরে মায়ের ঘুমটাও ভেঙে গেল। ড্রইং খাতা দেখে মা বললে, ছবিটা বেশ হয়েছে। এটা ভূত হবে কেন! এ হল অদ্ভুত! কথাটা ইতার মনে বেশ ধরল।

কিন্তু পরের দিন ইসকুলে গিয়ে বাধল নতুন ঝামেলা। ব্যাগ খুলতেই দেখলে পেনসিলটা কে যেন চিবিয়ে রেখেছে।

ইস! অঙ্কের দিদিমণি ভাগ্যিস দেখতে পাননি।

বন্ধুরা বললে, কি রে ইতা, আজ তোর কি হয়েছে! মুখটা অমন গোমড়া কেন?

ইতা কাউকে কিচ্ছুটি বলে না। টিফিনের সময় টিফিন বাক্সো খুলে দেখে আধ খাওয়া এক টুকরো পাউরুটি সঙ্গে চিমসে একটা রসগোল্লা। রসটা সব চুষে কে যেন খেয়ে নিয়েছে।

রাগে ইসকুল ব্যাগটাই ছুঁড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে ইতার। বাড়ি ফিরে ভেউ ভেউ করে কেঁদে ওঠে।

মা বলে, কি কান্ড। চার পিস মাখন মাখানো পাউরুটির সঙ্গে দুটো বড় বড় রসগোল্লা দিয়েছিলুম। কই, ব্যাগটা দেখি।

খুঁজে খুঁজে একটা ইঁদুর কি আরশোলাও দেখতে পায় না কেউ। বাবাও শুনে হাঁ হয়ে যায় অপিস থেকে ফিরে।

পরের দিন খুব সাবধানে থাকে ইতা। ইসকুল ব্যাগটা পিঠে না ঝুলিয়ে হাতে ধরে রাখে।

কিন্তু তবু কি আশ্চর্য কান্ড। ড্রইং দিদিমণির ক্লাসে রঙ তুলির বাক্সোটা বার করতেই সবাই হাঁ। ইতার রঙ চকলেটগুলো কে যেন সব কামড়ে কামড়ে আধ খাওয়া করে রেখে দিয়েছে। তুলিটাও এমন চিবিয়েছে বলার নয়। অভিমানে ইতার চোখ দুটো ছল ছল করে উঠল।

দিদিমণি বললেন, দেখি তোমার আঁকার খাতাটা।

ওমা! খাতা খুলতেই ইতা থ।

দিদিমণি রেগে গেলেন, এসব কি হয়েছে?

ছবিগুলোর ছিরি দেখে মুখটা এতটুকু হয়ে গেল ইতার। বাঘটার একটা কান কে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে। ল্যাজটাও কাটা। আর সেই পাখি? এ মা! পাখির পা দুটো কে অমন করে চিবিয়ে দিয়েছে কে জানে! ডানা দুটোর ওপর ফেলে দিয়েছে এক ঢ্যাবরা কালি।

ইস! নদীর ছবিটায় দুটো নৌকো ঠিক আছে। কিন্তু একটাও মাঝি বেঁচে নেই। মুন্ডুগুলো সব কাটা। বাপরে! ছবিটা দেখেই ভয়ে চুপসে যায় ইতার মুখটা। ড্রইং দিদিমণি সবকটা ছবিতেই শূন্য বসিয়ে ছুঁড়ে দেন।

বাড়ি ফিরে ইতা আর কিচ্ছু খেতে চায় না।

আঁকার খাতা দেখে বাবা-মা দুজনেই দারুণ অবাক! এমন কান্ড কি করে হতে পারে!

ইতার বন্ধুরাও বুঝতে পারে না ব্যাপারটা। ইসকুল যাবার সময় হলেই ভয়ে শুকিয়ে যায় ইতার মুখটা। কে জানে, আজ আবার কি হবে!

সেদিন ছিল বাংলা পরীক্ষার প্রথম দিন। লিখতে বসেই ইতা দেখলে এ মা, এ কার কলম। একটুও কালি নেই! বুঝতে পেরে ভূগোলের দিদিমণি নিজের কলমটাই লিখতে দিলেন ইতাকে। কিন্তু চেনা বানানগুলো এমন ভুল হতে লাগল যে বলার নয়।

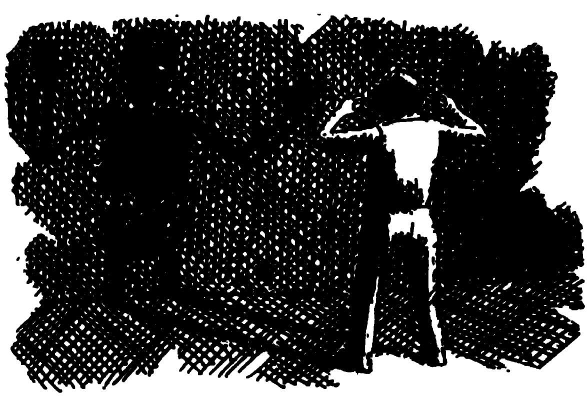
মনটা খুব খারাপ হয়ে গেল। সন্ধেবেলা বাবা সব শুনে বললে, দেখি কলমটা কার?

ব্যাগের মধ্যে আর তখন ইতা সেটা খুঁজে পেলে না। মা বললে, ম্যাজিক না কি?

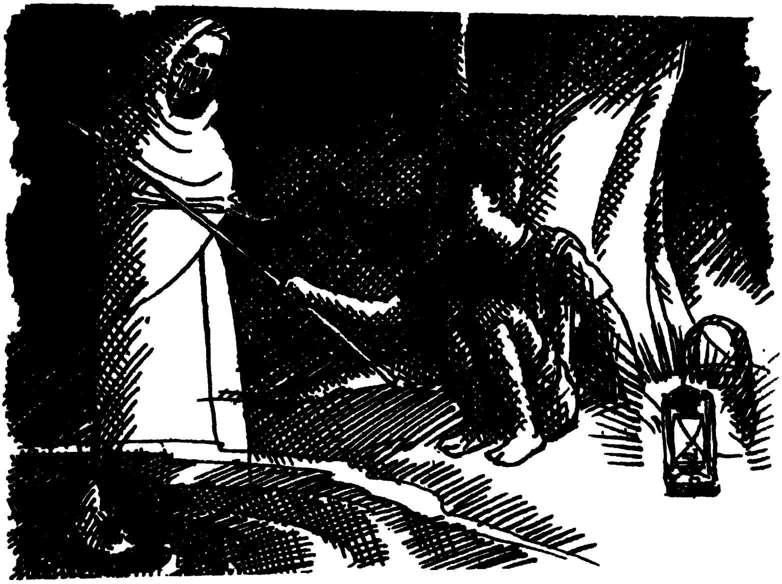
মাঝ রাতে সেদিন যখন ঘুমটা ভেঙে গেল ইতার, দেখলে মশারির বাইরে কে যেন দাঁড়িয়ে আছে দাঁত বার করে। ঠিক যেন খাতার সেই ভূতটার মতন দেখতে। আর একটুও ভয় পেল না ইতা।

মাকে ডাকতেই মা উঠে পড়ল। আলো জ্বেলে ইতা নিজেই জল খেয়ে এল। তারপর সকালবেলা উঠেই ড্রইং খাতার ভূতটাকে সত্যিকার একটা মানুষের মত এঁকে ফেললে রঙ দিয়ে। তার কান দেখে, নাক দেখে বাবাও বেশ খুশি হয়ে উঠল একসময়।

সেদিন থেকে ইতার যে কি হল কে জানে! ইসকুলে সে সবার সেরা হয়ে উঠল ছবি আঁকায়। ❑



অশরীরী টহলদার/ সুধীন্দ্র সরকার



'রাম রাম' বলতে বলতে রামবিলাস রাইফেল হাতে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল। ট্রিগারে আঙুল রেখেও টিপতে পারল না। হাতের আঙুল তখন আয়ত্তে ছিল না, ভয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

শিউশরণ কোনো রকমে ঢোঁক গিলে বললে, "পা-কাটা ভূতটা আবার এসেছে!"

রামবিলাস ঘাড় নেড়ে সমর্থন জানাল। কিন্তু মুখ দিয়ে কোনো আওয়াজ বের করতে পারল না। ওর নিষ্পলক দৃষ্টি সামনে প্রসারিত।

মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার টিকিয়াপাড়া রেলইয়ার্ড ছেড়ে ঝিল-সাইডিংয়ের কাছে সিগন্যালে দাঁড়িয়েছিল তখন। সিগন্যাল হলুদ হলেই হাওড়া স্টেশনে ঢুকবে। রেলইয়ার্ড ছেড়ে প্রায় প্রত্যেকটা খালি গাড়ি স্টেশনে ঢোকার মুখে এই সিগন্যালে দাঁড়ায়। আর, এখানেই যত চোরের উৎপাত। ট্রেনের মালপত্তর নির্বিবাদে ভেঙে নিয়ে পালায় রাতের অন্ধকারে।

রামবিলাস আর শিউশরণের ডিউটি পাহারা দেওয়া। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স সংক্ষেপে আর-পি-এফের সেপাই ওরা। টিকিয়াপাড়া রেলইয়ার্ডে ঢোকার মুখে একটা টিনের গুমটি ঘরে বসে থাকে ওরা। মাঝে মাঝে আবার টহলে বেরোয়। অবাঞ্ছিত কোনো লোককে তো রেলইয়ার্ডে ঢুকতেই দেয় না, উপরন্তু চোরের উপদ্রব সামলায়।

"ভূ...উ...ত..." বলতে বলতে রামবিলাস জ্ঞান হারাল।

রামবিলাসকে হঠাৎ ধপ্ করে পড়ে যেতে দেখে থতমত খেয়ে গেল শিউশরণ। কী করবে কিছুই ভেবে পেল না। কয়েক মুহূর্ত থমকে দাঁড়িয়ে থেকে কী যেন চিন্তা করল। তারপর তড়িঘড়ি জুড়িদারকে কাঁধে চাপিয়ে ছুটল অফিসের দিকে।

মাসখানেক আগের কথা। সন্ধে থেকে মুষলধারে বৃষ্টি হচ্ছিল সেদিন। রামবিলাস আর শিউশরণ বসেছিল শ্যেনদৃষ্টি নিয়ে। সাড়ে নটা বাজতেই গোরক্ষপুর এক্সপ্রেসের খালি গাড়ি ইয়ার্ড থেকে বেরিয়ে গেল হাওড়া স্টেশনের দিকে। কোনো চোর-টোরের উপদ্রব ছিল না সেদিন। আসলে ওদের দুজনকে চোরেরা চেনে। ওদের চোখের সামনে চুরি করা সহজসাধ্য নয় জেনেই, রেলইয়ার্ডের আর-পি-এফ ইন্সপেক্টর মি: সমাজপতি ওদের জন্য রাতের ডিউটি বেঁধে দিয়েছেন। ওরা অবশ্য আপত্তি জানায় না। কারণ, রাতের ডিউটিতে মাইনে ছাড়াও বাড়তি টাকা বরাদ্দ আছে।

হাতঘড়িতে চোখ রাখল শিউশরণ। রাত দশটা। মোগলসরাই প্যাসেঞ্জার ঘড় ঘড় করতে করতে বেরিয়ে গেল রেলইয়ার্ড ছেড়ে। থ্রু সিগন্যাল ছিল বলে ঝিল-সাইডিংয়ের কাছে ট্রেনটা আজ দাঁড়াল না।

শিউশরণ বলল, "রামবিলাস খৈনি বানা।"

রামবিলাস ঘাড় নেড়ে খাকি প্যান্টের পকেট থেকে টিনের একটা চেপ্টা ডিবে বের করল। সবে দোক্তাপাতা ছিঁড়তে শুরু করেছিল, এমন সময় শিউশরণ তড়াক করে উঠে দাঁড়াল।

"একটা চোর গাড়ি থেকে ব্যাটারি ফেলছে রে!" বলেই শিউশরণ রাইফেল তুলে ছুটল ঢিমেগতিতে চলা মোগলসরাই প্যাসেঞ্জারের দিকে।

রামবিলাস হাতের দোক্তা-চুন ঝেড়ে পিছু নিল ওর। এদিকে চোরটা ততক্ষণে গাড়ির সেল-বক্স থেকে একটা ব্যাটারি মাথায় চাপিয়ে ছুটতে শুরু করেছিল ফ্লাইওভারের দিকে। এই ফ্লাইওভার লাইন দিয়ে গুডস্ ট্রেন যায়। ফ্লাইওভারের ওপাশে আগে চলত হাওড়া-আমতা ন্যারো গেজের মার্টিন ট্রেন। এখন চলে না। বন্ধ হয়ে গেছে অনেক দিন আগে।

তর সইছিল না শিউশরণের। ছুটতে ছুটতে দাঁড়াল। সেফটি ক্যাচ তুলে চোখ রাখল রাইফেলের মাছিতে। কিন্তু ট্রিগার আর টিপতে হল না। তার আগেই দুরন্ত গতিতে ছুটে আসা মেচেদা লোকাল ঝাঁপিয়ে পড়ল চোরটার ঘাড়ে।

"ইস্!" বলে চোখ বন্ধ করল শিউশরণ।

"কাট গিয়া! কাট গিয়া!" বলতে বলতে রামবিলাস দৌড়ে গেল। শিউশরণও রাইফেলের সেফটি ক্যাচ লক্ করে ছুটল পেছনে। টর্চের আলোতে ওরা দেখল,

চোরটার দুটো পা-ই মেচেদা লোকালের চাকাতে কেটে গেছে। ব্যাটারিটা ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে ছিটকে আছে চারপাশে। ঝুঁকে দেখল রামবিলাস। গালের কষ বেয়ে রক্ত পড়ছিল চোরটার। দেহে প্রাণের কোনো চিহ্ন নেই...!

সেই ঘটনার পর থেকেই শিউশরণ আর রামবিলাস প্রায়ই দেখতে পায়, রাতের অন্ধকারে একটা ছায়ামূর্তিকে মাথায় ব্যাটারি চাপিয়ে লাইনের ধারে ঘোরাফেরা করতে। ছায়ামূর্তিটার হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের অংশ নেই!

জ্ঞান ফিরল যখন, রামবিলাস চারপাশে চোখ বোলাল। দেখল, অফিসের ভেতরে একটা বেঞ্চিতে শুয়ে আছে। ওর মুখের ওপর ঝুঁকে আছে শিউশরণ।

শিউশরণ জিজ্ঞেস করল, "এখন একটু ভাল লাগছে তো?"

"হুঁ।" রামবিলাস ঘাড় নাড়ল।

শিউশরণ ফের বলল, "আগেও তিনবার পা-কাটা ভূতটাকে দেখেছিলিস, তখন তো এমন জ্ঞান হারাসনি?"

রামবিলাস কোনো কথা বলল না। বেঞ্চিতে উঠে বসল।

ইন্সপেক্টর সমাজপতি বললেন, "তোমরা যদি ভূতের ভয়ে পিছিয়ে যাও, তাহলে তো চোরদের পোয়াবারো। তাছাড়া রামবিলাসের অজ্ঞান হওয়ার খবরটা ছড়িয়ে পড়লে অন্য কোনো সেপাইও রাতে আর ডিউটি করতে সাহস পাবে না।"

মাথা নিচু করে বসেছিল রামবিলাস।

শিউশরণ রামবিলাসের পিঠে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বলল, "গুমটিতে চল। ডিউটি-অফ হতে এখনও ঢের দেরি।"

রাইফেলটা কাঁধে চাপাল শিউশরণ। রামবিলাস নিঃশব্দে অনুসরণ করল ওকে।

রামবিলাস আর শিউশরণ এখনও সেই রাতের ডিউটিতেই বহাল। এর মধ্যে বেশ কয়েকবার সেই পা-কাটা ভূতটাকে দেখেছিল বটে, কিন্তু কেউই আর ভয়টয় পায়নি। ব্যাপারটা ওদের যেন গা-সওয়া হয়ে গিয়েছিল। এমনিভাবে ছ'মাস কেটে যাওয়ার পর হঠাৎ একটা ফায়ারিং কেসের ঘটনা ঘটল ওই একই জায়গায়। এবারে একসঙ্গে দু'দুটো চোর মারা পড়ল রাইফেলের গুলিতে।

ইদানীং রেলইয়ার্ড সংলগ্ন এলাকায় চোরের উপদ্রব বেড়ে যাওয়াতে, সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্সকে পাহারার কাজে লাগানো হয়েছিল। ওদের সঙ্গে রামবিলাস আর শিউশরণ ছিল গাইড হিসেবে। চোর কখন আসে, কী চুরি করে ইত্যাদি জানানো ছিল ওদের কাজ। বস্তুত, ওদের দুজনের কর্মদক্ষতার রিজার্ভ ফোর্সের সেপাইরা দাগী দুটো চোরকে বামাল সমেত গুলি করে মেরে ফেলতে পেরেছিল।

হৈ হৈ পড়ে গিয়েছিল আর-পি-এফ মহলে। রেলওয়ে পুরস্কৃত করল রামবিলাস আর শিউশরণকে। পরপর তিন জন দাগী চোরের মৃত্যুতে রেলের

মাল চুরি বন্ধ হয়ে গেল বেশ কিছুদিনের জন্য। এদিকে চোরমহল জল্পনা কল্পনার শেষ নেই। ওরা সাময়িক চুরি বন্ধ করল বটে, কিন্তু তলে তলে ফন্দি আঁটতে লাগল কী করে আর-পি-এফদের জব্দ করা যায়।

শুরু হল আর এক নতুন বিপদ। ইন্সপেক্টর সমাজপতিও চিন্তিত। কারণ, রামবিলাস আর শিউশরণের মতো সাহসী সেপাইও রাতের ডিউটি নিতে সাহস পাচ্ছিল না। বাড়তি টাকা ওরা চায় না, চায় নিরাপত্তা। চোরদের সিদ্ধান্তের কথা অফিসে ইনফরমার মারফত পৌঁছেছিল বটে, কিন্তু ওরা দুজনে চোরের ভয়ে নয়; মাঝরাতে ভূতের উপদ্রব দারুণভাবে বৃদ্ধির ফলে কিছুতেই ডিউটি করতে চাইছিল না। পরপর বেশ কয়েকটা রাত ওরা দেখেছিল ভয়ঙ্কর এক দৃশ্য!

ফ্লাইওভারের মালগাড়ি লাইনের পাশে সেই পা-কাটা অশরীরী মূর্তির সঙ্গে আরও নতুন দুটো ছায়ামূর্তি এসে যোগ দিয়েছিল। রাতের নিকষ কালো অন্ধকার ফুঁড়ে মাঝে মাঝে অশরীরী তিনটে তান্ডব শুরু করত। কখনও মনে হত ওরা দল বেঁধে রেলের মাল চুরি করছে, কখনও ট্রেনের পাশে ছুটোছুটি করছে। কখনও আবার শিউশরণ রামবিলাসদের লক্ষ্য করে লাইনের পাথর ছুঁড়তেও কসুর করত না। সেন্ট্রাল রিজার্ভ ফোর্সের একজন সেপাই তিন রাউন্ড গুলি ছুঁড়েছিল একদিন, কিন্তু কোনো মৃতদেহ খুঁজে পায়নি।

ঘটনা শুনে ইন্সপেক্টর বললেন, "আরও কয়েকটা দিন নাইট ডিউটি কর, দেখি কী করতে পারি।"

ডিউটি অফ করে কোয়ার্টারে ফেরার পথে শিউশরণ রামবিলাসকে জিজ্ঞেস করল, "আগে ছিল একটা, এখন তিনটে! ব্যাপার কী বলতো?"

"ব্যাপার আর কী?" রামবিলাস রামনাম জপতে জপতে বলল, "অপঘাতে মরলে তো লোকে ভূত হয়েই ঘোরাফেরা করে!"

"ঠিকই! প্রথমটা কাটা পড়ে, পরের দুটো গুলিতে।" শিউশরণ ঘাড় নেড়ে সায় দেয়, "উফ! কী ভয়ঙ্কর! মরার পরেও মানুষ স্বভাব-চরিত্তির পাল্টাতে পারে না!"

"সত্যিই তাই। নইলে মরে গিয়েও ফের চুরি করতে আসবে কেন? মায়া কাটাতে পারেনি বলেই তো?" রামবিলাস মনে মনে ঠিক করে ফেলল, শিউশরণ যাই বলুক, এবারে ছুটিতে দেশে যাওয়ার সময় গয়ায় নেমে মৃত চোর তিনটের উদ্দেশে পিন্ডদান করে আসবে।

রাত তিনটে। গুমটি ঘরে বসে একটু ঝিমুনি এসেছিল রামবিলাসের। রাইফেলটা কোলের ওপর রেখে ঢুলছিল। চারজন রিজার্ভ ফোর্সের সেপাইকে নিয়ে শিউশরণ বেরিয়েছিল টহলে। রামবিলাস বিশ্রাম নিচ্ছিল দেখে ডাকেনি।

গুমটি ঘরে রামবিলাস একা। জনমানবশূন্য টিকিয়াপাড়া রেলইয়ার্ডে বাড়তি

ট্রেনের বগিগুলো নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে। একটা ডিজেল সান্টিং ইঞ্জিনের ভ্যাকুয়ম ব্রেকের বাতাস ছাড়ার শব্দে নিস্তব্ধতা মাঝে মাঝে ভাঙছিল। বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে রেললাইনগুলো পড়েছিল সাপের মতো এঁকেবেঁকে।

হঠাৎ রামবিলাসকে চমকে দিয়ে বিকট একটা শব্দ হল বিস্ফোরণের। ধড়ফড় করে দাঁড়িয়ে পড়ল ও। চকিতে রাইফেল হাতে বেরিয়ে এল গুমটির বাইরে। এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখল। শিউশরণ বা রিজার্ভ ফোর্সের সেপাইদের কোথাও দেখতে পেল না।

কয়েক পা এগোতেই আচমকা ভয়ে বুকটা কেঁপে উঠল ওর। দেখল, পরিত্যক্ত মার্টিন লাইনের ওপাশ থেকে ফ্লাইওভার ব্রিজ ডিঙিয়ে তিনটে আবছা ছায়ামূর্তি ছুটে আসছে ওর দিকে। তিনজনের মধ্যে একজনের হাঁটুর নিচ থেকে পায়ের বাকি অংশ নেই। পা-কাটা ছায়ামূর্তি যেন বাতাসে ভেসে আসছিল। আর ওটার দুটো হাত ধরে ছিল অন্য দুজন!

পা দুটো ভারী হয়ে এল রামবিলাসের। এমনভাবে এক নিঃসহায় অবস্থার মধ্যে আগে কোনো দিন পড়েনি। রাইফেল তুলে দ্বিধাগ্রস্তভাবে শূন্যে গুলি ছুঁড়ল এক রাউন্ড। গুড়ুম!

আশ্চর্যের ব্যাপার, গুলির শব্দের সঙ্গে ছায়ামূর্তি তিনটে যেন হাওয়ায় গেল! কিংকর্তব্যবিমূঢ় রামবিলাস দাঁড়িয়ে রইল নিশ্চল হয়ে।

ঠিক তখনি হৈ হৈ শব্দে সম্বিত ফিরে পেয়ে রামবিলাস যে দৃশ্য দেখল, তার জন্য ও প্রস্তুত ছিল না। রিজার্ভ ফোর্সের দুজন সেপাই শিউশরণের রক্তাক্ত মৃতদেহ পাঁজাকোলা করে বয়ে আনছে। পেছনে ছুটে আসছে বাকি দুজন সেপাই। বুকটা টনটন করে উঠল ওর। শিউশরণের মাথাটা বোমার আঘাতে ফেটে চৌচির!

একটু আগে যে শব্দে রামবিলাসের ঝিমুনি ভেঙেছিল, সেই শব্দের পরিণতি যে এত মর্মান্তিক, তা ভেবেই পাচ্ছিল না। স্থাণুর মতো দাঁড়িয়ে রইল বেশ কিছুক্ষণ। দীর্ঘদিনের কর্মজীবনের সঙ্গীকে এভাবে হারাল ভেবে হাউ হাউ করে কেঁদে ফেলল।

অ্যাম্বুলেন্সে তোলা হল শিউশরণের লাশ।

ইন্সপেক্টর সমাজপতি রিজার্ভ ফোর্সের সেপাইদের জবানবন্দী অনুযায়ী ওপরতলায় রিপোর্ট পাঠালেন: সমাজবিরোধীর বোমার আঘাতে কর্মরত সেপাই শিউশরণ পাশোয়ান ঘটনাস্থলেই নিহত।

শিউশরণের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু রামবিলাসের মনে খুব লেগেছিল। এ কথাটা ইন্সপেক্টর অনুভব করেছিলেন বলেই, রাতের ডিউটির বদলে রামবিলাস এখন দশটা পাঁচটা করে। ইন্সপেক্টরের খাস সেপাই।

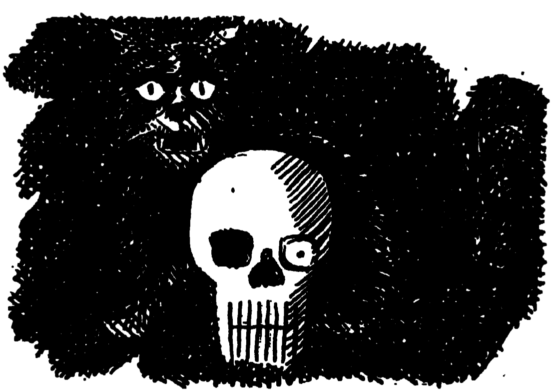
কিন্তু, বর্তমানে রাতের ডিউটিতে যারা বহাল, তাদের অভিজ্ঞতা আরও অভিনব, অবিশ্বাস্য এবং বিস্ময়কর।

শিউশরণের মৃত্যুর পর অশরীরী সেই তিন ছায়ামূর্তি কর্পূরের মতো হঠাৎই উবে গিয়েছিল। আর একটা রাতের জন্যও কেউ দেখতে পায়নি ওদের। তবে আশ্চর্যের কথা এই যে, ঠিক ওই একই জায়গায় ওরা এখন দেখতে পায় নতুন এক ছায়ামূর্তিকে, যে কিনা সকলেরই চেনা। রাইফেল কাঁধে টহলদার সেই ছায়ামূর্তি শিউশরণের। মাঝরাতে সেপাইরা দেখতে পায় শিউশরণের অশরীরী আত্মাকে ঘাড় গুঁজে লাইনের ধারে ধহল দিতে। তবে কারোর ক্ষতি সে করে না। বরং, রাতের ডিউটি এখন অনেক নিশ্চিন্ত এবং নিরুদ্বিগ্ন।

...শিউশরণের ভূত? প্রথম দিন ঘটনাটা শুনেই চমকে উঠেছিল রামবিলাস। ওর মনে পড়েছিল শিউশরণের কথা: মরার পরেও মানুষ স্বভাব-চরিত্তির পাল্টাতে পারে না।

ইন্সপেক্টর সমাজপতিও ওকে সান্ত্বনা দিয়েছিলেন, "মৃত্যুর পরেও শিউশরণ বোধহয় কর্তব্যনিষ্ঠার কথা ভোলেনি, যেমন ভোলেনি চোর তিনটে। চোরগুলোর মনে মৃত্যুর পরেও শিউশরণ-ভীতি রয়ে গিয়েছে বলেই ভয়ে এখান থেকে বেপাত্তা হয়ে গিয়েছে।"

ইন্সপেক্টরের কথা শুনে বোকার মত ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়েছিল রামবিলাস। বিড়বিড় করেছিল নিজের মনে, ছুটিতে দেশে যাওয়ার পথে গয়ায় ওকে নামতেই হবে। অন্তত শিউশরণের আত্মার শান্তির জন্য। ❑



হিলি ডাকবাংলোয়/ হিমাংশু সরকার



লোকটির সঙ্গে আমার প্রথম দেখা মালদা বাসস্ট্যান্ডে। তখন রাত প্রায় সাড়ে তিনটে-চারটে। বাসটা বহরমপুর ছেড়ে মালদা পৌঁছতে লোকটি ঘাড়ের কাছে মুখ এনে জিজ্ঞেস করল, বাবু বুঝি কলকাতা থেকে আসছেন?

কলকাতা থেকে বহরমপুর পর্যন্ত জেগেই ছিলাম। তারপর কখন যে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম টের পাইনি। লোকটির কথায় ঘুমের রেশ কেটে যেতে পাশ ফিরে দেখি আমার পাশের সিটেই জুতসই হয়ে বসে আছে লোকটি। বয়স প্রায় পঞ্চাশ হবে। সারা মাথায় উস্কোখুস্কো চুল। আধময়লা ছেঁড়া পোশাক। মুখে কাঁচাপাকা দাড়ি। বড় বড় দুটো দাঁত মাড়ি ঠেলে বেরিয়ে আছে সামনের দিকে। মুখে হাসি।

লোকটিকে দেখে অবাক হলাম। কলকাতা থেকে রাত ন'টায় যখন হিলি এক্সপ্রেস ছাড়ে তখন আমার পাশের সিটে বসেছিলেন এক মহিলা। পথে কখন নেমে গেছেন টের পাইনি। এদিক-ওদিক ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম কলকাতা থেকে যারা আমার সঙ্গে বাসে উঠেছিল তাদের অনেকেই নেমে গেছে। বহরমপুরেও বাস ভর্তি ছিল। এখন একদম ফাঁকা। মালদাতেই বোধহয় নেমে গেছে অধিকাংশ লোক। আসলে বহরমপুর ছাড়ার পরই ঘুমিয়ে পড়ায় বাসটা কখন যে মালদায় এসে থেমেছে, কতক্ষণই বা থেমে আছে কিছুই টের পাইনি।

ভোর হতে তখনও বাকি। বাসস্ট্যান্ড দেখলে যদিও মনে হয় না এখন

শেষ রাত। দিব্যি গমগম করছে সমস্ত চত্বর। চা-মিষ্টির দোকান সব খোলা। বেঞ্চিতে বসে তখনও আড্ডা মারছে কিছু ছেলে। বেচা-কেনা চলেছে এই শেষ রাতেও। বাস কিছুক্ষণ থেমে আবার চলতে শুরু করতেই লোকটি আবার প্রশ্ন করল, হিলি যাচ্ছেন বুঝি?

আবার চমকে উঠলাম লোকটির কথায়। গণৎকার নাকি! নাকি হিলি এক্সপ্রেস বলেই যারা এখনও বসে আছে বাসে তাদের সবাইকেই হিলির যাত্রী ধরে নিয়েই কথা বলছে লোকটি। ওর অযাচিত এ ধরনের আলাপ ভাল না লাগলেও ভদ্রতার খাতিরে এবার বলতেই হল, হ্যাঁ, হিলি যাচ্ছি।

তাই বলুন। দেখেই বুঝেছি বাবু হিলি যাবেন বলেই বাড়ি থেকে বেরিয়েছেন। তা উঠবেন কোথায়? ওখানে তো হোটেল-টোটেল ভাল নেই। ডাকবাংলোতেই উঠবেন বোধহয়?

হ্যাঁ।

সঙ্গে সঙ্গে লোকটি দুহাত জোড় করে মাথা নিচু করে বলল, পেন্নাম হই স্যার। এদিক-ওদিক ঘুরতে ঘুরতে হঠাৎ আপনার দিকে চোখ পড়তেই বুঝতে পেরেছি আপনি ডাকবাংলোতেই উঠবেন। তা ভালই হল। চলুন। আমি তো সঙ্গেই রয়েছি কোনো অসুবিধা হবে না।

লোকটির কথাবার্তার ধরন দেখে ক্রমশই বিস্ময় বাড়ছিল আমার। ও নিশ্চয় হিলিতেই থাকে। শুনেছি ওখানে স্মাগলারদের আনাগোনা বেশি। ওদের দলের কেউ কিনা কে জানে! ব্যাপারটা বোঝার জন্য জিজ্ঞেস করলাম, আপনি হিলিতেই থাকেন?

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে হাঁ-হাঁ করে উঠল। আমায় আপনি বলবেন না স্যার। তুমি বলবেন। আমি হিলি ডাকবাংলোর কেয়ারটেকার বুধন মণ্ডল। আপনার রান্নাবান্না খাওয়াদাওয়ার সব ব্যবস্থা আমিই করব স্যার।

এতক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হল আমার কাছে। ঘাম দিয়ে যেন জ্বর ছাড়ল। ভালই হল বুধনকে কাছে পেয়ে। অজানা অচেনা জায়গায় আর ডাকবাংলো খুঁজতে হাতড়ে বেড়াতে হবে না।

বুধনকে জিজ্ঞেস করলাম, তা এদিকে কোথায় এসেছিলে তুমি?

বুধন বিনয়ে গলে গিয়ে বলল, আজ্ঞে স্যার একটু বাড়িতে গিয়েছিলাম। মালদায় আমার বাড়ি কিনা। ভাবলুম পুজোর মুখে একবার সবার সঙ্গে দেখা করে আসি। অনেক দিন বাড়ি যাওয়া হয়নি। তাছাড়া ওখানে বসে বসে আর ভালও লাগছিল না।

বসে বসে কেন? এর মধ্যে ডাকবাংলোয় কেউ আসেনি বুঝি?

কি যে বলেন স্যার! এর মধ্যে কি আবার, গত দুবছরের মধ্যে কেউ আসেনি। এখানে কি দেখার আছে যে লোকজন আসবে? এখানে কোনো

ভদ্রলোক থাকতে চায়, না আসতে চায়? তাছাড়া সব সময়ই তো গণ্ডগোলের আশঙ্কা। নেহাত নিরুপায় না হলে কোনো ভদ্রলোক থাকতে চায় না এসব এলাকায়।

সেকি! হিলি তো একটা সাব-টাউন বলেই শুনেছি।

এবার খ্যাঁকখ্যাঁক করে শেয়ালের মতো হাসল বুধন। সে ছিল বটে এক সময়। বৃটিশ আমলে। এই ডাকবাংলো তো তখনই তৈরি হয়েছিল স্যার। সাহেবরা আসত। ইয়ার-দোস্ত নিয়ে এখানে এসে উঠত। হৈ হৈ করে দিন কাটাত। সে সব এখন আর নেই। দেশ ভাগ হওয়ার পর শহরের অনেকটাই চলে গেছে বাংলাদেশের ভাগে। আমাদের ইদিকে রয়েছে কটা টিনের চালাঘর, কিছু খেত-খামার আর সাহেবদের এই বাংলোটা। এখন ইদিকে সাধ করে কে আর বেড়াতে আসবে বলুন।

হিলিতে এসে যখন বাস থামল তখন সকাল প্রায় সাড়ে আটটা। বাস থেকে নেমে বুধনের কথাই সত্যি মনে হল। নামেই টাউন। আসলে বাস রাস্তার ধারে হঠাৎ গজিয়ে ওঠা চটির মতো জায়গাটা। ছড়ানো ছিটানো কিছু টিনের চালাঘর দোকান-পাট। ছোট্ট একটা বাজার। এই হল হিলি। কেমন ছন্নছাড়া নিঝুম এলাকা। মালপত্র নামিয়ে একটা রিকশা ডেকে নিয়ে এল বুধন, তারপর আমায় নিয়ে গেল ডাকবাংলোয়।

ডাকবাংলোয় ঢুকেই বুঝতে পারলাম বুধন এতক্ষণ বকবক করে যা বলেছে তার একবর্ণও মিথ্যে নয়। বহুদিন এখানে কোনো লোকজনের পা পড়েছে বলে মনে হল না আমার। বাংলোর সামনের জমি যেটা আগে ছিল সাহেবদের লন, তা এখন আগাছার জঙ্গলে ভরা। বারান্দার মেঝে ফেটে-ফুটে চৌচির। ঘরগুলো ভাল আছে বটে কিন্তু ঝাড়পোঁচ হয়নি বহুদিন। ঘরের সর্বত্র ধুলোর আস্তরণ, সেই সঙ্গে একটা বোটকা গন্ধ।

বুধন আমার মালপত্র নামিয়ে দিয়েই ঝেড়েমুছে যতটা সম্ভব ভদ্রস্থ করার চেষ্টা করল শোবার ঘরটা। তবু একটা অস্বস্তি বিঁধেই রইল মনের ভিতর।

ইতিমধ্যে কয়েকটি সীমান্ত ঘুরে এসেছি আমি। আজকাল হঠাৎ অনুপ্রবেশ নিয়ে হৈচৈ শুরু হওয়ায় এ ব্যাপারে সীমান্ত অঞ্চলগুলি ঘুরে একটি তথ্যভিত্তিক প্রতিবেদন লেখার দায়িত্ব পড়েছে আমার ওপর। এর আগেও সাংবাদিকতার পেশায় যেতে হয়েছে এখানে ওখানে। এবারও পুজোর মুখেই বেরোতে হয়েছে বাড়ি ছেড়ে। কিন্তু কোথাও এমন নিঃসঙ্গ সীমান্ত দেখিনি। সব কেমন চুপচাপ। লোকজনের হৈচৈ একেবারেই নেই। সাত-সকালেই দোকানের ঝাঁপ খোলা বটে কিন্তু কেনাকাটা নেই। নেহাত দোকান খুলতে হয় বলেই যেন খোলা। ডাকবাংলোটাও এমন ফাঁকা আর নির্বান্ধব এলাকায় যে গা ছমছম করে দিনের বেলাতেও।

দুপুরে খেতে বসে বুধনকে এ কথা বলায় খ্যাঁকখ্যাঁক করে আবার হাসল

ও। লোকটা সব সময়ই হাসছে। কখনও মিটিমিটি কখনও খ্যাঁকখ্যাঁক করে। বলল, আপনাকে আগেই বলেছি না স্যার, এখানে কেউ আর আসে না আজকাল। বলেই প্রশ্ন করল, বাবু বুঝি গোয়েন্দার কাজ করেন?

সর্বনাশ! বলে কি লোকটা! বললাম, না না। আমাকে দেখে কি তোমার গোয়েন্দা বলে মনে হচ্ছে? আমি এমনি বেড়াতে এসেছি।

ও। বলে একটু সুর টেনে চলে গেল রান্নাঘরের দিকে।

খাওয়া-দাওয়া হতে আবার এল। আমি তখন বারান্দার চেয়ারে বসে সবে একটা সিগ্রেট ধরিয়েছি। বুধন এসে বলল, আমি একটু বেরোচ্ছি স্যার। চিন্তা করবেন না। রাতে ঠিক সময়মতো ফিরে এসে রান্নাবান্না করে দিয়ে যাব। বলে দু'পা এগিয়ে আবার ফিরে এসে বলল, আপনি নতুন এসেছেন, তাই একটা কথা বলছি স্যার। কিছু মনে করবেন না। সীমান্ত এলাকা তো, চোরাকারবার-টারবার খুব হয়। সবাই সবাইকে তাই সন্দেহ করে। হুট করে কাউকে কোথায় উঠেছেন, কেন এসেছেন এসব কথা বলতে যাবেন না যেন।

বুধন চলে যেতে একটা গল্পের বই হাতে নিয়ে টানটান শুয়ে পড়লাম বিছানায়। সারারাত বাস জার্নির ফলে শরীর ক্লান্ত ছিল। কিছুক্ষণ বইয়ে চোখ বুলোতে না বুলোতেই রাজ্যের ঘুমে জড়িয়ে এল চোখের পাতা। ঘুম যখন ভাঙল তখন অন্ধকার। বুধন এসে মোমবাতি জ্বালিয়ে ডেকে তুলল। বলল, উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে নিন। আমি চা নিয়ে আসছি।

সারাটা দিন যে ঘুমিয়েই কাটিয়ে দেব ভাবতে পারিনি। তাড়াতাড়ি উঠে চোখে-মুখে জল দিয়ে এসে দেখি বুধন চা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। করিৎকর্মা বটে লোকটা! চা খেতে খেতে বুধনকে জিজ্ঞেস করলাম, মোমবাতি কেন? ইলেকট্রিসিটি নেই?

ছিল। এখন আর জ্বলে না। খারাপ হয়ে গেছে।

সেকি! তা মিস্তিরি ডেকে ঠিক করে নিলেই তো হয়।

কে করবে স্যার। এখানে তো কেউ থাকে না। অনেকদিন পর আপনি এলেন এই যা।

কেউ না আসুক তুমি তো রয়েছ। তুমিও তো ঠিক করিয়ে নিতে পার।

আমিও সব সময় এখানে থাকি না স্যার। দেশে মালদায় চলে যাই। কখনো-সখনো এদিকে আসি। এই যেমন কাল আসছিলাম। আপনার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল তাই রয়ে গেলাম এখানে। তা নইলে অন্য কোথাও ঘুরতে চলে যেতাম।

অন্য কোথাও মানে?

এই ধরুন বাংলাদেশে। কাজকর্ম তো এখন আর বিশেষ করতে হয় না তাই ঘুরে বেড়াই।

ডাকবাংলোর উল্টোদিকেই বাংলাদেশ। বারান্দায় বসে ওখানকার দোকানপাট দেখা যাচ্ছে। আলো জ্বলছে। লোকজন যাতায়াত করছে। তবে ওরা সবাই বাংলাদেশী। এদিকের লোক তো ওদিকে যেতে পারে না। বুধনের কথা শুনে তাই হকচকিয়ে গেলাম। বললাম, তুমি যখন খুশি বাংলাদেশে চলে যাও, ওরা কিছু বলে না?

না স্যার। আমায় কেউ কিছু বলে না।

সেকি! তাহলে তো ওদিক থেকেও লোকজন চলে আসতে পারে?

আসেই তো। দুবেলাই লোকজন আসে। কাস্টমস চেকপোস্ট কতক্ষণ লোকজন আটকে রাখবে। চেকপোস্ট ছাড়াও কত রাস্তা রয়েছে বেআইনী যাতায়াতের। সব জায়গায় কি পাহারা দেওয়া সম্ভব? আর আমার মতো যারা তাদের কথা তো আলাদা। বলে আবার খ্যাঁকখ্যাঁক করে হাসল ও।

ওর চেহারা চালচলন কথাবার্তা সবটাই কেমন হেঁয়ালিভরা। ও নিজেই চোরাকারবারী কিনা কে জানে! তবে লোকটি যে এক নম্বরের ফাঁকিবাজ, সরকারি কাজে ফাঁকি দিয়ে এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়ায় তা বুঝতে অসুবিধে হল না আমার।

সেদিন আর বাইরে বেরনো হল না। পরদিন ঘুম থেকে উঠেই দেখি বুধন চায়ের কাপ হাতে দাঁড়িয়ে আছে। কাল যে কখন চলে গিয়েছিল, আজ কখন আবার এসে উনুন ধরিয়েছে ও-ই জানে। এ সম্পর্কে ফাঁকিবাজ বুধনকে আর কিছু জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে হল না আমার। দুপুরের রান্না করতে বলে সকাল সকালই বেরিয়ে পড়লাম বাইরে। চেকপোস্টে গিয়ে বি এস এফ-এর সঙ্গে একটু কথা বলে অনুপ্রবেশের ব্যাপারটা আগে বুঝে নেওয়া দরকার। সকাল ছটা থেকেই খুলে যায় চেকপোস্ট। খোঁজ নিয়ে উঠে গেলাম দোতলায় ডিউটি অফিসারের সঙ্গে দেখা করব বলে।

অফিসারের মুখের দিকে তাকিয়ে চমকে উঠলাম। আরো টোটন না?

চমকে উঠল টোটনও। কি ব্যাপার হিমু, তুই? ছুটে এসে জড়িয়ে ধরল আমায়।

টোটন আমার ছোটবেলার বন্ধু। বড় হয়ে আমি চলে এলাম কাগজের লাইনে আর ও গেল সীমান্ত রক্ষীবাহিনীতে। মাঝে বহুদিন যোগাযোগ না থাকায় ও যে এত দূরে এখানে বদলি হয়ে এসেছে জানা ছিল না।

টোটন আমাকে পেয়েই ওর এক বন্ধুকে ডিউটিতে বসিয়ে আমার হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল ওর কোয়ার্টারে। তারপর ওদেরই এক সেপাইকে চা আনতে বলে একসঙ্গে ছুঁড়ে দিল এক গাদা প্রশ্ন। কখন এসেছি, কেন এসেছি, কোথায় উঠেছি ইত্যাদি ইত্যাদি।

আমি কবে এসেছি, কেন এসেছি সব জানিয়ে ওকে আশ্বস্ত করে বললাম,

ওঠার ব্যাপারটা নিয়ে তোর ব্যস্ত হওয়ার কারণ নেই। খুব ভাল জায়গাতে উঠেছি। তোদের ওই ডাকবাংলোয়।

ডাকবাংলোয়?

ফ্যালফ্যাল করে আমার মুখের দিকে কয়েক সেকেন্ড তাকিয়ে রইল টোটন বলল, ডাকবাংলো কিরে? সে সব তো কবেই ভেঙেচুরে গেছে। দু একটা ঘর কোনো মতে টিকে আছে মাত্র। ওখানে কেউ ওঠে নাকি। তা ওখানে খাওয়া-দাওয়া ব্যবস্থা কি করেছিস?

বললাম বুধনের কথা। কেয়ারটেকার বুধন মণ্ডলই রান্নাবান্না করছে। মালদা থেকে বুধনই তো সঙ্গে করে নিয়ে এসেছে আমায়।

বুধন? চমকে যেন চিৎকার করে উঠল টোটন। কি আবোল-তাবোল বকছিস। কেমন চেহারা বল তো লোকটার?

আমি ওর চেহারার বর্ণনা দিলাম। সেই সঙ্গে মালদায় দেখা হওয়ার পর থেকে যা যা ঘটেছে সবই বললাম টোটনকে। সব শুনে গুম মেরে বসে রইল ও কিছুক্ষণ। তারপর খুব আস্তে বলল, বুধন বছর দুই আগে মারা গেছে। ওই মালদাতেই। ওখানে কোথাও ওদের বাড়ি। ছুটিতে বাড়ি গিয়েছিল আর ফিরে আসেনি। মালদা বাসস্ট্যান্ডেই একটা অ্যাক্সিডেন্টে ও মারা যায়।

এবার আমার হতভম্ব হওয়ার পালা। টোটনের নিশ্চয়ই কোথাও ভুল হচ্ছে। বললাম, তা কি করে হয়। ওকে তো রান্না করতে বলে এলাম এখন গেলেই দেখতে পাবি ও হয়তো রান্নাবান্না করছে।

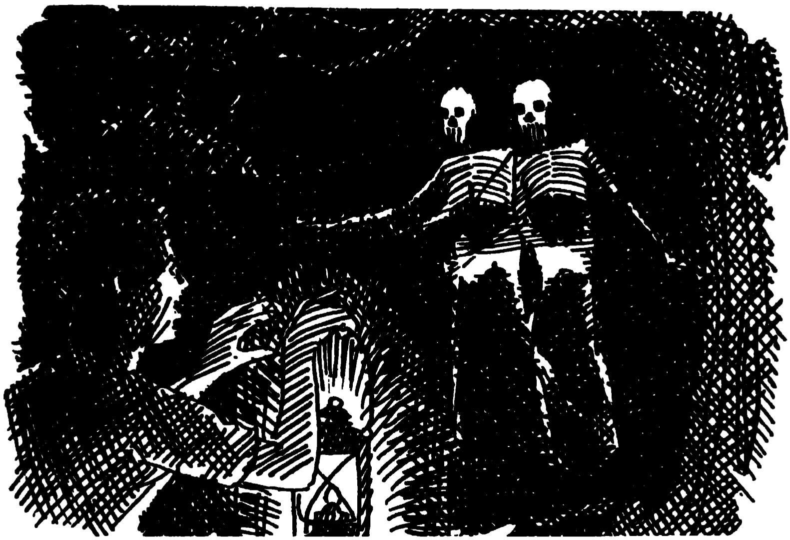
আমার কথা শুনে কেমন উত্তেজিত মনে হল টোটনকে। একটু চঞ্চলও বলল, চল তো দেখে আসি ব্যাপারটা কি।

ডাকবাংলোয় ঢুকে কারও কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। রান্নাঘরে বাইরে থেকে তালা ঝুলছে। মাকড়সার জাল ছড়িয়ে আছে দরজা জানলায় সর্বত্র।

টোটন বললে, কি বলেছিলাম! কিছু বুঝতে পারছিস?

এবার সত্যি সত্যি ভয় করতে লাগল। টোটন আর অপেক্ষা না করে রিকশা ডেকে নিয়ে এল একটা। তক্ষুনি আমায় মালপত্রসহ টেনে নিয়ে গিয়ে তুলল ওর কোয়ার্টারে। আমি কিন্তু বিশ্বাস করতে পারছিলাম না বুধন মণ্ডল বলে কেউ নেই। কাল থেকে আজ সকাল পর্যন্ত যে আমার সঙ্গে তাহলে মানুষ নয়! ❑

অলৌকিক / সমীর চৌধুরী



ঘটনাটা আমার এক দূর সম্পর্কের জ্যাঠামশায়ের কাছে শোনা। সে আজ অনেককাল আগের কথা। জ্যাঠামশাই ছিলেন পুলিশের দারোগা। যে সময়ের কথা বলছি, সে সময় তিনি কলকাতার বাইরে একটা অজ-পাড়াগাঁর কাছে পোস্টিং-এ ছিলেন। এমনিতে আমার সেই জ্যাঠামশাই— মানে শিবনাথ মুখুজ্জে, বেশ ডাকাবুকো ধরনের লোক ছিলেন। চাকরির খাতিরে তাঁকে অনেক চোর, গুণ্ডা, খুনে, বদমায়েশের সঙ্গে মিশতে হয়েছে। ভূত-টুতের ভয় তাঁর একেবারেই ছিল না। কত সময় কত হানাবাড়িতে, জঙ্গলে বাধ্য হয়ে রাত কাটাতে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু কখনও, কোনদিন ভয় পেয়েছেন বলে শুনিনি। সেই তাঁর মত লোকও জীবনে একবার এমন একটা ঘটনার সামনে পড়েছিলেন— যার কোন ব্যাখ্যা তিনি খুঁজে পাননি।

আগেই বলেছি, যখনকার ঘটনা তখন তিনি কলকাতা ছেড়ে অনেকদূরে এক পল্লীগ্রামের কাছে বদলি হয়ে চলে গিয়েছিলেন। জায়গাটার নাম আজ আর আমার স্পষ্ট করে মনে নেই। গল্পের খাতিরেই জায়গাটার একটা কল্পিত নাম দেওয়া যাক— সোনাঝুরি।

সোনাঝুরি, শহরের ছোঁয়া বাঁচানো ছোট সবুজ একটা গ্রাম। আশেপাশে কোন কলকারখানা তো দূরের কথা, দু'-একটা ছাড়া পাকা বাড়িও নেই। রেল স্টেশন আছে, তবে বেশ কিছুটা দূরে। রেলের লাইন পার হয়ে উত্তর দিকে

মাইল খানেক গেলেই খনি অঞ্চল। সেই অঞ্চলকে ঘিরে পাকা রাস্তা, ইটের বাড়ি— বলা চলে ছোটখাট একটা শহরই গড়ে উঠেছে। কিন্তু সোনাঝুরির সঙ্গে এসবের যেন কোন সম্পর্কই নেই। সে তার শান্ত নিরুদ্বিগ্ন জীবন নিয়েই দিন কাটাচ্ছে।

সোনাঝুরি থানার লাগোয়া পুলিশ কোয়ার্টার। জ্যাঠামশাই সস্ত্রীক সেই কোয়ার্টারেই থাকেন। সকাল বেলায় ঘুম থেকে উঠে চান-খাওয়া শেষ করে সময় মতই নিজের কাজের জায়গায় পৌঁছে যেতেন তিনি। কাজের ব্যাপারে তাঁর সময়জ্ঞান এত টনটনে ছিল যে, একদিনও লেট করতেন না।

সেদিনও ঠিক সময়মত থানায় নিজের অফিস ঘরে পৌঁছে গেছেন জ্যাঠামশাই। কাল মাইল দুয়েক দূরের একটা গ্রামে সামান্য ছোটখাট একটা গণ্ডগোল হয়ে গেছে। সেই ব্যাপারেই তিনি সেকেণ্ড অফিসারের সঙ্গে কিছু কথা বলবেন বলে ভাবছিলেন— এমন সময় তাঁর হাতের সামনে ফোনটা বেজে উঠল শব্দ করে। খুব শান্তভাবে হাত বাড়িয়ে রিসিভারটা তুলে নিলেন জ্যাঠামশাই।

—'হ্যালো—'

জ্যাঠামশাই আর কিছু বলার আগেই ওপাশ থেকে একটা উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল— 'হ্যালো, সোনাঝুরি পুলিশ স্টেশন?'

—'ইয়েস।'

জ্যাঠামশাই গম্ভীরস্বরে জবাব দিলেন। কিন্তু ও প্রান্তে যে ফোন ধরে আছে তার যেন কি হয়েছে। জ্যাঠামশাই দূর থেকেও বেশ বুঝতে পারলেন লোকটা যেন উত্তেজনায় কাঁপছে থরথর করে। তাই জ্যাঠামশাই কিছু বলার আগেই লোকটার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর ভেসে এল আবার— 'স্যার, মারাত্মক বিপদ হয়ে গেছে স্যার। এইমাত্র আমার চোখের সামনে ভয়ঙ্কর একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। লরির ড্রাইভারের এখনও বোধহয় প্রাণটা টিকে আছে, এখুনি যদি চলে আসেন, হয়ত—

জ্যাঠামশাই এতক্ষণ শুনছিলেন চুপ করে। কিন্তু এবার আর থাকতে পারলেন না। প্রচণ্ড বিরক্তিতে একটা হুঙ্কার ছেড়ে বললেন— 'আপনি কে? কোত্থেকে ফোন করছেন? আর দুর্ঘটনাই বা কিসের?

জ্যাঠামশাইয়ের হুঙ্কারে লোকটা যেন থতমত খেয়ে গেল একটু। বলল— 'আমি স্যার— মানে আমি স্যার একজন পথচারী। এইমাত্র সোনাঝুরি লেভেল ক্রশিং-এর কাছে একটা লরী যখন রক্ষীবিহীন রেল লাইন পার হচ্ছিল, ডাউন বোম্বে মেলের সঙ্গে— স্যার, একটু যদি তাড়াতাড়ি করেন, লোকটা বোধহয়—'

জ্যাঠামশাইয়ের আর ধৈর্য ছিল না শোনার। ঝট করে হাতের ঘড়িটা একবার দেখে নিলেন। ঘড়িতে দশটা বেজে পঁয়ত্রিশ। হ্যাঁ, ঠিক সাড়ে দশটাতেই বোম্বে মেল সোনাঝুরি লেভেল ক্রশিং-এর ওপর দিয়ে যাবার কথা। বেশি

দেরি হয়নি— হয়ত সত্যিই আহত ড্রাইভারটা বেঁচে যেতে পারে। সুতরাং আর দেরি না করাই ভাল। জ্যাঠামশাই অচেনা লোকটার উদ্দেশ্যে বললেন— 'আপনি দাঁড়ান, আমি এখুনি আসছি।'

দেখতে দেখতে সাজ-সাজ রব পড়ে গেল থানার মধ্যে। ততক্ষণে ব্যাপারটা সবাই জেনে ফেলেছে। চাকরি ক্ষেত্রে জ্যাঠামশায়ের বরাবর সুনাম ছিল, কোন ব্যাপারকেই তিনি অবহেলা করতেন না কখনও। তা সে যত ছোট ব্যাপারই হোক না কেন, সুতরাং নিজেই তিনি তৈরি হয়ে নিলেন। সঙ্গে নিলেন সেকেণ্ড অফিসার প্রণববাবু ও চারজন কনেস্টবল, বলা যায় না যদি বেশি লোক আহত হয়ে থাকে!

থানা থেকে জিপগাড়িতে লেভেল ক্রশিং-এর দূরত্ব মিনিট দশেকের। দেখতে দেখতে পৌঁছে গেলেন ওরা। কিন্তু এ কি! নিজের চোখকেও যেন বিশ্বাস করতে পারছেন না জ্যাঠামশাই। দুর্ঘটনা তো দূরে থাক— নির্জন লেভেল ক্রশিং-এর ধারে-কাছে একটা কাক-পক্ষীরও সাড়া নেই। দেখে-শুনে ওরা প্রত্যেকেই একেবারে হতভম্ব হয়ে গেলেন। সবচেয়ে অবাক হলেন জ্যাঠামশাই নিজে। এতদিন চাকরি করছেন— কিন্তু এমনভাবে কেউ কখনও তাকে ধাপ্পা মারেনি। নিজের ওপরেই রাগ হচ্ছিল তার। লোকটার নাম-ধাম, কোথা থেকে ফোন করছে কিছুই জিজ্ঞেস করেননি তিনি। লেভেল ক্রশিং-এর আশেপাশে কোথাও টেলিফোন নেই, এ তো জানা কথাই। শুধু রাগ নয়, কেমন যেন লজ্জাও হচ্ছিল তাঁর। সেকেণ্ড অফিসার প্রণববাবু আর কনেস্টবলরা না জানি কি না কি ভাবছেন তার সম্বন্ধে। কি বলবেন ওদের কিছু ভেবে না পেয়ে চুপ করেই ছিলেন জ্যাঠামশাই। তাঁকে গম্ভীর হয়ে চুপ করে থাকতে দেখে প্রণববাবু বললেন 'স্যার, ব্যাপারটা খুব গোলমেলে মনে হচ্ছে আমার।'

'ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু আমার মনে হয় এসেই যখন পড়েছি, তখন জায়গাটা একবার ভালভাবে দেখে যাই।'

'তাই চল।'

কথা শেষ করে সবাই মিলে জিপ থেকে নামলেন ওরা। তারপর যে যার মতো ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগলেন জায়গাটা। এমন কিছুই নজরে পড়ল না করুর— যা সন্দেহজনক মনে হতে পারে।

দেখতে দেখতে আরো পনেরো মিনিট সময় পার হয়ে গেল। আর দেরি করা ঠিক হবে না ভেবে জ্যাঠামশাই সবাইকে গাড়িতে উঠে পড়তে বললেন। হাত ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখলেন এগারোটা বাজে। গাড়ি স্টার্ট করতে যাবে ড্রাইভার, এমন সময় হাতের ইশারায় তাকে থামতে বললেন জ্যাঠামশাই। তার দৃষ্টি অনুসরণ করে সবাই মিলে লেভেল ক্রসিং পার হয়ে ধুলো ওড়া রাস্তাটার দিকে তাকাল। দূরে প্রচণ্ড গতিতে একটা লরিকে ছুটে

আসতে দেখা গেল এদিকে। আর ঠিক তখনই— হ্যাঁ, নিজের কানকে অবিশ্বাস করার কোন কারণ নেই, হুইশিল বাজছে ট্রেনের। একটু আগেই রেলের লাইনটা বাঁক নিয়েছে বলে দেখা যাচ্ছে না ট্রেনটাকে— কিন্তু দুরন্ত গতিতে যে একটা ট্রেন ছুটে আসছে সেটা বেশ বোঝা যাচ্ছে। ওরা সকলেই হঠাৎ এমন হতভম্ব হয়ে গেছলেন যে, কারুরই কিছু করার ছিল না। একটু পরেই ট্রেনটাকে দেখা গেল। হ্যাঁ, বোম্বে মেল লেট করেছে আজ। আর ওপাশে ঐ লরিটা...

এরপর যা ঘটবার তাই ঘটেছিল। কেউ কিছু বোঝার আগেই উন্মুক্ত লেভেল ক্রসিং পেয়ে লরিটা চলে এসেছিল, আর সেই মুহূর্তে ট্রেনটাও...

তবু ভাগ্য ভাল বলতে হবে ট্রেনের তেমন কোনো ক্ষতিই হয়নি। লরির একটা কোনায় ধাক্কা লাগার ফলে লরিটা ছিটকে গিয়ে উল্টে পড়ে। ড্রাইভারের সামনে অন্য কোন লোকও ছিল না আর।

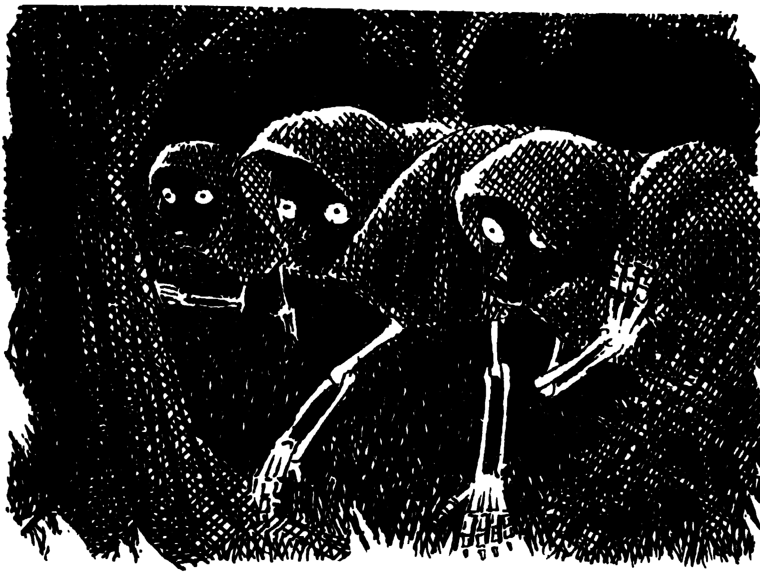
জ্যাঠামশাইরা ততক্ষণে নিজেদের কর্তব্য করতে শুরু করে দিয়েছেন। সবাই মিলে ধরাধরি করে আহত ড্রাইভারকে তুলে নিয়ে কয়েক মাইল দূরের হাসপাতালের দিকে রওনা হয়ে গেলেন। আঘাত খুব গুরুতর হলেও ড্রাইভার প্রাণে বেঁচে যায়।

এরপর পুলিশের তরফ থেকে বহু চেষ্টা করে হয়েছিল সেই অজানা লোকটিকে খুঁজে বের করার— যে জ্যাঠামশাইকে ফোন করেছিল। এমনকি লরির ড্রাইভারকে অনেক জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। কিন্তু আজও এর কোন কিনারা হয়নি।

লোকটা চির অপরিচিতই রয়ে গেছে। ❑



মন্দ ভূত ভাল ভূত/ তৃণাঞ্জন গঙ্গোপাধ্যায়



আজ দুপুরে সেকেন্ড হাফে তিতানের ভূগোল পরীক্ষা। কিন্তু কাল রাত থেকে তার ধুম জ্বর। বাবা একটু আগেই ডাক্তারখানায় গেছে। অ্যানুয়াল পরীক্ষার শেষ দিনে এরকম শরীর খারাপ তিতানের মা কিছুতেই মেনে নিতে পারছে না। মা দুধের গ্লাসে চামচ নাড়তে নাড়তে ঘরে ঢুকল। তিতানের কপালে হাত ছোঁয়াতেই ছ্যাঁক করে উঠল তার হাত। 'ঠিক হয়েছে, যেমন দুষ্টু ছেলে, কেন আর একটা দিন তর সইল না। খেলাটা পরীক্ষার থেকেও বড় হল।' মার বকুনিতে তিতানের একরকম কান্না পায়। একেই যন্ত্রণায় মাথা ছিঁড়ে যাচ্ছে তার ওপর পরীক্ষা না দেবার কষ্ট। নতুন বছরে সবাই নতুন ক্লাশে গিয়ে বসবে, আর সে? না তিতান ভাবতে পারে না। এটা হাফইয়ার্লি পরীক্ষা নয় যে মেডিক্যাল সার্টিফিকেট দিয়ে পার পেয়ে যাবে। নতুন প্রিন্সিপ্যাল এ ব্যাপারে খুব কড়া। ইতিহাস পরীক্ষার পর পুরো ছ'দিনের ছুটি ছিল। তাছাড়া ভূগোল তিতানের ভালমতো তৈরি। তাই কাল দুপুরে বারান্দার খোলা জানালা দিয়ে যখন বুবাই তাকে ক্রিকেট খেলার জন্য ডেকেছিল সে না গিয়ে পারেনি। মা ঘুমচ্ছে। মেঝেতে ঘুমচ্ছে কামিনী পিসি। পিসি ঘুমচ্ছে দেখে তিতান খুশি হয়। না, মা তাকে এক্ষুনি ডাকতে পাঠাবে না। কেদার সরকারের আদ্যিকালের পোড়োবাড়ির পিছনে উঁচু জমিটায় ওদের ক্রিকেট পিচ। বুবাই ব্যাট করছিল। তিতান বল। বলটা একটু ফুলটস হয়ে যায়। বুবাই ঠিক কপিলদেবের মতো

উঁচু করে মারল। আর পড়বি তো পড় একেবারে পাঁচিল টপকে পোড়োবাড়ির ছাদে। বুবাইকে সে অনেকবার বলেছিল তার সঙ্গে যাওয়ার জন্য। কিন্তু সে রাজি হল না। মার মুখে সে শুনেছে ঐ বাড়িতে বুড়ো কেদার সরকারের ভূত ঘুরে বেড়ায় ভর দুপুরে। লোকটা খুব বদমাইশ ছিল। বেঁচে থাকতে কাউকে ঢুকতে দিত না বাগানের ভিতর। এখনো নাকি ধারে-কাছে বাচ্চা ছেলে পেলে ঘাড় মটকে দেয়। কিন্তু তিতান না গিয়ে পারেনি কারণ বলটা সে সবেমাত্র দুদিন হল কিনেছে।

'ও এমনি জ্বর নয় গো বৌদিমণি, এ নিশ্চয় তেনাদের ভর হয়েছে। ভর দুপুরে ঐ কু জায়গায় কেউ যায়!' তিতান শুনতে পেল কামিনী পিসি ফিসফিস করে মাকে বলছে। মার গলা কিরকম কাঁদো কাঁদো শোনাল। 'তাহলে কি হবে কামিনী, এরা নাকি খুব...।' মার কথা শেষ হয় না, তার আগেই কামিনী পিসি বলল, 'খুব অনিষ্ট করে গো, তেনারা যে খুব মন্দ হন।' তিতানের পিসির ওপর রাগ হল। কেন শুধু শুধু মাকে ভয় দেখাচ্ছে। কিন্তু নিজেরও যে একটু ভয় করল না তা নয়। কাল দুপুরের কথা মনে পড়তেই বুকের ভিতরটা টিপটিপ করে উঠল। চোখের ভিতর দিয়ে কপালের মধ্যে একটা গরম হাওয়া খেলে গেল। আর তক্ষুনি মনে হল সে যেন বিছানা থেকে পড়ে যাবে।

কাল দুপুরে একথা অদ্ভুত হাওয়া খেলছিল পোড়োবাড়ির ছাদে। নড়বড়ে সিঁড়ি ধরে সে যখন ছাদে উঠেছে, ঘাড়ের কাছে কার যেন নিঃশ্বাস পড়ল। চমকে পিছন ফিরতে দেখে পাশের আমড়া গাছের পাতা ফিনফিনে বাতাসে দুলছে। কিরকম একটা গা ছমছম ভাব। সমস্ত ছাদ শুকনো পাতায় নোঙরা হয়ে আছে। বলটা পড়েছিল ছাদের কোনায়। তুলে আনার জন্য যেই পা বাড়িয়েছে ওমনি পিছনদিকের এঁদো ডোবাটার ওপর দিয়ে একটা বেয়ারা বাতাস ছাদের ওপর নেমে পড়ল। শুকনো পাতাগুলো সেই ঘূর্ণীবাতাসে ঘুরপাক খেতে খেতে এক অদ্ভুত চেহারা নিল। তিতানের মনে হল একটা বুড়ো মতো লুঙ্গি পড়া লোক খুব জোরে ঘুরতে ঘুরতে বলটার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। সে বলটা নেবার জন্য কয়েক পা এগোতেই লোকটা লাথি মেরে নিচে ফেলেছিল। একবার মনে হল হাওয়ায়, আরেকবার মনে হল না লোকটাই ফেলে দিল। ভয়ে ছাদের ওপর বেশিক্ষণ দাঁড়ায়নি। হাওয়াটা তখন ঘুরতে ঘুরতে তার দিকে আসছে। সে একরকম দৌড়ে সিঁড়ি টপকে নিচে নেমে আসে। তারপর নিচের ঝোপে বলটা খুঁজেছিল। পায়নি। সারা দুপুর ঝোপের মধ্যে ঘুরে যখন ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বাড়ি চলে এসেছিল। তারপর থেকেই শরীরটা কিরকম ভার-ভার লাগছে।

'কি হয়েছে তিতু?' চোখ খুলতেই তিতান দেখে মাথার কাছে বাবা। পাশে ডাক্তারকাকু। তবুও তিতানের চোখ থেকে দু ফোঁটা জল টুপটাপ ঝরে

পড়ল। জ্বর তো নয় সেরে যাবে। কিন্তু পরীক্ষা? পুরনো ক্লাসে বসে থাকার কি লজ্জা বাবা জানে? আবার দু ফোঁটা জল পড়তে বাবা বলল, 'কাঁদছিস কেন তিতু? আজ তো তোদের পরীক্ষা হয়নি।'

—'হয়নি।' উত্তেজনায় তিতান বিছানার ওপর উঠে বসে।

—'না রে, ডাক্তারকাকুকে নিয়ে তোদের স্কুলের সামনে দিয়ে যখন ফিরছি দেখি সব ছেলে বেরিয়ে এসেছে। অঙ্কের স্যার যদুগোপালবাবুর সঙ্গে দেখা হওয়ায় উনি সব বললেন। সেকেন্ড হাফের পরীক্ষা শুরু হওয়ার আগে উনি প্যাকেট থেকে সমস্ত কোয়েশ্চেন পেপারগুলো বার করে প্রিন্সিপ্যালের টেবিলের ওপর রাখেন। ঘন্টা দেওয়ার জন্য বারান্দায় দারোয়ানকে যেই ডাকতে গেছেন ওমনি সব ওলোট-পালোট হয়ে গেল। সরকারদের পোড়োভিটের দিক থেকে একটা বেয়ারা বাতাস উত্তরের খোলা জানালা দিয়ে ঢুকে প্রিন্সিপ্যালের টেবিলের ওপর রাখা কাগজগুলো সব উল্টেপাল্টে একাকার করে দিল। ওল্টাবি তো ওল্টা, কালির দোয়াতটা পর্যন্ত উল্টে ফেলে দিল। তখন টেবিলময় কালি ছড়িয়ে পড়ে। অর্ধেক কোয়েশ্চেন পেপারের লেখা কিচ্ছু পড়া যাচ্ছে না। পরীক্ষা তাই পিছিয়ে গেছে সামনের শনিবার।' বাবার কথাগুলো ঠিকঠাক বিশ্বাস করতে পারছিল না তিতান। বারান্দার দিকে তাকাতে দেখতে পেল কামিনী পিসিও বাবার কথা অবাক হয়ে শুনছে। তিতান একটু খুশি হল। শুনুক কামিনী পিসি, বুঝুক সত্যি যদি তেনারা থেকে থাকেন তবে সব সময় মন্দ হন না, কখনো-সখোনো ভালও হন। ❑



দূর-অতীতের বন্ধু/ অভীক রায়



গড়ফার নতুন ফ্ল্যাটে এসে গোছগাছ করে উঠতেই সপ্তাহখানেক কেটে গেল তীর্থপ্রসাদদের। সামনে তীর্থর পরীক্ষা। এবারে সে মাধ্যমিক দেবে। বাড়িতে সে ছাড়া বাবা, মা আর ছোট একটা বোন। সেদিন সকালে চায়ের টেবিলে বাবা বললেন, 'তীর্থরে তোর কাকুরগাছির সোনাদির বিয়ে। আজ তো সব নেমন্তন্ন। যাবি তো?'

টোস্টে কামড় দিয়ে তীর্থ বলল, আমার সামনে পরীক্ষা। তোমরা যাও।

—শোনো কথা। আমরা যাব। আর তুই কি একা থাকবি? ফিরতে যদি আমাদের রাত হয়ে যায়? বা ধর, রাতে যদি ওরা আটকে দেয়। সাতটার সময় গিয়ে তো আর হুট করে খেতে বসা যায় না। চায়ের পেয়ালায় চিনি মেশাচ্ছিলেন মা। হেসে বললেন, তখন তো তুই সারা রাত একা। তোর ভয় করবে না?

তীর্থ দেখল, ছোট বোন মামন মিট মিট করে হাসছে। মাত্র সাত বছর বয়স। পাকা হয়েছে বড্ড। গম্ভীর মুখে তীর্থ বলল, আমি একটুও ভিতু নই। এগারোটা পর্যন্ত দেখব। তারপর সব বন্ধ করে শুয়ে পড়ব। পরীক্ষা হয়ে যাক। তখন সব বিয়ে-টিয়েতে যাব।

—আহা! মা ঠোঁট উল্টে বললেন, তোর পরীক্ষা না হওয়া অব্দি সোনাদি বসে থাকবে? যত নেই নেই কথা।

—আমি কি তাই বলেছি? করুক না সোনাদি বিয়ে। কে মানা করেছে? আমি যেতে পারছি না। ব্যাস্।

—তুই না গেলে ও কত দুঃখ পাবে জানিস? কতবার করে বলে দিয়েছে। আহা উঠলি কেন? দুধটা খেয়ে নে লক্ষ্মীটি।

—ভাল লাগছে না। তীর্থ পড়ার ঘরে চলে গেল।

সন্ধেবেলা শেষ পর্যন্ত তাকে রেখেই বাড়ির সবাই নেমন্তন্ন খেতে গেল। যাওয়ার সময় মা বারে বারে বললেন, এগারোটার মধ্যেই কিন্তু আমরা ফিরে আসব। ফ্রিজে তোর জন্য মুরগির মাংস আর লুচি রইল। মনে করে খেয়ে নিস কিন্তু।

মামন চিমটি কেটে বলল, এই দাদা তোমার ভয় করবে না তো?

—যা যা ভাগ। আমি কি তোর মত বাচ্চা নাকি? মারব এক গাঁট্টা। ভয় পায় তো বাচ্চারা।

গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বাবা বললেন, লক্ষ্মী হয়ে থেকো তীর্থবাবু। ভয়ের কিছু নেই। দারোয়ানজীকে বলে রেখেছি। আমরা না ফেরা পর্যন্ত সে জেগে থাকবে।

গাড়ির শব্দ মিলিয়ে যেতে তীর্থ ফ্রিজ খুলল। চিনি দিয়ে লুচি খেতে সে খুব ভালবাসে। দুটো লুচিতে চিনি মাখিয়ে খেতে খেতে পড়ার ঘরে চলে এল। লাইফ সায়েন্সটা বড্ড ঝামেলা করছে। ঠান্ডা মাথায় একটু পড়া দরকার। খাতা বই খুলে বসল সে। লুচি খেয়ে মনে হল, হাতটা ধুয়ে আসি। এঁটো হয়ে গেছে।

বেসিন থেকে ফিরে এসে দ্যাখে, খাতাটা ঠিকই আছে। বইটা নেই। কি ব্যাপার? অবাক হল তীর্থ। এক্ষুনি তো ছিল। কে নিল? এদিক-ওদিক তাকাতেই দেখল, ওপাশের টেবিলে বইটা খোলা পড়ে আছে। নিয়ে এসে তীর্থ ভাবল, কে রাখল ওখানে? বাড়িতে তো আর কেউ নেই। যাক্‌গে। জোরে জোরে সে পড়তে শুরু করল। হঠাৎ মনে হল তার ঠিক পেছনে দাঁড়িয়ে কে যেন পড়া শুনছে। চট করে ঘাড় ফেরাল সে। কই! কেউ তো নেই। মনের ভুল। এবার ভাবল, আমি কি ভয় পেয়েছি? দূর! ভয় পেতে যাব কোন দুঃখে? ডোভার লেনে ক্যারাটে শিখি। অরেঞ্জ বেল্ট। ভয়-টয় আমার ধাতে নেই।

চেয়ার ছেড়ে উঠে একটু পায়চারি করে নিল সে। ঘড়িতে রাত দশটা। পাশের ফ্ল্যাটের টি.ভি-তে ইংরেজি খবর শুরু হয়েছে। আবার সে চেয়ারে বসল। মোড়ের মাথায় দুটো কুকুর ডেকে উঠল ঘেউ ঘেউ করে। কারা যেন বাড়ির সামনে দিয়ে হাসতে হাসতে চলে গেল। তীর্থ আবার পড়ায় মন দিল।

একটু বাদেই কিরকম একটা সেন্টের গন্ধ পেল সে। খুব মিষ্টি গন্ধ। কে? আবার ঘাড় ফেরাল। এবারে সত্যি সত্যি অবাক হয়ে গেল। ফ্রক পরা মিষ্টি দেখতে একটা মেয়ে হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে।

কে তুমি? তীর্থর মুখ দিয়ে বেরিয়ে এল।

আমি ঝরনা। তুমি তীর্থ না? তীর্থ তুমি খুব ভাল ছেলে।

কিন্তু তোমাকে তো আমি চিনি না। তুমি এলে কেমন করে?

আমি তো আসিনি। মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে মেয়েটা হেসে উঠল, কে বলল আমি এসেছি? আমি তো আছি।

কীভাবে? আরও অবাক হল তীর্থ, 'এই ফ্ল্যাটে তো আমরা থাকি। তোমাকে তো কখনও দেখিনি।'

এখন তো দেখছ। তোমার সামনের চেয়ারটায় বসি একটু?

বোসো না। দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? কিন্তু তুমি আমার নাম জানলে কেমন করে?

আমি সব জানি। সুর করে বলল ঝরনা। তারপর ঝরনার মতই ঝরঝর করে হেসে ফেলল।

তীর্থও হেসে বলল, তোমার গায়ে কেমন মিষ্টি একটা গন্ধ। কি মেখেছ বল তো? সেন্ট?

সেন্ট মাখতে আমার বয়ে গেছে। আমার গায়ে সবসময়ই এরকম গন্ধ। তোমার ভাল লাগছে?

ভাল তো লাগছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না তুমি এখানে এলে কেমন করে?

বারে! বললাম না, আমি আসিনি। আমি আছি।

কবে থেকে আছ?

সে অনেক দিন। তখন তোমার জন্মই হয়নি।

মানে?

রাখো তো ওসব কথা। তোমার না সামনে পরীক্ষা। গল্প করলে হবে? লক্ষ্মী ছেলের মত পড় তো! আমি তোমায় দেখি।

আমায় তুমি কি দেখবে?

দেখব। ফিক করে হাসল ঝরনা, যে সব ছেলে পড়াশুনো করে, তাদের দেখতে আমার খুব ভাল লাগে। আমার, জান, বড্ড পড়ার ইচ্ছে ছিল।

একটু আগে তাই বুঝি আমার বইটা নিয়েছিলে? কিন্তু তখন তোমায় দেখিনি তো?

কি করে দেখবে? আমি যে দেখতে দিইনি। আমি না চাইলে তুমি আমায় দেখতেই পাবে না।

এই তো তুমি আমার সামনে বসে আছ। এখন যে তোমাকে দেখছি।

সে তো আমি চেয়েছি বলে। আচ্ছা বেশ। এখন বল তো দেখছ কিনা। তীর্থ দেখল, চেয়ারে ঝরনা নেই। তাড়াতাড়ি সে হাত বাড়াল। কিচ্ছু নেই। শুধু গন্ধ আছে। মনখারাপ হওয়ার আগেই ঝরনার হাসি কানে এল, দেখতে না পেয়ে রাগ হচ্ছে তো খুব। আচ্ছা এবার দ্যাখো।

সঙ্গে সঙ্গে তীর্থ দেখল, সামনের চেয়ারে ঝরনা আগের মতই বসে আছে। মিষ্টি গন্ধটাও ঘুরে বেড়াচ্ছে সারা ঘরে। তীর্থ হেসে বলল, আমি কিন্তু ভয় পাইনি।

পেয়ো না লক্ষ্মীটি। তুমি ভয় পেলে আমার খুব কষ্ট হবে।

কেন? কষ্ট হবে কেন?

তুমি যে আমার বন্ধু। বন্ধুকে বুঝি কেউ ভয় দেখায়?

তুমি বুঝি কাউকে ভয় দেখাও না?

একদম না। ভয় দেখাতে আমার ভীষণ খারাপ লাগে। তাই আমি আমাকে দেখতেও দিই না।

তাহলে আমি দেখলাম কেন?

আজ থেকে দুই জন্ম আগে তুমি আমার বন্ধু ছিলে। খুব প্রিয় বন্ধু। তোমার কিছু মনে নেই। আমার সব মনে আছে। একবার আমার অসুখ করেছিল। তুমি প্রাণ দিয়ে আমার সেবা করেছিলে।

আমি?

হ্যাঁ তুমি। গোয়ালিয়রে তখন আমরা পাশাপাশি বাড়িতে থাকতাম।

গোয়ালিয়র? সে তো অনেক দূর।

পরলোকের চাইতে তো বেশি দূর নয়। মিষ্টি গন্ধ ছড়িয়ে ঝরনা হাসল, আমি এখন শুধু ঠান্ডা বাতাস তীর্থ। তোমার মত শরীর তো আমার নেই।

কে বলল নেই? এই তো তুমি। কত সুন্দর দেখতে! চেয়ার থেকে উঠে ঝরনার হাত ধরতে গেল তীর্থ। কেউ নেই। চেয়ার খালি। মিষ্টি গন্ধটা যেন চলে যাচ্ছে দূরে। দূর থেকেই গানের মত ভেসে এল, আমরা বন্ধু তীর্থ। আমরা বন্ধু।

বাইরে তখন গাড়ি থামল। সামনের গলা, দাদা আমরা এসে গেছি। দরজা খোল। ❑

*

কালো মোরগ/ অরুণ আইন



সব জিনিসের জন্যই বুঝি দরকার স্থান-মাহাত্ম্য আর উপযুক্ত ভূমিকা। তা না হলে সেদিন সন্ধ্যা থেকে টিপ-টিপ অঝোরে বৃষ্টির মধ্যে যখন হঠাৎ লাইট নিবে গেল, পাশের মাঠ থেকে ভেসে আসছে অবিশ্রান্ত ঝিঁঝি আর ব্যাঙের ডাক, তখন আমাদের ক্লাবের চিরাচরিত তাসের আড্ডায় হঠাৎ ভূতের গল্পের কথা উঠল কেন? ব্যাপারটা খুলেই বলি।

আমরা কজন রেলওয়ের স্টাফ ইন্‌স্টিটিউটের তাসের আড্ডায় নিত্য খেলুড়ে। আমরা মানে এই দশ-বারোজন বুকিং ক্লার্ক আর মালগাড়ির অ্যাপ্রেনটিস গার্ড। আমাদের মধ্যে শশীভূষণবাবুই যা একটু বয়োজ্যেষ্ঠ। শশীভূষণের বয়স বছর পঞ্চাশ। ভদ্রলোক ব্যাচেলার। বাদবাকি আমরা সবাই পঁচিশের মধ্যে ঘোরাফেরা করছি।

সন্ধ্যে ছটা থেকে শুরু হয় ব্রিজ খেলার আসর, তারপর রাত দশটার শেষ মেলট্রেন যখন ইন্‌স্টিটিউটের দেওয়াল কাঁপিয়ে চলে যায়, তখন সেই আসর ভাঙে। দারোয়ান ভজুয়া এর মধ্যে বার দুই-তিন চা দিয়ে যায়।

এভাবেই দিনগুলো চলছিল বেশ। সেদিন কাল করল ঐ বৃষ্টি আর লাইট। বিকেল থেকেই বৃষ্টি নেমেছে আকাশ ভেঙে। কোয়ার্টারে বসে আছি, মন-মেজাজ খারাপ— আজ বুঝি আর তাসের আড্ডায় হাজিরা দেওয়া সম্ভব হল না।

সন্ধে নাগাত বৃষ্টিতে একটু টান ধরতে ছাতি মাথায় দুর্গা বলে বেরিয়ে পড়লাম।

ইন্‌স্টিটিউটে গিয়ে দেখি, হয় ছাতি নয়ত ওয়াটারপ্রুফ গায়ে জড়িয়ে প্রায় সবাই সেখানে হাজির। এমনকি শশীভূষণবাবুও— আমাদের কমন শশীদা।

আমি এসে পৌঁছতেই বৃষ্টিটা আবার চেপে নামল। আলমারি খুলে অজয় সবে ছ প্যাকেট তাস বের করেছে, এমন সময় লাইট নিবে গেল। যা ব্বাবা! আচ্ছা বেরসিক তো। অজয় পাওয়ার স্টেশনের উদ্দেশ্যে অস্ফুট স্বরে কটূক্তি করল। বাইরে ঝমঝম করে বৃষ্টি পড়ছে, খোলা জানলা দিয়ে ঠান্ডা বাতাসের সঙ্গে ঘরে ঢুকছে ভেজা যুঁই ফুলের গন্ধ, এমন একটা পরিবেশে তাস খেলাটা কেমন জমত ভেবে আমাদের সকলেরই মন খারাপ হয়ে গেল। অতি উৎসাহে অজয় কয়েকবার মোমবাতি জ্বালাবার চেষ্টা করল, কিন্তু তাও দমকা বাতাসে মুহূর্তে নিবে গেল। শশীদা বললেন, "ক্ষ্যান্ত দাও অজয়, আজ আর খেলা হবে না।"

বিভিন্ন টেবিল থেকে উঠে এসে আমরা সবাই এক টেবিলে বসলাম। এরপর এক কথা দু কথার পর ভূতের কথা উঠল। উঠবেই। বাইরে বৃষ্টি, ভেতরের অন্ধকার থৈথৈ, এমন জায়গায় বাঙালিদের আড্ডায় ভূতের গল্প না উঠে যায় না। অজয় ভূতের অস্তিত্ব সম্বন্ধে ঘোরতর সন্দিহান। ও বিশ্বাসই করে না ভূত বলে কিছু আছে। ভূতের গল্প উঠতেই ও প্রবল তর্ক জুড়ে দিল। বলল, "ভূতের অস্তিত্ব আমাদের মনে, বাইরে নয়। ভীতু মনের কল্পনা ঐ সব।"

ভূতের গল্পের কথা উঠতেই অজয়ের এই বাধাদান আমাদের কারোরই ভাল লাগল না। আরে বাবা, থাক্ না থাক্, বাইরে অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, ভেতরে গা ছম-ছম অন্ধকার, মাঝে মাঝে দমকা ঠান্ডা বাতাস, এর মধ্যে ভূতের গল্পের মত যে মুখরোচক চাট্ নেই সেটা তো অস্বীকার করা যায় না! কিন্তু অজয়কে বোঝায় কে। তার ঐ এক গোঁ: "আমাকে কেউ ভূত দেখাবার গ্যারান্টি দিলে আমি তার সঙ্গে জাহান্নাম পর্যন্ত যেতে রাজি।"

আমাদের মধ্যে ভূত সম্বন্ধে কেউ অভিজ্ঞ নয়। তাই কে আর অজয়কে গ্যারান্টি দিয়ে হাত ধরে জাহান্নামে নিয়ে যাবে! কিন্তু ভূতে অবিশ্বাস বলেই বোধহয় অজয় ভূত-বিষয়ক বহু দেশী বিদেশী বই পড়ে ফেলেছে। কাজেই ভৌতিক ঘটনা-টটনা ও আমাদের চেয়ে বেশি জানে। ও বলে, "ভূত আসলে চোখের ভুল। ইলিউশান। সেই সঙ্গে পরিবেশও কিছুটা কাজ করে।"

আমরা বললাম, "যেমন?"

"যেমন ধর, একটা ঘটনার কথা বলি। আমি সেবার দেশের বাড়িতে। একদিন আমার বিধবা পিসিমা মাঝরাতে উঠে বাইরে গেছেন। হঠাৎ 'ভূত ভূত'

বলে চিৎকার! আমরা সবাই বাইরে এসে দেখি, পিসিমা মাটিতে অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন, মুখ দিয়ে একটা গোঁ গোঁ শব্দ বেরুচ্ছে। জল-টল দিতে তাঁর জ্ঞান ফিরল। বললেন, তিনি নাকি দেখলেন প্রাচীরের গায়ে সাদা শাড়ি পরা একজন গুড়িসুড়ি মেরে বসে আছে। পিসিমাকে দেখতেই হাতছানি দিয়ে ডাকল। সেই দেখেই পিসিমা অজ্ঞান। আমরা প্রাচীরে দেখলাম ভূতের কোন চিহ্ন নেই। তবে?"

অজয় থামল। সুভাষ একটু আমার পাশে সরে এল। অজয় আবার শুরু করল: "তবে আসল ব্যাপারটা বুঝলাম। সেদিন ছিল পূর্ণিমা। মাঠ ভর্তি জ্যোৎস্না। আকাশে খন্ড খন্ড মেঘ ভেসে বেড়াচ্ছে। জ্যোৎস্নার আলোয় বাড়ির পিছনের তালগাছের ছায়া পড়েছিল প্রাচীরে। আর বাতাসের অল্প ধাক্কায় তালগাছের পাতাগুলো নড়ছিল। ব্যাস, তাতেই পিসিমা ভেবে বসলেন, ভূত তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। ব্যাপারগুলো সব এমনই চোখের ভুল, বুঝলি।"

হিরন্ময় বলল, "কিন্তু তুই যে বললি, তোরা গিয়ে প্রাচীরে কিছু দেখতে পেলি না?"

"পাইনি তো। সেই মুহূর্তে একখন্ড মেঘ এসে চাঁদটাকে ঢেকে দিয়েছিল, তাই প্রাচীরে ছায়া পড়েনি। কিন্তু মেঘ সরে যেতে আবার সেই আগের মত অবস্থা। পিসিমার জ্ঞান হতে আমি সমস্ত ব্যাপারটা দেখালাম। সেই থেকে পিসিমার আর ভূতের ভয় নেই। আমাদের অতবড় দেশের বাড়িতে তিনি এখন একাই থাকেন।"

সুভাষ তারপর আমার কাছ থেকে সরে গেছে। বোধহয়, ভূতটা মিথ্যা প্রমাণিত হতে ও খুশিই হয়েছে। কিন্তু আমার মুখ থেকে হঠাৎ ফস করে বেরিয়ে গেল: "কিন্তু এত যে আমরা ভূতের গল্প শুনি তার সবগুলিই কি চোখের ভুল? ভীরু মনের কল্পনা?"

"নিশ্চয়ই। তুই আমাকে যে কোন ভূতের গল্প বল, আমি ফাঁকটা কোথায় দেখিয়ে দিচ্ছি। যে কোন ভূতের গল্পেরই কোন বাস্তব ব্যাখ্যা নিশ্চয়ই আছে।"

"সব ভূতের গল্পেরই কি ব্যাখ্যা আছে?"

আমরা সবাই চমকে উঠলাম। এতক্ষণ কথাবার্তা আমাদের বন্ধুদের মধ্যে হচ্ছিল, হঠাৎ এক কোণ থেকে শশীদার এই আচমকা প্রশ্ন শুনে আমরা আশ্চর্য হলাম। শশীদার মুখের চুরুটটা গনগন করে জ্বলছে। অন্ধকারেও আমরা দেখলাম, তাঁর চোখ জ্বলজ্বল করছে।

অজয় জোরের সঙ্গে বললে, "নিশ্চয়ই। কেন আপনার কোন ভূতের গল্প জানা আছে নাকি?"

শশীদা মুখ থেকে চুরুটটা নামিয়ে ছাই ঝাড়লেন। কিছুক্ষণ সবাই চুপচাপ। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম শশীদা কী বলেন শোনার জন্য। বোধ হয়

আমরা সবাই চাইছিলাম, শশীদা অজয়কে একটা মুখের মত জবাব দিন। ব্যাটার আস্পর্ধা তো কম নয়। আমরা সবাই বঙ্গপুঙ্গব, ছেলেবেলা থেকে হাতে মাদুলি আর কোমরে ঘষা তামার পয়সা বাঁধতে অভ্যস্ত। আমাদের কিনা ভূতে অবিশ্বাস করার দুঃসাহস! হুঁ!

কিন্তু শশীদা আমাদের হতাশ করলেন। তিনি ছাই ঝেড়ে হাতের চুরুটটা ঘোরাতে ঘোরাতে শান্ত গলায় বললেন, "না ভাই, আমার কোন ভূতের গল্প জানা নেই।"

অজয়ের গলায় ব্যঙ্গ: "আসলে আপনি ভয় পেয়ে গেছেন। আপনি জানেন এখানে কোন আষাঢ়ে গল্প ফাঁদলে আমি তার ফাঁকিটুকু ধরে ফেলব।"

শশীদা আশ্চর্য ঠান্ডা গলায় বললেন, "হয়ত।"

তাঁর চোখ দুটো একবার জ্বলজ্বল করে উঠে আবার স্বাভাবিক হয়ে এল। আমার কেমন যেন মনে হল শশীদা কি একটা বলতে গিয়ে চেপে গেলেন। কথাটা বলতেই বাকি সবাই শশীদাকে চেপে ধরল। বলতেই হবে।

শশীদার চুরুট নিবে গিয়েছিল। রতনের কাছ থেকে দেশলাই নিয়ে আবার জ্বালিয়ে নিলেন। একটা দীর্ঘ টান দিয়ে কিছু ভাবলেন যেন। তারপর শান্তগলায় বললেন, "আমাকে কিছু বলতে অনুরোধ করো না। হ্যাঁ, সত্যি সত্যি আমি ভূতের গল্প জানি। একটি মাত্র ভূতের গল্প। কিন্তু সে গল্প বড় ভয়ানক। পৃথিবীর আর কোনো ভূতের গল্প বোধহয় এত ভয়াবহ নয়। কেননা যতবার আমি সেই গল্প বলতে গেছি, ততবার এই গল্পের সত্যতা প্রকাশ করার জন্য স্বয়ং সে এসে হাজির হয়েছে। হ্যাঁ, যতবার বলেছি ততবার। আমি জানি, আজও যদি এই গল্প এখানে বলি তবে সে এসে ঐ দরজার কাছে দাঁড়াবে। দ্বিতীয়বার যখন এই গল্প বলি তখন একজন শ্রেতা অজ্ঞান হয়েছিল। তার মধ্যে অনবরত ভুল বকত আর চমকে চমকে উঠত। তিন দিন যমে-মানুষে টানাটানি। সেই থেকে প্রতিজ্ঞা করি— আর নয়। এখানেই শেষ। আর বলব না। তা সেও আজ পঁচিশ বছর হল। এতদিন এ গল্পের কথা ভুলেই ছিলাম। আজ আবার মনে পড়ল।"

অজয়ের গলায় অবিশ্বাস: "ওঃ, তাহলে আপনি নিশ্চিন্তে আবার সেই গল্প শুরু করতে পারেন। পঁচিশ বছরে ঐ ভূত নিশ্চয় মারা গেছে।"

সুভাষের গলার স্বর আর চেনা যায় না। তার গলায় যেন মাছের কাঁটা ফুটেছে। চিঁ চিঁ স্বরে বলল, "শশীদা, আপনার ভূতটি সত্যি সত্যি এ ঘরে আসবে নাকি?"

"এসে গেছে।"

শশীদার গলা আশ্চর্যরকম ঠান্ডা আর গম্ভীর।

বাইরে তখন টিপটিপে বৃষ্টিটা আবার চেপে এসেছে। ঘরে ঢুকল এক

ঝলক দমকা হাওয়া। একটানা গোঙানির মত হুইসেল বাজাতে বাজাতে ফর্টিনাইন আপ মেল গাড়ি চলে গেল। হঠাৎ ইন্‌স্টিটিউটের বাইরে তালগাছের একটা ডাল ভাঙার শব্দ হল আর ঠিক সেই সময়ে——

সেই সময় দরজার কাছে কাঁপতে কাঁপতে একটা শিখা এসে থামল। দরজার মাঝামাঝি কিছুক্ষণ সেটা থেমে রইল, তারপর আমাদের টেবিল লক্ষ্য করে এগোল। মনে হল, কেউ যেন পেরেক দিয়ে আমাদের চেয়ারের সঙ্গে গেঁথে ফেলেছে। ঘরের নিচ দিয়ে বয়ে গেল বরফগলা জলের একটা স্রোত। শিখাটা এসে টেবিলের সামনে থামল। হঠাৎ সুভাষ আর্ত চিৎকার করে আমাকে জড়িয়ে ধরল।

"বাবু, আমি ভজুয়া। আপনাদের চা।"

এক হাতে মোমবাতি আরেক হাতে চায়ের কেটলি নিয়ে ভজুয়া এসে দাঁড়াল।

ঘরশুদ্ধ একটা নড়েচড়ে বসার শব্দ শোনা গেল। এতক্ষণ সবাই যে পুতুলের মত বসেছিল। শশীদা এমনভাবে গল্পের ভূমিকা গড়ে তুলেছিলেন যে, আমরা পরিবেশের হাতের ক্রীড়নক হয়ে স্থাণুর মত বসেছিলাম।

ভজুয়া চলে গেল। আমাদের হাতে গরম চা। সুভাষ আবার ঠিক হয়ে বসেছে। একটা সিগারেট ধরিয়ে নিল।

অজয় বলল, "দেখলেন তো চোখের সামনে কেমন একটা ইলিউশান ঘটে গেল! সব ব্যাপারই এমন। আপনার ব্যাপারটাও তেমন। যা হোক, আপনি বলে ফেলুন। এর আগে দু বার বলেছেন, এটা নিয়ে তিন বার হবে। বার বার তিনবার। এর পর না হয় গল্পটা আর বলবেন না।"

উত্তরে শশীদা যা বললেন তা আমরা কি কেউ স্বপ্নেও ভাবতে পেরেছিলাম! ররফ-শীতল কণ্ঠে শশীদা বললেন, "হ্যাঁ, আমাকে বলতেই হবে। কেননা সে এখানে এসে গেছে। এ গল্পের শেষ না করলে সে যাবে না আমি জানি। তুমি কি বললে অজয়? ইলিউশান, না? তোমাদের এই চা কে দিয়ে গেল? ভজুয়া? ভজুয়া তো আজই সকালে এক মাসের ছুটিতে বাড়ি গেছে। তুমি ইন্‌স্টিটিউটের সেক্রেটারি। ছুটি তো সে তোমার কাছেই নিয়ে গেছে! এখন তো সে গয়া প্যাসেঞ্জারের কোনো তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় বসে ঢুলছে। এখানে এলো কি করে?"

জানলা দিয়ে একটা চামচিকে ঢুকল ঘরে। আমাদের মাথার উপর একবার ঘুরপাক খেয়ে আবার খোলা ভেন্‌টিলেটার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে গেল। টেবিলের ওপরে খবরের কাগজটি এই সময় খস্ খস্ শব্দ তুলে উড়ে গিয়ে মেঝেতে পড়ল। সব মিলিয়ে কেমন এক ভৌতিক পরিবেশ। আমাদের হাত-পাগুলো জমাট পাথর। চেষ্টা করেও নাড়তে পারছি না। ঘাড়ের কাছেই যেন কার নিঃশ্বাস

ডার শব্দ পেলাম। এ কী করে সম্ভব? সত্যিই তো ভজুয়া আজ ছুটি নিয়ে গেছে। অথচ হাতে এখনও গরম চায়ের গ্লাস। অজয়ের মুখে টু শব্দ নেই।

মাথার উপর একরাশ বীভৎস অন্ধকার যেন সুযোগ বুঝে দেওয়ালে যা খুশি তাই ছায়া এঁকে চলেছে। শশীদার রহস্যময় গলা আবার শোনা গেল: "চা-টা খেতে আপত্তি কোরো না। ওটা কিন্তু ইলিউশান নয়। আর ক্ষতি করতেও নয়। চরণ আর যাই করুক আমার বন্ধুদের ক্ষতি করবে না। হ্যাঁ, এটা চরণের গল্প।"

আমাদের হাতের গ্লাস সব হাতেই রয়ে গেছে। কখন যে আমরা সরতে সরতে একেবারে শশীদাকে ঘিরে বসেছি জানি না। বাতাসে ভেজা যুঁইয়ের তীব্র গন্ধ। মনে হল, শশীদা যেন এক আশ্চর্য যাদুকর। উনি এখন ইচ্ছা করলে পৃথিবীর অসম্ভব সব ঘটনা এখানে ঘটিয়ে দিতে পারেন। আমরা সবাই যেন তাঁর হাতে সম্মোহিত হয়ে আছি। এমনকি অজয় যে অজয়, তার মুখেও আর একটা কথা নেই।

শশীদা বললেন, "সে আজ বছর পঁচিশ-ছাব্বিশ আগের কথা। আমি তখন জামশেদপুরে। সবে এল.সি.ই. পাশ করে একটা সাহেব কোম্পানিতে ওভারশিয়ারের চাকরিতে ঢুকেছি। সে সময় আমাদের কোম্পানি টিস্‌কোর ছ নম্বর ব্লাস্ট ফার্নেস রিলাইনিং করার কনট্রাক্ট পেয়েছিল। আমার উপর কাজ দেখাশুনার ভার। দিনরাত কাজ চলে। পাঁচশ কুলি কাজ করছে। কারখানা থেকে মাইল কয়েক দূরে ঘামা মাইন্‌সে আমার কোয়ার্টার। সে সময় জামশেদপুর এত জমজমাট ছিল না। শহরের অর্ধেক জুড়ে তখনও শাল-মহুয়ার জঙ্গল। রাতে কখনও ভাল্লুক, কখনও জংলী হাতি বেরোয়। কোয়ার্টারে আমি একা থাকি। সঙ্গে চরণ। আমার চাকর। জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ— সবই করে। লোকটা আমাকে ভালবাসত খুব। চরণ চান্ডীলের আদিবাসী। মাসে একবার ছুটি নিয়ে বাড়ি যেত। দিন দুয়েক পর আবার ফিরে আসত।

সেবারও চরণ তেমনি ছুটি নিয়ে বাড়ি গেছে। সাতদিন হতে চলল, অথচ ফিরল না। সাধারণত এমন হয় না। ভাবলাম, হয়ত জ্বরে পড়েছে। যেদিনকার কথা বলছি সেদিন একটু তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরছি। তাও রাত দশটার আগে নয়। তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরে নিজেকেই রান্না করতে হবে। ওয়ার্কশপ থেকে বেরিয়ে কোয়ার্টারের রাস্তা ধরলাম।

রাস্তায় একজনও লোক নেই। রাস্তায় তখনও লাইট পোস্ট বসেনি। চারিদিকে ঘুটঘুটে অন্ধকার। পাশের জঙ্গল থেকে যে কোনো সময় একটা ভাল্লুক বেরিয়ে পড়তে পারে। এমন সময় মনে হল, আমার সামনে হাত দুয়েক আগে আগে কেউ চলছে; কোনো জানোয়ার হয়ত। পকেট থেকে টর্চ বের করে জ্বেলে দেখি, একটা কালো মোরগ। ভাবলাম, জংলী মুরগি হবে—

পাশের জঙ্গল থেকে রাস্তায় এসে পড়েছে। টর্চ নিবিয়ে নিশ্চিন্ত মনে চল
লাগলাম।

কী ভাবছিলাম খেয়াল নেই, হঠাৎ মনে হল, তাইত মোরগটা যে এখ
আমার আগে চলেছে। এমন তো হয় না! আবার টর্চ ফেললাম। একটা মা
যেমন পথ চলে, কালো মোরগটা ঠিক সেইভাবে পথের এক পাশ দিয়ে হেঁ
চলেছে। এবার ওর গায়ে আলো পড়তে মোরগটা ঘাড় ফিরিয়ে চাইল। তার
আমার দিকে চেয়ে একটু হাসল। মোরগের হাসি! ভাবলাম, চোখের ভু
সারাদিনের অভুক্ত শরীরের উদ্ভট খেয়াল। ভুলে যেতে চাইলাম কিন্তু কিছুতে
ভুলতে পারলাম না। বার বার চোখের সামনে ভেসে এল একটা কালো মো
ঘাড় ফিরিয়ে আমার দিকে চেয়ে হাসছে। বুকের রক্ত হিম হয়ে এল। মোরগটা
কিছুতেই মাথা থেকে তাড়াতে পারলাম না। ওটা তখনও আমার আগে আ
চলেছে। আর মাঝে মাঝে ঘাড় ফিরিয়ে আমাকে দেখছে। মনের সমস্ত শ
জড় করে হাঁটতে লাগলাম।

কোয়ার্টারের কাছে এসে পড়েছি। বাঁদিকে ঘুরলেই আমার কোয়ার্টার
রুদ্ধ বিস্ময়ে লক্ষ্য করলাম, মোরগটাও বাঁদিকের পথ ধরল। তারপর কোয়ার্টারে
গেট পেরিয়ে অন্ধকার বারান্দায় উঠে গেল। তাড়াতাড়ি বারান্দায় উঠে এ
টর্চ জ্বাললাম। না, কেউ নেই। এবার মাথা ঝাঁকালাম। নিজের উদ্ভট কল্পনা
নিজেরই হাসি পেল। বাঃ, সারা রাস্তা নিজের মনের অলীক কল্পনার কা
ভয় পেতে পেতে এসেছি! কোন মানে হয় না।

চাবি বের করে দরজার তালা খুলতে যাচ্ছি, দেখি, দরজার তালা নেই
ভেতর থেকে বন্ধ। আমি কারখানায় যাবার সময় দরজায় তালা দিয়ে গেছি
যদি চরণ এসে গিয়ে থাকে, তবে ও তালা খুলে থাকতে পারে। তবে কি
চরণ এসে গেছে? যাক্, হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। নিশ্চয় চরণ দেশ থেকে ফি
এসেছে।

কড়া নাড়লাম। ভেতরে লাইট জ্বলল। তারপর দরজা খুলে গেল। দরজা
চরণ দাঁড়িয়ে আছে। এমন সময় চরণের পেছন থেকে একটা কালো মোর
বেরিয়ে বারান্দায় এসে পড়ল, তারপর অন্ধকারে মিশে গেল।

রুদ্ধ বিস্ময়ে আমি কয়েক মুহূর্ত কথা বলতে পারলাম না। কিছুক্ষণ
পর বললাম, চরণ ঘরে মোরগটা এল কি করে?"

"মোরগ! কই আমার চোখে কিছু পড়ল না তো! অন্ধকারে কী দেখতে
কী দেখেছেন!"— চরণ বললে।

হতে পারে। আমি আর কথা বাড়ালাম না। স্নান করে খেতে বসে
চরণকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এবার এত দেরি করলে কেন?"

চরণ বললে, "এবার দেশে ভারি পরব ছিল। বউ ঐ পরবের আগে আসতে দিলে না।"

খাওয়া শেষ হতে চরণ এঁটো বাসন তুলে নিয়ে গেল। আমি যথারীতি একটা সিগারেট ধরিয়ে আগাথা ক্রিস্টির গোয়েন্দা গল্প নিয়ে বসলাম।

ভেতরের বারান্দায় বিছানা পেতে লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়ল চরণ। শোবার আগে আমাকে জিজ্ঞেস করে গেল, আমার আর কিছু চাই কি না।

মাঝরাত অবধি বইপড়া আমার অভ্যাস। বইপড়া শেষ করে বাথরুমে যাবার জন্য ভেতরের বারান্দায় গেলাম। বারান্দার নিচেয় উঠোন। উঠোনের শেষে বাথরুম। কিন্তু বারান্দায় পা দিয়েই যা দেখলাম, তাতে আমার বুকের রক্ত জমে এল। ঘরের অস্পষ্ট আলোয় দেখলাম, চরণের পাতা বিছানায় একটা কালো মোরগ শুয়ে আছে। বালিশে মাথা রেখে যেন একটা মানুষই শুয়ে আছে। আমার গলা থেকে বোধ হয় একটা অস্ফুট আর্তস্বরই বেরুল: "চরণ!" সেই ডাকে মোরগটা উঠে দাঁড়াল। আমার দিকে ঘাড় ফিরিয়ে একবার হাসল। সেই হাসি। তারপর উঠে অন্ধকার উঠোনে নেমে গেল।

আমার ডাক শুনেই চরণ হন্তদন্ত হয়ে অন্ধকার উঠোন ফুঁড়ে বারান্দায় উঠে এল: "কী হল বাবু!"

"তুমি কোথায় গেছিলে?"

"একটু বাথরুমে গেছিলাম বাবু!"

"চরণ, বাড়িতে বোধহয় একটা কালো মোরগ ঢুকে পড়েছে। খুঁজে দেখ তো।"

চরণের গলায় বিস্ময়: "সে কী বাবু, কালো মোরগ!"

"হ্যাঁ, মনে হচ্ছে কারো পোষা মোরগ। ভুল করে আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়েছে।"

চরণ লাইট জ্বালল। তারপর আমি আর চরণ তন্ন তন্ন করে বাড়ির সমস্ত জায়গা খুঁজে দেখলাম। নাঃ, মোরগ দূরের কথা একটা কালো পালক পর্যন্ত নেই।

বার বার তিন বার। তিন বার কালো মোরগ চোখে পড়ল। তিন বারই চোখের ভুল। কিছুতেই কিছু ভাবতে পারলাম না। চরণকে শুয়ে পড়তে বললাম। আমিও চোখে-মাথায় জল দিয়ে লাইট নিবিয়ে শুয়ে পড়লাম। মাথা থেকে সমস্ত দুশ্চিন্তা দূর করে ফেললাম। সুন্দর ঘুম হল।

চরণের ডাকে ঘুম ভাঙল। দেখি, ধূমায়িত চায়ের কাপ হাতে চরণ দাঁড়িয়ে আছে। কালকের সমস্ত দুশ্চিন্তা মাথা থেকে বেরিয়ে গেছে। চায়ের কাপে চুমুক দিতে দিতে জানলা দিয়ে দৃষ্টি মেলে দিলাম বাইরে। দূরে আকাশের গায়ে সুন্দরী দলমা পাহাড়ের চুড়ো। সেখানে রুপোলি মেঘের মনোহারী খেলা।

ঘরে ঝিরঝির বাতাসের আমেজ। সুন্দর সকাল। মনে মনে ভাবলাম, একনাগাড়ে পরিশ্রম করার ফলে মাথায় বায়ু চড়েছিল। তাই কাল জেগে জেগে এমন একটা দুঃস্বপ্ন দেখেছি। ঠিক করলাম, এবার ক'দিনের ছুটি নিয়ে বিশ্রাম করতে হবে।

চা খেয়ে বাথরুমে যাবার জন্য ভেতরের বারান্দায় আসতেই মেজাজ তিরিক্ষি হয়ে গেল— উঠোনে একরাশ কালো পালক ছড়ান। কয়েকটা গায়ে রক্তের ছিটে।

"চরণ!"— আমার গলায় উষ্মা: "এ সব কি? কাদের বাড়ির মুরগির পালক এসে আমাদের বাড়িতে পড়েছে তুমি লক্ষ্য করনি? ঝাঁট দিয়ে ফেলে দাওনি কেন?"

চরণ রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে অবাক: "তাই তো বাবু, কিছুক্ষণ আগেও আমি কিছু দেখিনি। এইমাত্র বোধহয় বাতাসে উড়ে এসে পড়েছে।"

চরণ ঝাঁট দিয়ে ওগুলি পরিষ্কার করল।

খেয়েদেয়ে কারখানায় গেলাম। কাজের ফাঁকে ফাঁকে বার বার দুঃস্বপ্নের মত হানা দিতে লাগল কালো মোরগ। কিছুতেই ভুলতে পারলাম না। আচ্ছা জ্বালায় পড়লাম তো। একটা তুচ্ছ কালো মোরগ জীবন অতিষ্ঠ করে তুলল! একবার ভাবলাম, সমস্ত ব্যাপারটা সান্যালকে বলি। সান্যাল আমার সহকর্মী। কিন্তু পারলাম না। শুনে ও হয়ত ঠাট্টা করবে। কারণ সমস্ত ব্যাপারটা আগাগোড়া ভাবতে আমার কেমন অবাস্তব ঠেকছে। জোর করে কাজে মন দিতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু মনের তলায় একটা কাঁটা খচ্‌খচ্‌ করতে লাগল।

দুপুরে খাবার সময় অফিসে এসে বসলাম। চরণ অফিসেই খাবার পাঠিয়ে দেয়। গিয়ে দেখি, সান্যাল তার টিফিন-ক্যারিয়ার খুলে বসে গেছে। আমারও টিফিন এসে গেছে। হাত ধুয়ে এসে টিফিন খুলে বসলাম। টিফিন খুলতেই সমস্ত হাত-পা জমে শক্ত হয়ে গেল!

সান্যাল ব্যাপারটা লক্ষ্য করে বলল, "কি হে, অমন চুপচাপ বসে কী ভাবছ?"

"মুরগি!"

"মুরগি?"

"হ্যাঁ, চরণ আজ টিফিনে মুরগির মাংস পাঠিয়েছে।"

"সে তো খুব ভাল জিনিস হে! অমৃত। বেশি থাকলে আমাকেও একটু দিও।"

"না, ভাবছি চরণ মুরগি পেল কোথায়? আজ তো হাটবার নয়।"

"আরে, তোমার অত খোঁজ কী দরকার? খিদের মুখে মুরগি উপাদেয়। নাও শুরু কর।"

কিন্তু আমার সমস্ত মন তখন এক অসহনীয় অশান্তিতে বিষিয়ে গেছে। সমস্ত বাটিটাই তুলে সান্যালকে দিয়ে দিলাম। ও তো অবাক! বললাম, "কাল রাতে পেটটা একটু খারাপ হয়েছিল। মাংস খাব না।"

দই দিয়ে ভাত মেখে সামান্য ভাত খেলাম।

আজ বিকেল-বিকেল বাড়ি ফিরলাম। কিছুতেই সবুর সইছিল না। গিয়েই চরণকে বললাম, "চরণ, তুমি আজ মুরগির মাংস পাঠিয়েছিলে?"

"হ্যাঁ বাবু।"

"মুরগি কোথায় পেলে?"

"একটা আদিবাসী এসেছিল কালো মোরগ নিয়ে। সস্তায় পেলাম নিয়ে নিলাম।"

রাগে আমি ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলাম: "খবরদার বলছি, আমার বাড়িতে কোনো কালো মোরগ ঢুকতে দেবে না।"

আমাকে এইভাবে রেগে উঠতে দেখে চরণ বেচারা হতবাক হয়ে গেল। তারপর মাথা নিচু করে ধীরে ধীরে ভেতরে চলে গেল।

এর পর দুদিন নিরুপদ্রবে কাটল। কালো মোরগের আর কোনো উৎপাত নেই। মনে মনে ভাবলাম,"যাক্ বাবা, ফাঁড়া কেটেছে। দু' দিনেই জীবন একেবারে অতিষ্ঠ করে তুলেছিল।"

শশীদা থামলেন। চুরুট থেকে এক ঝলক ধোঁয়া বেরিয়ে এসে তাঁর মুখের সামনে একটা জাল বুনে চলেছে। সেই জালের আড়ালে আস্তে আস্তে ঢেকে যাচ্ছে তাঁর মুখ। শশীদা আবার শুরু করলেন:

"সেদিন আমার কাজ সারতে সারতে অনেক দেরি হয়ে গেল। কুলিদের ওভারটাইম দিয়ে কাজ করানো হচ্ছিল। রাত তখন প্রায় বারোটা হবে। আমি বাড়ি ফিরব ঠিক করলাম। কারখানা থেকে বেরিয়ে রাস্তায় পা দিতেই গা ছম ছম করে উঠল। কেমন একটা ভয় এসে আমাকে স্থবির করে দিল। বার বার মনে হচ্ছিল, আজ হয়ত রাস্তায় আবার সেই কালো মোরগটার দেখা মিলবে। রাস্তার উপর আমার পা জমে গেল। বার বার চেষ্টা করেও এগোতে পারলাম না। শেষ অবধি বিরক্ত হয়ে কারখানায় ফিরে গেলাম। বুধনকে গিয়ে বললাম: "চল্ তোর ছুটি। আমার সঙ্গে আজ আমাদের বাড়িতে থাকবি।"

বুধন আমাদের কারখানার কুলি। বেশ শক্ত-সমর্থ ওর চেহারা। যেন কালো পাথরে কুঁদে তৈরি শরীর। চরণের গাঁয়ের ছেলে। চরণের পরিচিত। চরণই আমাকে বলে কয়ে ওকে কারখানায় ঢুকিয়ে দিয়েছিল।

বুধনকে নিয়ে তো বেরিয়ে এলাম। বুধনও বাধ্য ছেলের মত আমার পিছু পিছু আসতে লাগল। সঙ্গে বুধন থাকায় এবার আর ভয় করছিল না। কিন্তু মনে মনে নিজের উপর খুব বিরক্ত হলাম। আগে আগে কত রাতে

এই রাস্তায় একা একা বাড়ি ফিরেছি। ভয়ের লেশমাত্র ছিল না। চিৎকার করে রবীন্দ্র সঙ্গীত গাইতে গাইতে পথ হেঁটেছি। একবার ইচ্ছা হল ওকে ফিরে যেতে বলি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমার ভেতর কেউ যেন এসে ফিসফিস করে বলে গেল: 'ও থাক, ও থাক।'

বুধন সারা রাস্তায় একটাও কথা বলেনি। এবার বুধন আর চরণ এক সঙ্গে ছুটি নিয়ে দেশে গেছিল। বুধন ঠিক দু'দিন পরেই ফিরে এসেছিল। কিন্তু তারপর থেকেই ওকে দেখেছি কেমন গম্ভীর। ততক্ষণে আমরা কোয়ার্টারে এসে পড়েছি। বারান্দায় উঠে দরজার কড়া নাড়লাম। পেছনে বুধন। এই সময় বুধন অস্পষ্ট ঘড় ঘড় স্বরে কী যেন বলল। ঠিক শুনতে পেলাম না। দরজা খুলে গেল, কিন্তু সামনে কেউ নেই। যেন হাওয়ায় খুলে গেল। আর ঠিক তখনই...

দরজার কাছে এসে দাঁড়াল সেই কালো মোরগ। যেন সমস্ত দরজাটা জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে। গায়ের পালকগুলি খাড়া হয়ে আছে। মাথার লাল ঝুঁটিটা একটা শিং-এর মত সটান। ঘাড়ের পালকগুলি সজারু কাঁটার মত সামনের দিকে উঁচিয়ে আছে। তার মাঝে দেখা যাচ্ছে শুধু একবিঘত লম্বা একটা হলুদ ঠোঁট। লাল চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়। সেই চোখের খয়েরী মণি স্থির দৃষ্টিতে বুধনকে দেখছে।

ঘাড় ফিরিয়ে বুধনকে দেখলাম। দেখি, অতবড় চেহারার মানুষটি একটা বেতসলতার মত থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত শরীরে যেন এক ফোঁটা রক্ত নেই। মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট গোঁ গোঁ গোঙানি বেরুচ্ছে। কিছু বোঝার আগেই শুনতে পেলাম একটা ক'ক্ ক'ক ক'রব শব্দ...

কালো মোরগটা হঠাৎ দরজার কাছ থেকে উড়ে বুধনের উপর গিয়ে পড়েছে। বুধন মাটিতে পড়ে গেল। আর তখন সেই কালো মোরগটা তার বুকে উঠে কণ্ঠনালীতে ঠোঁট ডুবিয়ে রক্ত পান করতে লাগল। কয়েকবার ছট্‌ফট্‌ করে স্থির হয়ে গেল বুধনের শক্ত পাথরের মত পা দুটো। কণ্ঠনালীর রক্ত পান শেষ করে মোরগটা ঠোঁট তুলল। তারপর বুধনের প্রাণহীন বুকের উপর দাঁড়িয়ে একবার বিজয়ী মোরগের মত পাখা ঝাপটে 'ক'ক্‌র ক' করে ডেকে উঠল। তারপর সে বুক থেকে নেমে দাঁড়াল। সেখান থেকে নেমে গেল রাস্তায়, রাস্তা থেকে ধীরে ধীরে পাশের জঙ্গলে অদৃশ্য হয়ে গেল।

আমার পায়ের কাছে পড়ে আছে এক বিশাল প্রাণহীন দেহ। গভীর রাত, চরাচর নিস্তব্ধ। আমার সমস্ত শরীরের রক্ত ঘাম হয়ে কুলকুল করে বয়ে চলেছে। কিন্তু কি আশ্চর্য, আমার পুরোনো সাহসও যেন আস্তে আস্তে ফিরে আসছে।

সমস্ত ব্যাপারটা অস্পষ্ট ধোঁয়াটে হলেও ইতিকর্তব্য ঠিক করে নিতে সময় লাগল না। বাড়ির ভেতরে চরণের খোঁজ করলাম। চরণ কোথাও নেই। কোয়ার্টার

কে বেরিয়ে থানায় গেলাম। সমস্ত খুলে বললাম। সেই রাতেই পুলিসের ড়িতে বুধনের দেহ নিয়ে গেল পোস্টমর্টেম করার জন্য। সব দুঃস্বপ্নের পরই ছে জাগরণ, তাই সেই রাতও একসময় ভোর হল।

সেদিনই সকালে চান্ডীলের বাস ধরলাম। গিয়ে পৌঁছালাম চরণের দেশের ড়িতে। আমাকে দেখেই ওদের বাড়িতে কান্নার রোল পড়ে গেল।

আমি জিজ্ঞেস করলাম: "চরণ কোথায়?"

"চরণ মারা গেছে বাবু!"

"মারা গেছে!"— আতঙ্কের একটা ঠান্ডা স্রোত গা বেয়ে নেমে গেল। তদিন তবে আমি কোন্ চরণকে দেখেছি।

"হ্যাঁ বাবু। বুধন খুন করেছে।"

ততক্ষণে আমি ঠিক করে ফেলেছি, আর কোন ব্যাপারেই আশ্চর্য হব । এখানে সব— সব ঘটতে পারে। আমি যেন এক অন্ধকার মধ্যযুগে সে পৌঁছে গেছি।

এর পর চরণের বউ আর চরণের বাবার অবিশ্রান্ত বিলাপের মধ্যে কে যে কাহিনী উদ্ধার করেছিলাম, তা সংক্ষেপে তোমাদের বলছি। বিংশ তাব্দীর সভ্যতা আর বিজ্ঞানের এই চরম উন্নতির দিনে যে এমন মধ্যযুগীয় পার ঘটতে পারে তা অভিজ্ঞতা না থাকলে বিশ্বাস করা যায় না। সে ক্, গল্পটা বলি।

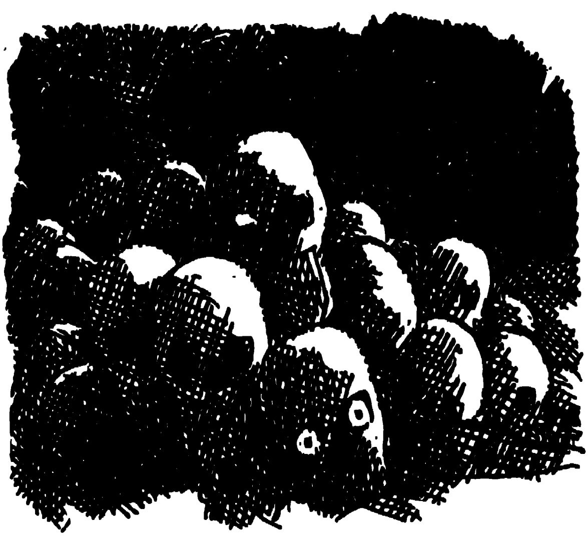
বুধনের ছিল খুব নেশা করার বদখেয়াল। এই নেশার বদখেয়ালের জন্য দেনায় গলা অবধি ডুবেছিল। চরণের কাছেও ছিল তার অনেক ঋণ। বার দেশে গিয়ে চরণ পরবের আগেই যেভাবে হোক ঋণ শোধ করার তাগাদা য় বুধনকে। ঋণ শোধ করতে না পারলে চরণ পঞ্চায়েতে নালিশ ঠুকে নের সব জমি জায়গা কেড়ে নেবে এমন হুমকিও দেয়। এই নিয়ে এক থা দু'কথার পর তাদের মধ্যে বিরাট ঝগড়া বেধে যায়। শেষে গ্রামের মাতব্বররা সে সেই ঝগড়া থামায়। চরণ আসার আগে শাসিয়ে আসে, কাল সকালেই পঞ্চায়েতের কাছে যাবে।

সেদিনই সন্ধ্যাবেলা চরণের বাড়ির উঠোনে দেখা যায় একটা বড় কালো মারগকে ঘোরাফেরা করতে। লোভে চরণের চোখ চক্চক্ করে ওঠে। কিন্তু ড়িতে চরণের বউ আর তার বাপ তাকে মানা করে মোরগটি ধরতে। কারণ রা জানে বুধন একজন ভাল গুণিন। সে ইচ্ছা করলে কালো মোরগের প ধরতে পারে। এই মোরগটাও হয়ত বুধনের মায়া। কিন্তু চরণ কোন বাধা ানে না। নিশিতে পাওয়া মানুষের মত মোরগটাকে ধরবার জন্য সে তার ছু পিছু ছুটতে ছুটতে জঙ্গলে ঢুকে পড়ে। কিছুক্ষণ পরই চরণের আর্তনাদ নতে পেয়ে চরণের বাবা দৌড়ে জঙ্গলে ঢুকে দেখে, রক্তাক্ত অবস্থায় চরণ

পড়ে আছে। তখনও অস্পষ্ট জ্ঞান আছে। সে ক্ষীণ গলায় শেষ কথা বলে যায়: "বুধন আমাকে খুন করল... বুধন... একটা কালো মোরগ... এর বদলা নেব... বুধন..."

শশীদার গল্প শেষ। কিন্তু গল্পের এই ভয়ঙ্কর পরিবেশ তখনও আমাদের মধ্যে চেপে বসে আছে। সবার প্রায় দমবন্ধ অবস্থা। ঠিক এই সময় লাইট জ্বলে উঠল। শশীদা অজয়ের দিকে ফিরে বললেন: "কী অজয়, এর মধ্যে তোমার ইলিউশিনটা কোথায় বের কর? এ কি! অজয়!"

আমরা সবাই চমকে উঠে লক্ষ্য করলাম, অজয়ের গলা দিয়ে কেমন গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরুচ্ছে। ও অজ্ঞান হয়ে গেছে। আর ওর কোলে কতকগুলো রক্তমাখা কালো মুরগীর পালক। ❑



কুরুশের কাজ

ভূমেন্দ্র গুহ

অলোকেশের সঙ্গে হঠাৎ দেখা হয়ে গেল। তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর খুব কম সম নয়, তবু এতদিন পরে দেখা হলেও তাকে চিনতে একটুও অসুবিধে হল না আশ্চর্য, গড়িয়ে-যাওয়া সময়ের ছাপ তার শরীরে যথেষ্টই পড়েছে, তবু মোটামু ভাবে অলোকেশ তার মতোই থেকে গেছে।

তার তো ডাক্তার হিসেবে কিছু নাম-টাম হয়েছে শুনেছি, কাটাকুটি ডাক্তারি করে, গাড়িতে চড়ে ঘোরাঘুরি করাই তার মতো লোকের পক্ষে স্বাভাবিক তবু তাকে আবিষ্কার করলাম প্রেসিডেন্সি কলেজের রেলিং-এর পুরোনো বই-এ দোকানে। নুর মহম্মদের দোকানের সামনে। উত্তরবাংলার উপকথার উপরে লে কি একটা বইয়ের দাম নিয়ে দরাদরি করছিল।

কবে তাকে চিনতুম, সেই ছেলেবেলায়। দু'জনেই যখন একসঙ্গে শ্রীগোপা মল্লিক লেনে থাকতুম। ও মেসে থেকে মেডিকেলে পড়ত, আর আমি কলে পড়তে-পড়তে এ-কাগজে সে-কাগজে দু'টো-একটা ছোট গল্প লিখতুম। সকা দু'জনে একসঙ্গে চা খেতুম।

অলোকেশ আমাকে ঠিক চিনতে পারবে কিনা আমার সংশয় ছিল, ত এগিয়ে গিয়ে বললুম, 'অলোকেশ না? মানে, ডাক্তার অলোকেশ?'

'ঠিক ধরেছেন, কিন্তু তুমি তো অজয়।' অলোকেশ বেশ উজ্জ্বল হ উঠে বলল, 'ঠিক ধরেছি তো?'

'আরে ব্বাস, চিনতে পেরেছ তাহলে! কতদিন পরে দেখা হল!' ব'লে ওর হাত জড়িয়ে ধরলাম।

অলোকেশ বলল, 'এ-ভাবে দেখা হবে, ভাবিই নি কখনো। তোম কথা মাঝে মধ্যেই মনে হত, আর ভাবতুম, তোমার লেখা-টেখা তো আজকা দেখতেই পাই না, হয়তো ম'রে-ট'রেই গেছ।'

'তা ভাবলে খুব একটা দোষ দিতে পারি না, যে-ভাবে বেঁচে আছি সে-কথা থাক, বলো, কেমন আছ, কোথায় আছ; কী করছ, তা অবি জানি।'

'ভালই আছি, বলতে হবে। আর ক'দিনই বা চাকরিতে আছি, তারপ তো আরো ভাল।' অলোকেশ বেশ তৃপ্তির সঙ্গে বলল ব'লেই মনে হল।

'রিটায়ার করছ বুঝি?' আমি বললাম, 'ছেলে-পিলে? দায়-দায়িত্ব?'

'এই করলুম বলে। ছেলে-পিলে? বিয়েই করা হল না, তা আব ছেলে-পিলে!' অলোকেশ কেমন করে যেন বলল।

আমি বুঝলুম আর এদিকে এগোনো বোধ হয় ঠিক হবে না। ত

ালুম, কোথায় আছ, বল। একদিন তোমার বাসায় না হয় যাব, জমিয়ে থা বলা যাবে, হয়তো নিজেদের হারিয়ে-যাওয়া দিনগুলির কথাও উঠে পড়বে।'

অলোকেশ কেমন গম্ভীর হয়ে উঠে বলল, 'থাকি তো সল্টলেকের একঘরের কটা ফ্ল্যাটে, সেখানে নিজেরই নড়ে-চড়ে বসার জায়গা নেই, কোনো রকমে থা গুঁজে থাকা।'

আমি একটু অবাক হলুম শুনে, বললুম, 'কার কাছে যেন শুনেছিলুম মি পার্কসার্কাসে একটা মোটামুটি বড়সড় পুরোনো বাড়িতে থাক।'

'থাকতুম, এখন থাকি না।'

আমি তাড়াতাড়ি বললুম, 'কেন থাক না। যাক গে, তুমি কি এই বইটা বে? নিতে হলে নিয়ে নাও, নুর মহম্মদকে বলছি সে তোমার দামেই ামাকে দেবে। সময় থাকলে চল, কোথাও গিয়ে একটু বসি। তোমার সঙ্গে া বলতে খুব ইচ্ছে করছে। এখানে দাঁড়িয়ে কথা বলা জমছে না।'

অলোকেশের আপত্তি হল না। দু'জনে কলেজ স্ট্রিট মার্কেটের ভিতরে লুম। একটা চায়ের দোকানে হাত-পা ছড়িয়ে বসলুম।

'উফ্, কতকাল পরে দেখা বলো তো!' আমি একটু আবেগপ্রবণ হয়ে ছি বুঝতে পারলুম, 'সেই বাষট্টিতে তুমি চাকরি নিয়ে বাইরে চলে গেলে, পর কোথায়-কোথায় ঘুরলে, কোথায় এসে স্থিতু হলে, কিছুই প্রায় জানতুম । খোঁজ যে মাঝে-মধ্যে না করেছি তা নয়, কিন্তু তুমি কর্পূরের মতো য় উবে গেলে।'

'আমিও তোমার কথা নানান সময়ে ভেবেছি।'

'শোন, ইদানীং তোমার খবর হঠাৎ আবার সামনে এসে পড়ল একটা রের কাগজ প'ড়ে। তোমার একটা সাক্ষাৎকার বেরিয়েছিল। সেই সুবাদে সার্কাসে তোমার বাসার খবরটাও জানা হয়ে যায়। যাব-যাব করেছি, ভেবেছি দিন সন্ধেয় গিয়ে হাজির হয়ে যাব, কিন্তু হয়ে ওঠেনি; ঠিক সময়ে কাজ ল করতে আরেক রকমের জরুরি কাজ এসে পড়ে।'

'হ্যাঁ এ-রকম হয়। তোমার ব্যাপারে আমারও কী হয়নি!'

বয় দু'কাপ চা রেখে গেল টেবিলে।

তারপর আমরা আমাদের কলেজ জীবনের নানা স্মৃতি উস্কে তুললুম। 'র 'দ্য ফল' যেবার নোবেল পায়, সেবার সেই সংবাদ কলকাতা পৌঁছবার ন খুব বৃষ্টি হয়েছিল, রাস্তাঘাট থই থই, আমরা খড়ম পায়ে লুঙ্গি পরনে স্ত কলকাতা সেই বইয়ের খোঁজে চ'ষে ফেলেছিলাম, এবং যোগাড় করে দুপুরেই কলেজ পালিয়ে পড়ে ফেলেছিলাম, সেই সব কথা উঠল। আমার থা ছোট গল্প কলকাতার একটি নামজাদা কাগজে প্রথম বেরোল, আমার পকেট অলোকেশরা আরো শূন্য করে ছাড়ল। আমি সে-কথা মনে পড়িয়ে

দিলুম। এমনি করে মোহগ্রস্তের মতো আমি আর অলোকেশ বেশ কিছু সময় কাটিয়ে দিলুম।

আমি হঠাৎ করে বললুম, 'তুমি আর পার্কসার্কাসের বাড়িতে থাক না কেন। কিসের অসুবিধে? সল্টলেকের ফ্ল্যাট সম্বন্ধে যে-রকম শুনলুম, তার থেকে তো সেই বাড়িটা বড়সড়ই ছিল আন্দাজ করছি।'

'একটা উটকো অসুবিধে এসে জুটে গেল।' ক্ষীণ হেসে অলোকেশ বলল।

'অসুবিধের আবার উটকো কী', আমি বললুম, 'বাড়িওয়ালা ঘটিত?'

'না, না তেমন নয়।' অলোকেশ কেমন অসহায়ের মতো বলল, 'ব্যাপারটা ঠিক বুঝিয়ে বলার মতো নয়। বললে অবিশ্বাস্যই ঠেকবে।'

এখন যদিও তেমন আর লিখি না, তবু এক কালে অনেক গল্প লিখেছি। দু'তিনটে উপন্যাসও কায়দা-কসরত করে বানিয়ে তোলা গেছে। গল্পের প্লটের জন্যে তখন কী হা-পিত্যেশই না করতে হয়েছে, কোথায়-কোথায় না দৌড়ঝাঁপ করেছি, যেন খনির ভিতর মণি খুঁজে বেড়াচ্ছি। সে-সব দিন গেছে, কিন্তু গল্পের গন্ধে সেই চলকে-ওঠা মনটা যে পুরোপুরি যায়নি, তা টের পেলুম, যখন বললুম, 'যতই অবিশ্বাস্য হোক, তোমার পার্কসার্কাসের সেই গল্পটা তুমি বলো। তোমার ডাক্তারি পড়ার সময়ের অনেক গল্প আমি কাগজে-কলমে নতুন করে বানিয়েছি, তোমার মনে আছে নিশ্চয়। তোমার এ-গল্পটাও আমি শুনব।'

'লিখবে নাকি?' অলোকেশ চোখের কোণে হাসল।

'লিখি বা না-লিখি, বলো-না।' আমি একটু সাবধান হয়ে গেলুম, অন্যায় দাবি করছি না তো! বললুম, 'অবশ্য বিশেষ ব্যক্তিগত হলে বলো না।'

'না, না তেমন কিছু নয়।' অলোকেশ ছটফট করে বলল, 'অত সঙ্কুচিত হচ্ছ কেন। গল্পটা নিছকই ভূতের, হয়তোবা ভূতিনীর বলতে পারো। উটকো, কেননা, ব্যাপারটা না ঘটলেই ভাল হত। আমার সহবাসী আপাদমস্তক সরল সুবোধ বন্ধু ভদ্রলোক নিমাইবাবুও অমন ভয় পেয়ে খামকা খিটখিটে হয়ে উঠতেন না, আর আমাকেও পড়ি-মড়ি করে সল্টলেকের এই এক-কামরার পায়রার খোপে এসে ঢুকে পড়তে হত না।'

'তাহলে বলেই ফ্যালো।' আমি এই বার আয়েস করে চায়ের কাপে চুমুক দিলাম।

অলোকেশও চায়ের কাপে ঠোঁট ছোঁয়ালো। খুব নরম গলায় ভনিতা করার মতো করে বলল, 'অজয়, আমি যে-সব কথা বলব তুমি বিশ্বাস করতেও পার, না-ও পার; কিন্তু আমার মনে হচ্ছে, তুমি যেহেতু গল্প লেখ, তাই তোমার বিশ্বাস ক্ষমতার পরিধিটা হয়তো কিঞ্চিৎ বড়। তা যাই হোক, তুমি যেহেতু কখনও আমার পার্কসার্কাসের বাড়িতে যাওনি, তাই ওই বাড়িটার সম্বন্ধে সামান্য বলে নেব। বাড়িটা পুরোনো, তা তুমি জানো দেখছি, এবং দোতলা।

একতলা থেকে দোতলায় উঠবার সিঁড়িটা 'সেকশিফট' ধরনের, অর্থাৎ বাড়ির মূল পরিকল্পনায় ছিল না, পরে যেমন-তেমন করে তৈরি হয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠতে গেলেই একতলার ঘরের ভিতরটা দেখা যায়। বাড়িতে ঢোকার দরজা খুলে ভিতরে গেলেই সিঁড়িটা এসে পড়ে। একতলায় বাইরের লোকজন এলে বসতে দেওয়া হয়, এবং বসবার ঘরের পাশেই রান্নার ছোট ঘরটি, আমাদের ডাল-ভাত-আলুসেদ্ধ-চা তৈরির ঘর আর-কি। নিমাইবাবু সাদাসিধে ভদ্রলোক, প্রায় আমার সমবয়সী, চরিত্রে জীবনযাপনের ছকে আমার সঙ্গে মিল সামান্যই, কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে আমার সম্বন্ধে তাঁর একটা স্নেহপ্রবণ সখ্য-শ্রদ্ধার ব্যাপার আছে। তিনি এবং আমি একরকম ভাবে একসঙ্গে বেশ কয়েক বছর কাটিয়ে দিলাম, তাঁর সঙ্গে আলাপের আগে অবিশ্যি একাই কোনোরকম ভাবে জীবনযাপন ব্যাপারটা চালিয়ে নিয়েছি। তিনি কখনো চাল-ডাল ফোটান, কখনো আমি, সন্ধেয় তিনি আগে বাড়ি ফিরলে চা বানাবার দায় তাঁর, নয়তো আমার। সল্টলেকের ফ্ল্যাটেও ব্যাপারটা এমনই চালু আছে।'

'এবার আসল গল্পে আসা চলে। কিছু বলবে?' অলোকেশ চায়ে আলতো করে আবার চুমুক দিল, এবং চোখ বন্ধ করল। মনে হল, সে ঘটনাটা পরিপূর্ণ দৃশ্যবিন্যাসে চোখের সামনে এনে ফেলতে চাইছে।

আমি বললাম, 'না, বলো, আমি বিশ্বাস করতে পারব, আমার মন বলছে।'

অলোকেশ শুরু করল, 'আমি তখন এস.এস.কে.এম. হাসপাতালে চাকরি করি। কাটাকুটির ডাক্তারির চাকরি, তা তো তুমি জানোই। কিছুদিন আগে জেলা শহর থেকে ফিরেছি; মফস্বলে অনেকদিন থাকার জন্য গায়ে একটা মফস্বলী গন্ধ তখনও লেগে আছে, আমার সহকর্মী বন্ধুরা প্রায়ই বলত। আমি অপ্রস্তুত বোধ করতুম কী, ঠিক বলতে পারি না। তবে গাঁয়ের থেকে আসা সোজা সরল রুগীদের কলকাতার আদিখ্যেতা আক্রান্ত অসহায় বিমূঢ়তা আমাকে এক রকম ভাবে তাদের প্রতি নরম করে ফেলত। অবশ্য সে নরম ভাবটা আমি দ্রুত কাটিয়ে উঠে এখন বেশ চালাক-চতুর আর ম্যাটার-অফ-ফ্যাক্ট হয়ে উঠেছি, এখন খুব তাড়াতাড়ি রুগীদের প্রতি নরম হয়ে পড়ার ব্যাপারটা আমার নেই। কিন্তু তখনও হয়তো ছিল, এবং সহকর্মীরা ঘোরানো-ভাষায় গেঁয়ো বলতে ছাড়ত না। সেই সময়েই একটি ছোটখাটো পাতলা হালকা মেয়ে এল অনডাল থেকে, তার যে-রোগ তা এমনই যে, বাজারে কেমন করে রটে গিয়েছিল যে, আমি তার মোটামুটি ভাল চিকিৎসা করতে পারি। অনেক গতরে খেটে এ-রকম একটা পলকা সুনাম জোগাড় হয়েছিল। সে মুসলমান, তার স্বামী অনডালের কয়লাখনিতে মোটামুটি একটা ভাল কাজ করেন, সে নিজে কাছাকাছি কোনো একটা স্কুলে পড়ায়, তার দু'টি ছেলেমেয়ে।

'আউটডোরে প্রথম দেখার সময় তাকে এত লজ্জাতুর ও কুণ্ঠিত মনে হয়েছিল যে, আমার মনে হচ্ছিল, তার রোগ তাকে একটা খুব লজ্জায় ফেলে দিয়েছে। এই লজ্জাকে সে যে তার শাড়ির আঁচলের মতো কী কৌশলে সামলে উঠবে, বুঝতেই পারছে না। তার ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দুটি তার কোলের কাছে খুব জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে তাদের মাকে এক রকমের সাহস জোগাতে বেশ চেষ্টা করে যাচ্ছে, সহজেই বুঝতে পারা যাচ্ছিল।

'ডাক পড়তে মেয়েটির স্বামী এসে কোথা থেকে এসেছেন, কোন ডাক্তারবাবু তাঁদের ঠিক আমার কাছেই আসতে বলেছেন, তাঁর স্ত্রীর কী-কী শারীরিক অসুবিধা হচ্ছে, কী-কী পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়েছেন, নানান ডাক্তারবাবুর কাছে ঘোরাঘুরি করে তাঁর কী পরিমাণ আজে-বাজে খরচ হয়ে গিয়েছে, হয়রানিও কী কম হয়েছে তাঁদের, এবং এখন ভগবানের কৃপায় তিনি যে যথাস্থানে এসে পৌঁছেছেন, তার জন্য অমুক ডাক্তারবাবুর প্রতি তিনি যারপরনাই কৃতজ্ঞ বোধ করছেন, আমার উপর তাঁদের আস্থার শেষ নেই, এবার তিনি নিশ্চিত যে তাঁর স্ত্রীর এই মারাত্মক রোগটি আমার হাতযশের গুণে সেরে যাবেই, বিয়ের কয়েক বছরের মধ্যেই এই প্রাণান্তকর হ্যাপা, কী রকম কষ্টকর ভেবে দেখুন, বিশেষ করে ছোট-ছোট দুটি বাচ্চা, ভগবান না করুন যদি তাঁর স্ত্রীর এদিক-সেদিক হয়, তাহলে তাদেরই বা কে দেখবে— এই রকম সব কথা তিনি প্রায় এক নিশ্বাসে গড়-গড় করে বলে গেলেন। বোঝা গেল, কয়েক বছর ধরে এই কথাগুলি নানান জায়গায় বলতে-বলতে তাঁর প্রায় মুখস্থই হয়ে গিয়েছে, বিবৃতির ফাঁকে-ফাঁকে দীর্ঘশ্বাসে হতাশা প্রকাশ করা, বা সহসা কৃত্রিম আশার আলোয় উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠা— কোনোটাই টেনে আনতে তাঁকে আর বিশেষ ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে না। আমি মুখ নিচু করে বসে সব শুনে গেলুম, আর হুঁ-হাঁ শব্দপুঞ্জ মাঝে-মাঝে উচ্চারণ করলুম। শুধু উপলব্ধি করতে লাগলুম যে, নিচু মুখে বসে থেকে সেই ছোট্ট শীর্ণকায়া মেয়েটি আগাম কৃতজ্ঞতাবোধে কেমন নম্র হয়ে পড়ছে।

'তারপরে মেয়েটির পেট বুক টিপেটুপে দেখতে হল। মেয়েটি আমার সব প্রশ্নের জবাব প্রায় শোনা যায় না এমন মৃদু কণ্ঠে দিয়ে যেতে লাগল, এবং এমন সমর্পিত হয়ে পড়ল যে বিশ্বাস করতে হল সে আমার কর্মক্ষমতার উপর সর্বাঙ্গীন আস্থা রেখেছে।'

এই কথার পর আমি সাড়া দিয়ে বললাম, 'তার মানে তুমি একজন আদর্শ রোগী পেলে বলতে চাও। শিক্ষকের পক্ষে সবিনয়ী ছাত্র পাওয়া যেমন ভাগ্যের ব্যাপার, আমি বেশ আঁচ করতে পারি, আদর্শ বাধ্য রোগী পাওয়াটাও তেমনি একটা ব্যাপার। আমি নিজের কথা বলতে পারি, আমার অ্যাপেনডিক্স অপারেশনের সময় যখন আমি হাসপাতালে ভরতি হয়েছিলুম, ডাক্তারবাবুকে

প্রথম থেকেই না-চাইতেও আমি কেমন সন্দেহ করতুম, ঠিকঠাক অপারেশন করবে তো, আমি যখন অজ্ঞান হয়ে থাকব, কোনো ঝামলো পাকিয়ে দিলে তো বুঝতেও পারব না, বুঝবেন আমার স্ত্রী ও মেয়ে; সেই অন্তর্লীন অশ্রদ্ধা আমার ব্যবহারে নিশ্চয় প্রকাশ হয়ে পড়ত, আর ডাক্তারবাবু বলতেন, রোগী হিসেবে আমি সুবিধের নই, যদি পুরোপুরি আস্থাই না থাকবে, তাহলে তাঁকে দিয়ে অপারেশন করাতে আসা কেন। আমি অবশ্য প্রতিবাদ করতুম, কিন্তু বুঝতে পারতুম, আমার প্রতিবাদের ভাষা তেমন জোরালো হচ্ছে না। মোদ্দা কথা, আমি আদর্শ রোগী ছিলুম না, কিন্তু তোমার এই রোগিণী আদর্শ হয়ে উঠবেন, এ ব্যাপারে সন্দেহ করছি না।'

অলোকেশ তার ক্ষীণ আবেগসঞ্জাত বিবরণের স্রোতের মধ্যে থেকে বলল, 'যা ভেবেছ, ঠিক তাই। আসল অপারেশনের আগে নানান রকম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে হয় বলে অনেকটা সময় হাসপাতালে ভরতি হবার পরে অপেক্ষায় কেটে যায়। সেই সময়টা সে এত বিনয়ী, সবার বাধ্য, নিয়মানুরাগী হয়ে ছিল যে, আমার কনিষ্ঠ সহকর্মীরা দেখতুম যে তার সঙ্গে বেশ বন্ধুত্ব পাতিয়ে ফেলেছে, তার সঙ্গে হালকা রসিকতা করতেও তাদের আটকাত না; দিদিমণিরা এমনিতেই একটু সব সময় রেগে থাকেন, রোগীদের তাদের দৈনন্দিন ব্যবহারের ছোটখাটো ত্রুটিবিচ্যুতির জন্যে সামান্য বকাঝকা করেন, তাঁদেরও মেয়েটি সম্বন্ধে ভাল কথা বলতে শুনেছি, তাঁরা বলতেন, তোমার মতো সব রোগীই যদি এত কথা শুনে চলত, তাহলে আমাদের আর এত হ্যাপা পোয়াতে হত না। দেখবে, কত তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠে তুমি বাড়ি যাবে। আমি যখন সকালে-বিকেলে রাউন্ডে যেতুম, দেখতুম, মেয়েটি একটি বিশীর্ণ নির্ভার পুতুলের মতো বসে থেকে হয় কোনো না-কোনো বই পড়ছে, বেশির ভাগই তোমার সমসাময়িক নামজাদা সব বাঙালি লেখকের উপন্যাস, অথবা ক্রুশের কাঁটায় সরু সরু ফরসা আঙুল চালিয়ে দ্রুত কী-সব সুতোর আলপনা গড়ে তুলছে। আমি বলতুম, কেমন আছ, কোনো অসুবিধে? ডাক্তারবাবুরা ভাল করে দেখছেন? দিদিমণিরা? সে বলত, ডাক্তারবাবু, আমি তো খুব ভালই আছি। এই কদিন আগেও কত কষ্ট পেতুম, আমার একটা বেশ ভারি রোগ হয়েছে ভাবলেই কেমন ভয় করত, এখন সে-সব একেবারে নেই। আমি বেশ ভাল আছি। আমি তার উত্তর শুনে একটু হাসতুম, বলতুম, তাহলে আর অপারেশন করাবে কেন, ভাল হয়ে গেছ তো বাড়ি যাও, ছুটি করে দিই। সে যারপরনাই ভয় পেয়ে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলে উঠত, না, না, এ তো ডাক্তারবাবু আসল সেরে-ওঠা নয়। আপনাদের সবার কাছে রয়েছি বলে এতো ভাল লাগছে, আসল রোগ তো থেকেই গেছে। আমি জানি, আপনার হাতে আমি সম্পূর্ণ ভাল হয়ে

তারপর বাড়ি যাব। আমি সাহস দিয়ে বলতুম, তোমার মতো লক্ষ্মী মে(ভাল না হয়ে যায়!'

আমি বেশ অভিজ্ঞের মতো বললাম, 'অলোকেশ, তোমার সঙ্গে আ একমত, মনের জোরে মানুষ সুকঠিন ধকলও সামলে নিতে পারে। যারা পর্বতবিজ(বেরোয়, তারা কি শুধু শরীরের ও যন্ত্রপাতির জোরের উপর নির্ভর ক(বেরোয়, মনের জোরের উপর প্রধান ভাবে নির্ভর করে না? এই মেয়েটি(সুস্থ করে তুলতে তোমাকে যে খুব বেগ পেতে হবে না, তা বুঝতে পারছি তা, তোমার ভূতিনীর গল্পটা কোথায়?'

অলোকেশ নিবদ্ধ চোখে আমার দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল। চা(শেষ চুমুক দিল। দেখাদেখি আমিও দিলাম। বলল, 'তুমি সিগারেট খাও না?'

আমি একটু অপরাধী হাসি হেসে বললুম, 'ঠিক যে খাই না, তা নয় তেমন তেমন এলোমেলো অঘটনের চাপে পড়ে গেলে খেতে হয়। পকেটে থাকে। একটু আগে থেকেই কেমন খেতে ইচ্ছে করছে, কিন্তু তুমি তো হাটে মোটামুটি একজন প্রবীণ ডাক্তার, তোমার সামনে ঠিক সাহসে কুলোচ্ছে না।'

অলোকেশ নির্বিকার ভাবে বলল, 'আমি অনেকদিনই সিগারেট খাওয় ছেড়েছি, সেই বুকে ব্যথা হবার পর থেকে, কিন্তু এখন আমারও কেম সিগারেট খেতে ইচ্ছে করছে; যখনকার কথা বলছি, তখন তো খুব খেতুম তুমি সিগারেট খেলে আমাকেও একটা দাও।'

আমি বললুম, 'তাহলে দু'কাপ চা-ও বলি!'

'বলো।'

চা এল। অলোকেশ সিগারেট ধরিয়ে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে ছোট-ছো টানে সিগারেট খেতে লাগল। বেশ উপভোগ করছে, মনে হল। পোড়া সিগারেটে ছাই ঝাড়তে আমি আগের চায়ের একটা খালি কাপ টেপে নিলুম। অলোকে পকেট থেকে একটা চিঠি বার করে তার খামে ছাই জমাতে লাগল। আয়ে করে চায়ে চুমুক দিয়ে আবার বলতে শুরু করল।

'একদিন রাউন্ডে যেতেই মেয়েটি বলল, ডাক্তারবাবু কাল তো আমা অপারেশন হবে ঠিক করেছেন, হবে তো? আবার পিছিয়ে দেবেন না দেখবেন তার ক্ষীপ্র শীর্ণ আঙুলগুলি তখন ক্রুশের কাঁটায় ব্যস্ত ছিল, তার দিকে তাকিয়ে আমার মনে পড়ল, এর আগের একদিন তার অপারেশনের কথা হয়েছিল বটে, এবং কোনো কারণে হতে পারেনি। অপারেশনের দিন আগের বার পিছিয়ে যেতে সে যে অসুখী হয়েছে বুঝতে পারলুম; সে তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে উঠতে এত উদগ্রীব! আমি সান্ত্বনা দেবার ভঙ্গিতে বললুম, না, অপারেশন আর পেছবে না। তা তোমার একটুও ভয় করছে না? সে ছেলেমানুষের মতো সহজ হেসে বলল, কেন, ভয় পাব কেন। আপনি তো অপারেশন করবেন, আপনার হাত

এত ভাল, আপনি যখনি আমাকে পরীক্ষা করেন, আমি বুঝতে পারি। আপনার এত নাম। আপনি এত ভাল! আমি হেসে বলেছি, সে দেখা যাবে, ভাল হয়ে তো ওঠো। তোমার অপারেশন কিন্তু বেশ ভারি ধরনের, জানো তো। সে মাথা ঝাঁকিয়ে বলেছে, তাতে আমার কিছু যায়-আসে না, আমি ভাল হবই। আপনার হাতেই ভাল হব। আমি বেশ গম্ভীর কণ্ঠে বলেছি, তা বেশ। তোমার মনের জোর আছে, তুমি ঠিক সেরে উঠবে। তারপর ভারি আবহাওয়াটা হালকা করার জন্যে সস্নেহে বলেছি, তা, বসে বসে এত যে ক্রুশের কাজ করছ, এ-সব কার জন্যে করছ, কাকে দেবে। নিজের ঘর সাজাবার জন্যে? সে বলেছে, এ-কাজ কি নতুন করছি নাকি? আমার ঘরে অনেক আছে। কোনো একজনকে নিশ্চয় দেব। আমি অন্য রোগীর দিকে ঘুরে যেতে-যেতে বলেছি, আমার এই সব ডাক্তারবাবুদের কাউকে-না-কাউকে না হয় দিয়ো। সে মৃদু হেসেছে।

'তারপরে তার অপারেশন হল। ঘণ্টা সাত-আটের অপারেশন। অপারেশনের পরের দিনগুলিতে সে বাধ্য মেয়ের মতো ডাক্তারবাবুদের দিদিমণিদের সবার সব কথা অক্ষরে-অক্ষরে মেনে চলল। অপারেশনের পরে নানা রকম যন্ত্রণার তো শেষ থাকে না, তাকে দেখলে মনে হত, সমস্ত যন্ত্রণাদায়ক ব্যাপারটাই সে যেন এক রকম কষ্টসাধ্যতার মধ্যে বেশ উপভোগ করছে, সন্তানের জন্মদানে মেয়েরা যেমন যন্ত্রণা আছে বলেই বিশেষ ভাবে আহ্লাদিত হয়। সে ভাল হয়ে উঠল। একদিন বাড়ি যাবার কথাও উঠল, তার নির্বাধ আনন্দের প্রকাশ তখন চোখে দেখার মতো। তার আনন্দ আশপাশের আপাতকঠোর অন্যান্য হৃদয়কেও আনন্দিত করে তুলল। আমি যখন তাকে বললুম, কাল তো তুমি বাড়ি যাচ্ছ, ডাক্তারবাবুরা যা-যা বলে দেবেন, সব মেনে চলবে, কোনো অনিয়ম করবে না, ঠিক মতো ওষুধপত্র খাবে, আর সাত দিন পরে এসে একবার দেখিয়ে যাবে। সে বলল, কাল যাবার সময়ে, ডাক্তারবাবু, আপনি কিন্তু আমাকে একবার আশীর্বাদ করবেন, আর যেন রুগী হয়ে আপনার কাছে আসতে না হয়। আমি বলেছি, আচ্ছা দেখব।'

'সেদিন রাত্রে একটা অঘটন ঘটল।'

'মাঝরাত্রে বাড়িতে টেলিফোন বাজল। তুলতেই আমার কনিষ্ঠ সহকর্মী বরুণ বলল, স্যার, তের নম্বর বেডের রুগী হাসিনা, কাল যার বাড়ি যাবার কথা, তার মনে হয় একটা ইনট্রাঅ্যাবডোমিনাল ক্যাটাসট্রফি হয়েছে, তাড়াতাড়ি চলে আসতে হবে, আমি ইমারজেনসি অপারেশনের বন্দোবস্ত করছি। আপনাকে নিয়ে আসবার জন্য অ্যামবুলেন্স পাঠাচ্ছি।

'হ্যাঁ, জরুরি অপারেশন করতে হল। মেয়েটির কাছে পৌঁছতেই সে সাহস করে হঠাৎ আমার ডান হাতটি ধরে ফেলল, কিছু বলবার আগেই বলল,

না, ডাক্তারবাবু, আমি একটুও ভয় পাইনি, আপনি শুধু শুধু ভাববেন না। আমি ভাল তো হয়েই গেছি, যেটুকু বাকি, তা এবার আপনি ভাল করে দেবেন। আপনি আমার অপারেশন করবেন তো, আপনার হাতে অপারেশন হবে, আমার আর ভয় কিসের, আমি তো প্রায় ভাল হয়েই গেছি। সে বার-বার প্রায় স্বগতোক্তির মতো একই কথা বলে যেতে থাকল।

'অপারেশন হল। কিন্তু সে ভাল হল না। অপারেশনের পর তার জ্ঞানও আর ফিরল না। ঘন্টা চার-পাঁচ প্রথাসম্মত যাবতীয় দাঁতে-দাঁত চেষ্টাচরিত্রের পরেও মেনে নিতে হল, সে মারা গেছে।

'আমি নিজেই তার স্বামীকে গিয়ে সংবাদটা দিলুম। তার স্বামী হাউ-মাউ করে কেঁদে উঠলেন না; খুব যে অস্থির হয়ে পড়বেন, তাও মনে হল না, একদম চুপচাপ নিস্তব্ধ হয়ে গেলেন। আমি তাঁর কথা-বলার জন্যে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলুম, তার পর তাঁকে অধিক সান্ত্বনা দেবার কোনো চেষ্টা না করে পিছন ফিরলুম। তিনি তখন বলতে হয় বলেই হয়তো ভাঙা গলায় বললেন, আমার কোনো ক্ষোভ নেই, ডাক্তারবাবু, আপনি অনেক করেছেন, যতটা করা সম্ভব বলে আমরা ভাবতুম, তার চাইতেও আপনি অনেক বেশি করেছেন। আমার স্ত্রী দেখা হলেই আমাকে বলতেন, আপনার হাতে ছাড়া আর কোথাও তিনি ভাল হবেন না, সুতরাং যা হয়েছে, তা নিশ্চয়ই তাঁর নিয়তি ছিল।'

অলোকেশ তার হাতের সিগারেটে শেষ টান দিয়ে সমস্যায় পড়ল, জ্বলন্ত সিগারেটের শেষ টুকরোটি কোথায় ফেলবে। তার খামের ভিতর ফেলা যাবে না, আমার মতো চায়ের কাপেও যে ফেলবে না, তাও নিশ্চিত। সে টুকরোটি মেঝেতে ফেলে পায়ের জুতোয় পিষে ফেলল, তারপরে নিভে যাওয়া শেষাংশটি খামের ভিতর পুরল।

বলল, 'অজয়, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে, তুমি একটু কষ্ট পেয়েছ।'

আমি আমার গলার স্বরে বেশ একটা ব্যক্তিত্বময়তার আভাস এনে বললুম, 'দ্যাখো, অলোকেশ, আমি যে সাহিত্যিক ও গল্প লেখক, তুমি এই মুহূর্তে তা ভুলে যাচ্ছ। আমি কি জানি না যে, মানুষের নিজস্ব নাটক শেষমেষ এমনই অপূর্ণতায় গড়ে ওঠে। যদি তাই না হত, তাহলে কি আর মানুষের গল্প শোনার তৃষ্ণা এমন নিরবচ্ছিন্ন হয়ে উঠত। যাই হোক, তারপর কী হল, বলো।'

অলোকেশ, অন্তত সাময়িক ভাবে, যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। হালকা গলায় বলল, 'তারপর আর কী। ডাক্তারদের আর কি কে কবে মরল, কীভাবে মরল, এসব নিয়ে ভাবালুতা করলে চলে! সব সময়েই তার কাছে মরণাপন্ন কারুর-না-কারুর বেঁচে থাকতে সাহায্য করার দাবি সোচ্চার হয়ে আছে, আর

ডাক্তারবাবুটিকেও তার স্মরণযোগ্যতার ভিডিওটেপ থেকে প্রতিনিয়তই কোনো-না-কোনো অসফল ছবি মুছে ফেলতে হচ্ছে। সুতরাং এই মেয়েটিও আমার কাছে যথানিয়মে একদিন হারিয়ে গেল।

'মাস ছ'-সাত বা বছর খানেক পরে একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটল, যা আবার মেয়েটির কথা আবছা ভাবে মনে পড়িয়ে দেবার মতো ভাবে ঘটল। এক রবিবারের সকালবেলা এক ভদ্রলোক সঙ্গে দুটি ছেলেমানুষ ছেলেমেয়েকে নিয়ে আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন, আমার পার্কসার্কাসের বাড়িতে। তখনও নিমাইবাবু আমার সঙ্গে থাকতে শুরু করেননি। সপ্তাহের অন্যান্য দিন তো সাতসকালে উঠে তড়িঘড়ি তৈরি হয়ে নিয়ে সাড়ে-আটটার মধ্যে হাসপাতালে পৌঁছতে হয়। রবিবারটাই যা একটু দেরি করে ঘুম থেকে উঠে গরম চায়ের কাপ হাতে নিয়ে খবরের কাগজ পড়তে-পড়তে নবাবী মেজাজে আয়েস করা চলে। কিন্তু সব ভন্ডুল, ভদ্রলোক দেখা করতে এলেন, এবং দরজা খুলে ভিতরে ডেকে এনে তাঁকে বসতে দিতে হল। এ-রকম অবস্থায় বিরক্ত বোধ না করাটাই অস্বাভাবিক; বেশ বিরক্ত হয়েছিলুম, মনে পড়ে।

'সামান্য উষ্ণ স্বরেই বোধ করি বলেছিলুম, কী চাই বলুন, আমি বাড়িতে রোগী দেখি না। ভদ্রলোক বেশ অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, বললেন, ডাক্তারবাবু, আমি রোগী দেখাতে তো আসিনি। আমাকে আপনার চিনবার কথা নয়, ভুলে যাবারই কথা, তবু একদিন তো আমি আমার স্ত্রী হাসিনাকে দেখাতে আপনার কাছে এনেছিলুম, আপনি তার অপারেশনও করেছিলেন, সে বাঁচল না তার কপাল, কিন্তু আমাকে আপনার কাছে আবার আসতেই হল। কে হাসিনা, আমি তার কী অপারেশন করেছিলুম, আমার মনে নেই, কিন্তু সে যে বাঁচেনি, সে কি আমার দোষ, আমি বললুম। ভদ্রলোক জিভটিভ কেটে ক্ষমা চেয়ে একাকার কান্ড করলেন, বার বার বলতে লাগলেন, না, সে কথা তিনি নিতান্ত দুঃস্বপ্নেও কখনো ভাবেননি, আমি তাঁর স্ত্রীর জন্যে যা করেছি, যে ঐকান্তিক সহৃদয়তা দেখিয়েছি, তা যে কোনো অনাত্মীয় অপরিজন লোকের পক্ষে সম্ভব হতে পারে, তা তিনি ভাবতেও পারেন না। তিনি শুধু এসেছেন তাঁর পরলোকগতা স্ত্রীর একটা অন্তিম ইচ্ছা পূর্ণ করার মানসে। তাঁর স্ত্রী তাঁকে বলেছিলেন যে তিনি যেন ডাক্তারবাবুকে তার ভাল হয়ে যাবার পরে কোনো একটা কৃতজ্ঞতাজ্ঞাপনসূচক উপহার দেন, যাতে অন্তত কিছুদিন ডাক্তারবাবুর তাকে স্মরণে থাকে। আর তার ছেলেমেয়ে দু'টিকে তাঁর স্ত্রী বলেছিলেন, তাদের সে তার ডাক্তারবাবুর কাছে নিয়ে যাবে; তারা দেখে আসবে তাদের মাকে যিনি মরণান্তক রোগ থেকে সুস্থ করে তুলেছেন, তিনি কত ভাল মানুষ, কত দয়ালু, উদার এবং ভগবানের মতো ক্ষমতাবান: তা যেন তারা নিজের চোখে দেখে আসে।

'এই সব শুনতে-শুনতে আমার খুব খারাপ লাগতে লাগল। আমার এ-রকম অভিজ্ঞতা আর কখনো হয়নি। অপারেশনের পরে মারা গেলে রোগীর আপনজনেরা সে-দুর্ঘটনার প্রতিঘাতে নানা রকম বিরূপ ব্যবহার করে থাকেন, এবং তা স্বাভাবিকও বটে; মৃদু বিক্ষোভের সুরে "কী আর করবেন, যথেষ্ট তো করেছেন" এও যেমন কেউ-কেউ বলেন, তেমনি অন্যান্যরা আছেন যাঁরা প্রকাশ্যতই বিক্ষুব্ধ হন, ডাক্তারবাবুদের যা-নয়-তাই বলেন, কখনো কখনো আরো সক্রিয় বিক্ষোভ গড়ে তোলেন। কিন্তু আজকের এই ব্যাপারটা হল সম্পূর্ণ অন্যরকম, আমার মনে হতে লাগল এঁরা আমাকে অপমান করতেই আমার বাড়ি বয়ে এসেছেন। এর উপর যখন ছোট-ছোট ছেলেমেয়ে দু'টির হাত দিয়ে তাদের বাবা আমাকে গরম জামা-প্যান্টের একপ্রস্থ কাপড় উপহার দিতে এলেন, তখন আমার যথার্থই মনে হল যে, এত বেশি ও নির্মম অপমান এর আগে আমাকে আর সইতে হয়নি। আমার আর সহ্য হচ্ছিল না, বললাম, এবার আপনারা উঠুন, আমার অনেক জরুরি কাজ রয়েছে। ভদ্রলোক খুব অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন, বললেন, তাই তো ডাক্তারবাবু, আমরা আপনার কাজের খুব ক্ষতি করে দিলাম, মাফ করবেন। তিনি আমার বাড়ি থেকে বেরিয়ে যেতে-যেতে বলতে লাগলেন, আমিও ভেবেছিলাম, এ-রকমটা ঠিক হচ্ছে না। তবে কী জানেন, আপনার রোগিণী এমন করে বলতে লাগল যে আমি আর মাথা ঠিক রাখতে পারলাম না। ছেলেমেয়ে দু'টোকেও এমন করে আপনাকে দেখতে আসার জন্য তাতাল যে... আমি আমার বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়ে দেখতে পেলাম ভদ্রলোক তাঁর দু'টি সন্তানের হাত ধরে পা টেনে-টেনে হাঁটতে-হাঁটতে রাস্তার মোড়ে মিলিয়ে গেলেন।

'ভদ্রলোকের কি পায়ের কোনো অসুখ আছে? ছেলেমেয়ে দু'টিকে তাদের মৃতা মা কী করে তাতাতে পারেন? ভদ্রলোকের বোধ করি আজীবন গ্রামের পরিবেশে অভ্যস্ত হয়ে থাকার জন্য কথ্য বাংলাভাষায় তেমন দখল নেই, কী বলতে কী বলেন! ভদ্রলোকের রেখে যাওয়া উপহারের প্যাকেট নিয়ে যে আমি কী করি, মহা সমস্যায় পড়ে গেলাম।'

আমি বাধা দিয়ে বললাম, 'তা এই জন্যেই পার্কসার্কাসের বাড়িতে থাকা বন্ধ করলে? মানছি, তোমার মৃতা রোগিণী তোমার কথা মতো হয়তো ভূতিনীই হয়ে উঠেছেন, তিনি তাঁর স্বামীকে উপহার সমেত তোমার কাছে পাঠান, তাঁর ছেলেমেয়েদের তোমাকে দেখতে আসার জন্য তাতান, কিন্তু তাতে তোমার কী। সে তো অনডাল না কোথায় বললে সেখানকার ব্যাপার, তোমার বাড়িতে তো তিনি উতপাত করতে আসছেন না। তুমি বরং ভেবে দেখতে পারতে এই ভদ্রলোক এবং তাঁর ছেলেমেয়েরা কোনো অঘটনে মারা গেছেন কিনা এবং ভূতে ও বাচ্চা ভূতে রূপান্তরিত হয়েছেন কিনা। নইলে ভূতিনীর কথা

শুনে তাঁরা তোমার বাড়ি আসেন! তাও দিনের বেলা! এবার তুমি ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য করে তুলছ দেখছি।'

অলোকেশ এ-সব কথা কানেই তুলল না। সে গল্প বলার ঝোঁকে আছে বোঝা গেল।

বলল, 'তারপর কী হল শোন। এর মধ্যে বেশ কয়েক বছর কেটে গেছে। আমিও চাকরির নিয়মে এস.এস.কে.এম ছেড়ে মেডিকেলে চলে এসেছি। নিমাইবাবু এসে জুটেছেন। দু'জনে মিলে মোটামুটি ভালই আছি বলতে হবে। একা বাড়ির সব কাজকর্মের দিক এখন আমাকে একা না দেখলেও চলে, নিমাইবাবু অত্যন্ত স্নেহপ্রবণ এবং ভ্রাতৃবৎসল; তিনি আমাকে আমার নিজের কাজের জন্য যতটা বেশি সম্ভবপর সময় জোগাড় করে দেন, আমি কোনো কাজে হাত লাগাতে গেলেই বলেন, যান, আপনি উপরে যান, নিজের লেখাপড়ার কাজ করুন গিয়ে। শুধু শুধু সময় নষ্ট! রাতে শুতে-শুতে তো সেই দেড়টা-দু'টো বাজাবেন। আমি স্বার্থপরের মতো তাঁর সব আদেশ মেনে নিই, উপরতলায় গিয়ে টেবিলে বইপত্তর সাজিয়ে ভাবতে বসি, কালকের অপারেশনের কেসটা বেশ জটিল, কীভাবে সামলাব, তার পর্যায়বিন্যাস ছকে নেওয়া যাক, ডাইরিতে না হয় ছোটো করে সিদ্ধান্তগুলি লিখেও রাখব, কাল অপারেশন থিয়েটারে ঢুকবার ঠিক আগে ঝালিয়ে নিতে কাজে লাগবে। রাতে কখন যে হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরি, তার কোনো নিশ্চয়তা নেই, রোগীর ভাল থাকা-খারাপ থাকার উপর তা নির্ভর করে। নিমাইবাবু কখনো-কখনো মাঝরাতে হাসপাতালে ফোন করে বলেন আজ তো আর ফিরবেন বলে মনে হচ্ছে না, খাবেন কী ঠিক করেছেন? আমি বলি, খিচুড়ি মতন কিছু বানিয়ে নেওয়া যাবে। সম্ভব হলে কাল সকালে চান করে তৈরি হয়ে নিতে একবার বাসায় ফিরব। আপনি কাজে বেরোবার আগেই ফিরব, ভাবনা নেই, আপনার দেরি করিয়ে দেব না।

'সেদিন দারুণ বৃষ্টি। অপারেশন থিয়েটারে ছিলুম বলে বুঝতেই পারি না বাইরে জল-ঝড়ে তুলকালাম কান্ড হয়ে যাচ্ছে। রাস্তায় তো কলকাতায় বর্ষায় জল জমা কোনো ব্যাপারই নয়, জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখি হাসপাতাল চত্বরও নৌকো চলার মতো জলে থৈ-থৈ করছে। আজকের অপারেশনের রোগী আশানুরূপ ভাল আছেন, সুতরাং বাড়ি যেতে বাধা নেই। ঠিক জল-ঝড়ের কারণে যে তা নয়, যাই-যাই করতে-করতে রাত আটটা বেজে গেল। রোগীদের অপেক্ষমান আত্মীয়স্বজন ও আর পাঁচ জনের কাছে খোঁজ করে জানা গেল, বাস ট্রাম প্রায় বন্ধ, যা-ও বা চলছে, তাতে ভিড়ের কোনো মা-বাপ নেই। সুতরাং আমার কনিষ্ঠ সহকর্মী সিদ্ধার্থ আমার অসহায় অবস্থার জন্য বেশ কাতর

হয়ে পড়ল। আপনি, স্যার, কাল সারাদিন বাড়ি যাননি, আজও যাবেন না, তা কি হয়! আমি আপনার জন্য অ্যামবুলেন্স জোগাড় করছি, বাড়ি পৌঁছে দেবে।

'অ্যামবুলেন্স থেকে নেমে বাড়িতে ঢুকতেই ঝুপঝুপ জলে ভিজে সারা। নিমাইবাবু অবশ্য গাড়ির শব্দ শুনেই ছাতা মাথায় এসে দরজা খুলে দিয়েছিলেন, তবু ভিজতে কসুর হল না। ছুটে গিয়ে একতলার ঘরে ঢুকলাম। ঘরে সোফার উপর হাতে ছোট একটি কাগজের বাক্স নিয়ে একজন অল্পবয়সী মেয়ে বসে রয়েছেন। দেখে তো চক্ষু চড়কগাছ! পাশের ঘরে নিমাইবাবুকে টেনে নিয়ে গিয়ে বললুম, এ কে? এত রাতে এই জল-ঝড়ের মধ্যে মেয়েটাকে বসিয়ে রেখেছেন, আপনার আক্কেল তো বড়! সাড়ে-আটটা-ন'টা বাজে। এলই বা কি করে, এখন যাবেই বা কেমন করে। ব্যাচিলরদের বাড়ি! সারাদিন হাড়ভাঙা খাটুনি গেছে, একদিন ঘুমোইনি, ঘুম সারা শরীরে গাঢ় করে জড়িয়ে আসছে, পেটে খিদে, এ-অবস্থায় এই উতপাতে কারুরই মাথা ঠিক থাকার কথা নয়, আমি দারুণ রেগে গেলুম।

'নিমাইবাবু যা বললেন তাতে তাঁকে খুব একটা দোষ দেওয়া যায় না। বেলা শেষে যখন বৃষ্টি একটু ধরেছিল, তখন মেয়েটি এসে হাজির। পাড়ার দুটি ছেলে এসে মেয়েটিকে পৌঁছে দিয়ে যায়, বলে, ডাক্তারবাবুর বাড়ির ঠিকানা খুঁজে-খুঁজে হয়রান হয়ে গিয়ে আধভেজা অবস্থায় চায়ের দোকানে মেয়েটি ছেলে দুটিকে ধরে। তার বাড়িতে তার যমজ বোনের কঠিন অসুখ, ডাক্তারবাবুকে সে চেনে, আর ডাক্তারবাবুকে তার আজ চাই-ই চাই। ছেলে দুটি দরজার বেল টিপে নিমাইবাবুকে দিয়ে সদর দরজা খুলিয়ে বলে, মেয়েটিকে বসতে দিন, ডাক্তারবাবু এলে দেখিয়ে দেবেন। বলবেন, হালিম পৌঁছে দিয়ে গেছে।

'হালিম পৌঁছে দিলে আর নিমাইবাবুর না বলার উপায় থাকে না। বসিয়ে রাখতেই হয়। তিনি হাসপাতালে ফোন করে এই উতপাতের কথা আমাকে জানাবার জন্য বার দুয়েক চেষ্টা করেছেন, কিন্তু অপরদিকে বেজে-বেজে লাইন কেটে গেছে, কেউ ধরেনি। এই জল-ঝড়ে টেলিফোন-দিদিমণিরাও হয়তো কাজে আসেননি। নিমাইবাবু মেয়েটিকে বলেছেন, চা খাবেন? বানাব? মেয়েটি মাথা নেড়েছে। বলেছেন, বসে তো আছেন, ডাক্তারবাবু কখন ফিরবেন, তার তো কোনো ঠিক নেই, কী করে বাড়ি ফিরবেন? মেয়েটি আলতো করে বলেছে, সে আপনি ভাববেন না। তারপরে নিমাইবাবুর কথা ফুরিয়ে গেছে। মেয়েটি মুখ নিচু করে বসে হয় আঙুলে শাড়ির খুঁট জড়িয়েছে, নয় তো দাঁতে আঙুলের নখ কেটেছে।

'এর মধ্যে আমি এসে পড়েছি। আমি মেয়েটির সামনে একটা চেয়ার

টেনে নিয়ে গিয়ে বসে বেশ রাগতস্বরেই বললুম, কী ব্যাপার বলুন তো, আপনি কি পাগল যে এই জল-ঝড়ের রাতে এসে বসে রয়েছেন আপনার যমজ বোনকে আমি দেখতে যাব বলে। তাছাড়া, আমি তো হাসপাতালের বাইরে রুগী দেখি না। মেয়েটি ধীরে-ধীরে মুখ তুলে খুব ঠান্ডা চোখে আমার দিকে চাইল, ক্ষীণ কণ্ঠে প্রায়-কান্নার মতো স্বরে বলল, ডাক্তারবাবু, আমাকে তো অপারেশন করে ভাল করে দিয়েছেন। অপারেশনের আগে আমি কী যে কষ্ট পেতুম, পেট মাঝে-মাঝে ফুলে উঠত, মুখ দিয়ে বমির সঙ্গে গলগল করে রক্ত বেরোত, চোখ হলুদ হয়ে গিয়েছিল, সে যে কী ভয়, কী উদ্বেগ, কী কষ্ট, সব তো আপনি সারিয়ে দিয়েছেন। এখন আমি যে কী ভাল আছি বলবার নয়, কী শান্তিতে আছি!

'আমি একটু অসহিষ্ণু হয়ে বললুম, তা বেশ, ভাল আছেন শুনে আমারও খুব ভাল লাগছে। তা আপনার যমজ বোনের কী হয়েছে আমি তো জানি না, তারও আপনার মতো অসুখ হয়ে থাকে তো তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসবেন, দেখব। বাড়িতে যেতে পারব না। তাছাড়া, আপনি যে-রোগের কথা বলছেন বলে মনে হচ্ছে, তা তো বংশানুক্রমিক নয়। তার হয়তো অন্য কোনো রোগ হয়েছে।

'মেয়েটি এই কথায় খুব কষ্ট পেল মনে হল। প্রায় কেঁদে ফেলে বলল, না, ডাক্তারবাবু তা নয়, তার একই রোগ, আপনি এত জানেন, এত বড় ডাক্তার, আপনিই বলুন, মানুষের কি যমজ বোন থাকতে নেই! দু'বোনের কি একই রোগ হতে পারে না! অপারেশনের পর এক বোন যে-রকম ভাবে ভাল হয়ে ওঠে, ভাল থাকে, শান্তিতে থাকে, অন্য বোন কি অপারেশনের পরে আরেক রকম ভাবে ভাল হয়ে উঠতে পারে না? আপনিই বলুন, ডাক্তারবাবু! আমি তো অনেক আশা নিয়ে, দাবি নিয়ে আপনার কাছে এই এত রাতে এসে বসে আছি।

'মেয়েটির এই উথাল-পাথাল অবস্থায় আমি কেমন মিইয়ে গেলুম। আমার মুখে কোনো কথা জোগাল না। আমি তার হালকা ফরসা ফুরফুরে শরীরটির দিকে তাকিয়ে নির্বাক বসে রইলুম। এত বিশুদ্ধতা আমি তো আগে কখনো আঁচ করতে পারিনি।

'মেয়েটি বলে চলল, আমাকে আপনি কত স্নেহ করে আদর করে পরীক্ষা করে দেখতেন, আমি কোনো কথা বলতে পারতুম না, কেমন এক অন্য রকম ভয়ে সিঁটিয়ে থাকতুম। আপনি আমাকে বলতেন, তোমার তো এখনো আরো বেশি পড়াশোনা করার বয়েস, এর মধ্যেই বিয়ে করে রোগ বাধিয়ে বসলে? আমি ভাবতুম, আপনি যা বলছেন সব সত্যি, আমি আমার যমজ

বোনকে সব কথা বলব। আপনি বলতেন, তোমাকে দেখতে এলেই দেখি, তুমি কিছু-না-কিছু বই পড়ছ, তুমি বই পড়তে ভালবাস, তুমি যা পড়ো, তার চাইতে আরো ভাল বই পড়ো না কেন। আমি সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেলতুম, আপনি তো আমার যমজ বোনকেই এই সব কথা বলছেন। আপনি বলতেন, খাওয়া-দাওয়া সাবধানে করবে, কম খাবে, পরিশ্রম করবে, তাহলে তোমার এই পাখির মতো শরীর এ-রকমই থাকবে, মোটা হবে না; শরীর ভারি হয়ে গেলেই রোগ, নানা রকম রোগ; হালকা থাকবে, বুঝলে? এটা ডাক্তারি উপদেশ আমি জানতুম, তবু আমার কেমন লজ্জা-লজ্জা করত, ভাবতুম, আমার যমজ বোনকে এই সব কথা বলে আগে থাকতেই সাবধান করে দিতে হবে। সেই যমজ বোনকে আমি আপনাকে দেখাব, আপনাকে দেখতেই হবে।

'এবার আমার বিরক্ত লাগতে শুরু করেছিল। বড় বেশি কথা বলছে। আমার শরীর ঘুমে-খিদেয় কাহিল হয়ে পড়ছে, আর আমার শোনার ধৈর্য নেই। তাছাড়া ভয়ও আছে, এখুনি মেয়েটিকে বিদেয় করতে না পারলে বেশি রাত হয়ে গেলে মহা ঝামেলায় পড়ে যাব তো। আমি তাড়াতাড়ি বললুম, আচ্ছা, আচ্ছা, আপনার যমজ বোনকে একদিন দেখব, আপনি এবার আসুন, বেশি রাত হয়ে যাচ্ছে। চলুন, গাড়ি ডেকে দিই।

'মেয়েটি আমার এই অধৈর্যের আঁচ পেয়ে ক্ষুব্ধ হল, আপনি আমাকে তাড়িয়ে দিচ্ছেন! আমার যাওয়ার জন্যে ভাববেন না, আমার যাওয়ার ব্যবস্থা করা আছে। আমি আপনাকে দেব বলে একটা ছোট উপহার এনেছি, তা আপনাকে নিতেই হবে। অবশ্য আপনি নেবেন, আমি জানি; এ-জিনিস আপনি খুব পছন্দ করেন, তাও আমি জানি। কিন্তু আপনি একবার আমাকে দেখে বলুননা, আমি সত্যিই ভাল আছি কিনা। ওপর-ওপর ভাল থাকা তো সব সময় সত্যি হয় না, আপনি আমাকে একবার বলুন, আমাকে ভাল দেখাচ্ছে না! আমি সত্যি-সত্যি ভাল আছি তো! মেয়েটি তার ডান হাতটি আমার দিকে বাড়িয়ে দিল, তার কবজিতে নাড়ি দেখব বলে। হাতটি বাড়িয়ে দিল, বাড়িয়েই রইল। তার চোখের নির্নিমেষ পলক আর পড়ে না, তার একাগ্রতার আর শেষ নেই। তারও যেন আরেক রকম ঘুম পাচ্ছে, মনে হল।

'আমি বললুম, আচ্ছা, আপনার হাত আমি দেখছি। কিন্তু আপনি এবার উঠুন।

'আমি তার কবজিতে হাত রাখলুম।'

'হাত? কোথায়? এই তো ছিল, আমার হাতের মুঠোর ভিতরেই ছিল, এখন নেই। হাতটি আর নেই। আমার হাত মুঠো-ধরা ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে রইল, নেমে আসতে ভরসা করল না। হাত নেই, মেয়েটিও নেই। শুধু তার কোলের

ছোট কাগজের বাক্সটি সোফার উপর একটি ছোটো বেরাল-ছানার মতো শুয়ে রয়েছে। 'এবার আমার কী করা উচিত? ঠিক করতে পারলুম না। চিৎকার করে উঠতে পারা যায় না, সেটা অসভ্যতা। ছুটে বাইরে বেরিয়ে খুঁজতে যাওয়া চলে না, কেননা তা স্পষ্টতই অর্থহীন। আমি খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে রইলাম। এক সময় ভাবলাম, উপরে যাওয়া যাক। বৃষ্টিতে জামাকাপড় সব ভিজে রয়েছে, পালটানো দরকার, ঠান্ডা লেগে যেতে পারে। দু'চোখে ঘুম ঝাঁপিয়ে আসছে। খিদে? না, তেমন আর খিদে বোধ নেই।

'উঠতে গিয়ে কাগজের বাক্সটায় আবার চোখ পড়ল। কুড়িয়ে নিয়ে ঢাকনাটা খুললুম। কয়েকটা কুরুশের কাজ করা ছোট-ছোট সুতোর আলপনা। একটা ছোট্ট চিঠি: ডাক্তারবাবু, আপনি অপারেশন করে আমাকে পুরোপুরি ভাল করে দিয়েছেন। ভাল আছি। আমার যমজ বোনের অসুখ নিয়ে একটু চিন্তায় আছি। আপনার পরামর্শ নিতে এসেছিলুম। আপনি যে তাকেও সুস্থ করে দেবেন, তা জানি। আপনি এত ভাল। আপনি আমার কুরুশের কাজ ভালবাসেন। আপনাকে সশ্রদ্ধায় দিয়ে গেলুম। এই সব কাজের ছুতোয় আমাকে আপনার মনে পড়বে। ইতি— আপনার স্নেহধন্য হাসিনা। অন্ডাল। ১২.৭.৮৩।

'আমি নিমাইবাবুকে ডেকে বললাম, নিমাইবাবু, মেয়েটি চলে গেছে। নিজে থেকেই চলে গেছে। আর গাড়ি-ফাড়ি ডাকতে হবে না। আমাদের ঝামেলা কমল। আমার খুব ঘুম পাচ্ছে, আজ আমি আর খাব না।'

'একটু পরেই হাঁক-পাক করতে-করতে নিমাইবাবু উপরে এসে হাজির। হাঁপাচ্ছেন। গলায়-কপালে ঘাম। তখনও আমার ভিজে জামাকাপড় পুরো ছাড়া হয়নি। তোয়ালে দিয়ে শুধু মাথা মুছছি।

'নিমাইবাবু মন্ত্রপড়ার মতো সুরেলা অথচ দুর্বোধ্য কণ্ঠস্বরে দ্রুত বলে চললেন দাদা, আর নয়, কাল থেকে এ-বাড়িতে আমি আর থাকছি না। আপনি বুঝুন কী করবেন। আজ আর সারারাত আলো নেবানো চলবে না। বুঝলেন?'

আমি টেবিলের উপর অলোকেশের ছড়ানো হাতের উপর হাত রাখলুম। বললুম, 'আরেকটা সিগারেট হবে? আরেক কাপ চা?'